# বেনজির ভুট্টো

# রিকনসিলিয়েশন

## ইসলাম ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দি ওয়েস্ট

অনুবাদ। আলফ্রেড যোশেফ

# রিকনসিলিয়েশন

## ইসলাম ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দি ওয়েস্ট

বেনজির ভূট্টো

অনুবাদ
আলফ্রেড যোশেফ

www.pathagar.com

রিকনসিলিয়েশন
মূল : বেনজির ভূট্টো
অনুবাদ : আলফ্রেড যোশেফ

স্বত্ব © অনুবাদক

রোদেলা প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০০৯

রোদেলা ০৮০

রোদেলা

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
ইসলামী টাওয়ার (২য় তলা)
১১/১ বাংলাবাজার ঢাকা-১১০০
অফিস : ৪৭/১ বাংলাবাজার, ঢাকা
যোগাযোগ : ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মাহবুব কামরান

অক্ষর বিন্যাস ও মেকআপ
মাননান

মুদ্রণ
হেরা প্রিন্টার্স
৩০/২ হেমেন্দ্র দাস রোড

মূল্য : ১৬০.০০ টাকা মাত্র

Reconciliation by Benazir Bhutto Translated by Alfred Josef, First Published Ekushe Book Fair 2009 Published By Riaz Khan Rodela Prokashani, 11/1Banglabazar, Dhaka-1100
E-mail : rodela_prokashani@yahoo.com

**Price : Tk. 160.00 only US $10.00**
ISBN : 984 70117 0079 3 **Code : 080**

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

## সূচিপত্র

প্রত্যাবর্তনের পথে /১১

দেশে দেশে ইসলাম, গণতন্ত্র চর্চার ইতিহাস ও মীমাংসার কথা /২৮

পাকিস্তান  আমার পাকিস্তান /১০২

মুখবন্ধ /১৫২

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

# পাঠকদের প্রতি

বইটি লিখিত হয় এক ভয়াবহ সময়ের মাঝে এবং আমি নিজেকে ভাগ্যবান মনে করছি এই কারণে যে, বেনজির ভুট্টোর সাথে এই প্রকল্পে সেইসব দুর্বিসহ দিনগুলোতে থাকতে পেরে আমি ধন্য। এর মধ্যে তার দেশে ফেরার মতো অসাধারণ ব্যাপারটি তো আছে– আরো আছে তার এ সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে উগ্র মৌলবাদীদের দ্বারা তার ওপর আত্মঘাতী বোমা হামলা এবং এই হামলায় তার দলের ১৭৯ জন নেতা-কর্মীর প্রাণ বিসর্জন।

নির্বাসন জীবন থেকে তিনি ফিরে আসেন ১৮ অক্টোবর ২০০৭ সালে। এই হত্যাকাণ্ড সংঘটিত হয় পরদিন ১৯ অক্টোবর ২০০৭-এ।

এমন এক লোমহর্ষক ঘটনার পরও বেনজির ভুট্টো থেমে থাকেননি। বরং আরো দায়িত্ববান এবং সাহসী হয়ে তার নিজ দল, পাকিস্তানের বৃহত্তম দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির পক্ষে নির্বাচনী প্রচার অভিযান চালান।

বেনজির ভুট্টো খুব বুদ্ধিদীপ্ত লেখনীর মাধ্যমে এই বইটি রচনা করেন। কেননা এই বইটি ছিল অন্যান্যগুলোর চেয়ে অতন্ত বেশি গুরুত্বপূর্ণ। তার জীবনের অনেক মূল্যবান অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলিভাবে উঠে এসেছে এখানে।

বেনজির ভুট্টো অনুধাবন করতে পেরেছিলেন, সন্ত্রাসবাদ এবং একনায়কতন্ত্র অর্থাৎ আধুনিক বিশ্বের মিলিটারী শাসন এবং উগ্র মৌলবাদ হলো ইসলাম ও গণতন্ত্রের দু'টো বড় শত্রু। তাই এদের মধ্যকার দূরত্ব ও ভুল বোঝাবুঝি ঘোচানোর জন্য তার এই মীমাংসা। তিনি বিশ্বাস করতেন তার প্রিয় ধর্ম ইসলামকে পৃথিবীতে নষ্ট করছে উগ্র মৌলবাদী এবং ধর্মান্ধ ইসলামী উগ্র সন্ত্রাসবাদী। তিনি আরো বিশ্বাস করতেন যে, এইসব ধর্মান্ধ মৌলবাদী সন্ত্রাসীরা শুধু তার জন্মভূমি পাকিস্তানের জন্যই ভয়াবহ নয়– তারা সারা বিশ্বের নিরীহ সাধারণ মানুষ তথা মুসলমানদের জন্যও মহা হুমকীস্বরূপ। বলা যায়, এজন্যই তার এই বইটি লেখা। এ কারণে বইটি তার কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এবং এ কারণে নিহত হওয়ার দিন খুব সকালে এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি নিয়ে তিনি আমার সাথে শেষ কথাবার্তা বলেন এবং নিজেই সম্পাদন করেন।



www.pathagar.com

যদিও এই বইয়ের প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত আমি নানা বিষয়ে নানাভাবে সাহায্য করেছি– তবু এর কোথাও আমার কলমের কোনো ছোঁয়া নেই– তিনি নিজেই লিখেছেন। ইসলাম, গণতন্ত্র, পাকিস্তান, তার জনগণ, জনগণের প্রকৃতিসহ ইসলাম ও গণতন্ত্রের পথে চলার নানা ধরনের মীমাংসার কথা তিনি বলেছেন এই বইয়ে। সত্য বলতে কি আমার দেখা সেরা নারী বলতে তিনি। তিনি পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডিতে ২৭ ডিসেম্বর ২০০৭ সালে ধর্মান্ধ উগ্র ইসলামী সন্ত্রাসীদের আত্মঘাতি বোমা হামলায় নিহত হন। বইটি পড়লে তার সততা, সাহস, প্রজ্ঞা, ধর্মপরায়ণতা, দেশপ্রেম সর্বপরি তার মূল লক্ষ্য সম্বন্ধে জানা যায়।

– মার্ক এ. নিগেল
ওয়াশিংটন, ডিসি
ডিসেম্বর ২৮, ২০০৭।


www.pathagar.com

# প্রত্যাবর্তনের পথে

১৮ অক্টোবর ২০০৭ সালে আমি যখন পাকিস্তানের করাচিতে অবস্থিত কায়েদ-ই-আজম আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পা রাখি– তখন লক্ষ লক্ষ জনতার ঢল দেখে আমি যেমন অভিভূত হয়ে পড়লাম, তেমন উজ্জিবীত হলাম দ্বিগুণ সাহস ও উৎসাহ নিয়ে। অন্যান্য নারী রাজনীতিবিদদের মতো আমি আবেগে আপ্লুত হয়ে একাকার হয়ে যাইনি। আবেগকে আমি সাহস ও এগিয়ে যাওয়ার মন্ত্রে পরিণত করলাম। এর মধ্যে যে আমার নির্বাসিত জীবনের অত্যন্ত কঠিন আট বৎসরকাল সময় কেটে গেছে, তা আমি আমার প্রিয় স্বদেশ পাকিস্তানে পা দিয়ে টের পেলাম। মুহূর্তের মধ্যে আমি পাল্টে গেলাম, নিজেকে ধরে রাখতে পারলাম না। দু'চোখ বেয়ে পানি গড়াতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে দু'হাত তুলে সাধারণ জনতার ভালোবাসার উত্তর দিলাম। দু'হাত তুলে মুনাজাত করলাম। সে যে কি আনন্দ! কি অনুভূতি তা আমি বলে বুঝাতে পারবো না। মনে হলো মস্তবড় এক বোঝা আমার কাঁধ থেকে নেমে গেলো, যে বোঝার ভয়াবহ ওজন আমি বইতে পারছিলাম না। আমি সেদিন স্বাধীন মুক্ত আমার প্রিয় পাকিস্তানের মাটিতে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘদিন পর দেশে ফিরে আমি পাকিস্তানের মানুষের কি অবস্থা তা সহজেই বুঝতে পারলাম এবং এও বুঝলাম যে আমাকে কি করতে হবে।

অবশ্য আট বৎসরকাল দুবাই অবস্থানের পর দেশে সফলভাবে ফেরার জন্য যারা অত্যন্ত বুদ্ধিদীপ্ত ভূমিকা পালন করেন তারা হলে আমার স্বামী এবং ছেলে আশিফ ও বুখতাওয়ার এবং আশিফা। আমি আশিকা এবং বুখতাওয়ার যে কৌশল অবলম্বন করেছিলাম সেটিই সফল হলো। আমাদের কৌশল ছিল অত্যন্ত আত্মসম্মত। অত্যন্ত ভাগ্যবতী মা এবং বাবা হিসেবেও আমার স্বামী আসিফ আলী জারদারিও ভাগ্যবান বলবো এই কারণে যে, আমাদের ছেলে আসিফ অক্সফোর্ডে লেখাপড়া করার সময়েই দেশ, জনগণ আমাদের সংসার, রাজনীতি এমন কি আসিফা এবং বুখাতিয়ার সম্বন্ধে অনেক সিদ্ধান্তই সে আমাদের দিতো। বাবা-মা হিসেবে আমি বলবো আমরা স্বার্থক। আসিফ বড় হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত সব বিষয়ের সিদ্ধান্ত আমিই নিতাম। পাকিস্তানের সাধারণ জনগণ সব সময় আমাদের ছিল তখনও থাকতো এবং ভবিষ্যতেও যে থাকবে– তা আমাদের ছেলে-মেয়ে জানতো। তাই দেশে আসলে তারা জনগণের সাথে মিশতো, সম্ভাষণ ও বিদায় জানাতো। আমার মতে, পাকিস্তানে সামরিক জান্তার পতনের পর এখান থেকে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের পথ চলার শুরু। শুধু


www.pathagar.com

তাই নয় পাকিস্তানকে পরিবর্তনের ধারায় আনার জন্য আমার নির্বাসিত জীবন থেকে ফিরে আসাটা ছিল মুখ্য। আমরা বিশ্বাস করি চমকপ্রদ কোনো একটা কিছু অন্তত গণতন্ত্রের জন্য ঘটবে।

ভেতরে ভেতরে যে পাকিস্তানের পচন ধরেছিল সেই সময়– তা আমার জানা ছিল না। এর জন্য সম্পূর্ণরূপে দায়ী ছিল পাকিস্তানের একনায়ক সামরিক জান্তা সরকার। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তাদের সহায়তায় মৌলবাদী অর্থাৎ ইসলামী সন্ত্রাসী গোষ্ঠী অত্যন্ত নিরাপদ এবং শক্তিশালী আন্তর্জাতিক যোগাযোগ রক্ষার কেন্দ্রস্থল হিসেবে পাকিস্তান গড়ে উঠেছিল। তাদের দুটো লক্ষ্য ছিল, প্রথমত, ইসলাম রক্ষার নামে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ যেমন– মধ্যপ্রাচ্য, পারস্য উপসাগর, দক্ষিণ এশিয়া, মধ্য এশিয়া, পূর্ব এশিয়া এবং আফ্রিকার কিছু অংশসহ টুকরো টুকরো দ্বীপগুলোতে রাজনীতির নামে প্রবেশ করা এবং দ্বিতীয়ত সেই ইসলামের জিহাদের নামের দেশে দেশে রাজনীতি, অর্থনীতি, সংস্কৃতি-সভ্যতা ও শিল্প-সাহিত্যের ওপর আক্রমণ চালানো। তাদের মূল লক্ষ্যই ছিল বিশেষ করে পশ্চিমা বিশ্বে আক্রমণ চালানো। তারা সঠিক ইসলাম যেমন বুঝতো না– তেমন মেনে নিতে পারতো না গণতন্ত্র, বহুদলীয় শাসন ব্যবস্থা, নির্বাচন পদ্ধতি এবং বিশেষ করে ধর্মনিরপেক্ষতা বা অন্য ধর্মের কোনো মানুষদের। তাদের মন ছিল আঘাত হানো পশ্চিমাদের যা পাও তার ওপর। ফলে তারা যেমন নিজেরা দোষী হলো সাথে সাথে ইসলামের নামে নানা কর্মকাণ্ড চালানোর জন্য তামাম দুনিয়ায় ইসলামের মান-সম্মানের হানি হতে থাকে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, এতে করে ফল হলো উল্টো। মুসলিম বিশ্বের মধ্যে মুসলমান দেশগুলোই ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইয়ে অবতীর্ণ হলো। আর মাঝখান দিয়ে ১৪০০ বছরের যে ইসলামের ভ্রাতৃবন্ধন ছিল তা ভেঙেচুরে খান খান হয়ে গেল। অথচ এই পশ্চিমা বিশ্বেই মুসলমান সাহিত্যিক, পণ্ডিত, দার্শনিক, বিজ্ঞানী, চিকিৎসকদের বিচরণ এক সময় ছিল তুঙ্গে। আর সে সময় পশ্চিমারা ছিল অজ্ঞ। অন্ধকারে নিমজ্জিত ছিল তাদের জীবন। অথচ আজকের পৃথিবীতে মুসলমানেরা নিন্দিত, ধিকৃত। এইসব ইসলামিক সন্ত্রাসী দল ও দেশগুলোর জন্য। এদের মধ্যে ইরান ও আফগানিস্তান সর্বাগ্রে। তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম পাকিস্তান পর্যন্ত বিস্তৃত। সারা বিশ্ব আজ তটস্ত, ভীত সন্ত্রস্ত ইসলামিক সন্ত্রাসীদের আক্রমণের ভয়ে।

অন্যদিকে মুসলিম বিশ্বে, নিরক্ষর সাধারণ জনগণকে ইসলামিক জিহাদের নামে মনগড়া কথাবার্তা বলে উল্টাপাল্টা বুঝিয়ে ঐসব ইসলামিক জিহাদী দলগুলো তথাকথিত জিহাদ চালায়। যে জিহাদ পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে। যে



www.pathagar.com

জিহাদের এক অংশ ১১ সেপ্টেম্বর ২০০১-এর টুইন টাওয়ারের বিমান হামলা। ইতিহাসের সর্বকালের সর্ববৃহত মারাত্মক হামলা। ইসলাম এ ধরনের কাজকে স্বীকার করে না। বলা যায় টুইন টাওয়ারের এই হামলার মাধ্যমে ইসলামের নামে প্রচারিত ও পরিচিত সন্ত্রাসী দলগুলো সারা বিশ্বে আতঙ্কের সৃষ্টি করে। অন্যদিকে, মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু দেশে এরা জনপ্রিয় হয়ে ওঠে। টুইন টাওয়ারের এই বর্বরোচিত হামলার কথা ছড়িয়ে পড়লো সারা বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে। কোথাও কোথাও যেমন– পাকিস্তান, বাংলাদেশে সাধারণ জাগণের মধ্যে আনন্দ উল্লাসে মিষ্টি বিতরণের হিড়িক পড়ে যায়। ফিলিস্তিনিরা রাস্তায় নেমে নাচতে থাকে। নিরক্ষর অজ্ঞ মুসলমানদের মধ্যে খোঁড়া ধর্মান্ধ উগ্রপন্থীরা বলতে থাকলো– বুঝুক আমেরিকানরা বুঝুক মুসলমানদের শক্তি কত?

ফল হলো উল্টো, ১০০ কোটি মুসলমানদের মধ্যে শুরু হলো সন্দেহ-বিদ্বেষ। পৃথিবীতে যে শান্তিকামী মুসলমান বা মুসলিম দেশ নেই তা নয়। তারা এই হামলার বিরোধিতা করাতে উগ্রবাদীরা তাদের শত্রু ভাবতে শুরু করে দিল। অন্যদিকে মার্কিনীরা তাদের ক্ষমতা প্রদর্শনের জন্য সারা বিশ্বে সন্ত্রাসীদের ধ্বংস করার নামে অমানবিক হামলা, রাজনৈতিক কূটচাল চালতে লাগলো শুধুমাত্র মুসলিম দেশগুলোর ওপর। এই সময় জেনারেল মুশাররফের মতো একনায়ক ক্ষমতালোভী সামরিক জান্তারা ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখার জন্য মার্কিনীদের সমর্থন জানালো। এতে করে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে ভ্রাতৃত্ব নষ্ট হলো। অর্থাৎ ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াইয়ে নেমে পড়লো। শেষ পর্যন্ত তারা অবশ্য সফল হতে পারেনি। মাঝখান থেকে মার্কিনীরা ফায়দা লুটেছে। রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক সর্বপরি ধর্মের নামে যুদ্ধের দিক দিয়েও। এর ফলাফল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক আফগানিস্তান, ইরাক ইত্যাদি রাষ্ট্রে অহেতুক আক্রমণ।

মার্কিনীদের হামলার শ্যেন দৃষ্টি রয়েছে সুদূর তুরস্ক থেকে পাকিস্তান হয়ে বাংলাদেশ পর্যন্ত। ফিলিস্তিনে যা হচ্ছে, তা মার্কিনীদেরই জিইয়ে রাখা এক জঘন্য মানসিকতার চিহ্ন। পৃথিবীতে যতই তারা শান্তিকামী বলে নিজেদের জাহির করুক না কেন, তারা মুসলমান বিদ্বেষী। আরো কিছু আছে, যার ব্যাখ্যা পরবর্তী আলোচনার নানা জায়গায় আমি উদ্ধৃতি দেবো। এখানে একটি বিষয় না বললেই নয় যে, প্রায় পঞ্চাশ বছর আগে থেকেই বৃটিশ বা মার্কিনীদের ওপর মুসলিম সাধারণ জনগণ উপনিবেশবাদ এবং একনায়ক সামরিক জান্তাদের সম্পর্কে জানেন এবং সে জানার মধ্যে আছে ক্রোধ, উষ্মা, ঘৃণা এবং ধিক্কার। সুতরাং মুসলিম বিশ্বের জনগণও মার্কিনীদের পছন্দ করেন না। মুসলিম বিশ্বে


www.pathagar.com

পশ্চিমাদের ব্যাপারে তাদের কোনো যে মূল্য বা সমর্থন নেই, তা বলাই বাহুল্য। যদিও বেশিরভাগ মুসলিম দেশের লোকজন বর্তমান দৈনন্দিন জীবনের প্রায় সব কাজেই পশ্চিমাদের অনুসরণ করছে। খাদ্যাভ্যাস, পোশাক-পরিচ্ছদ, ভাষা জ্ঞান সবকিছুতেই বর্তমানে পশ্চিমাদের উপস্থিতি উল্লেখ করার মতো। অথচ এই উপমহাদেশে মুঘল, পারসিয়ান এবং অটোমান সাম্রাজ্যে প্রবাহমান মুসলমান কীর্তিকলাপে বা পোশাক-পরিচ্ছদ জীবন যাপন প্রণালীতে পশ্চিমারা প্রভাবিত ছিল। কোথায় গেল সেসব ঐতিহ্য? আজ মুসলমানরা রাজনীতি, অর্থনীতি, জ্ঞান-বিজ্ঞান, প্রযুক্তিসহ তাদের নানা কৌশলের কাছে মার খাচ্ছে। বিশেষ করে উৎপাদন, উন্নয়ন এবং মেধার কাছে হার মানছে। অথচ পশ্চিমারা কেন, সারা বিশ্বের মানুষ এক সময় মুসলমানদের কাছেই এসব বিষয়ে ঋণী ছিল। যে রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যা বলতে গেলে মুসলমানদেরই সৃষ্টি– আজ সেই রাজনীতি এবং যুদ্ধবিদ্যাতে তারা পরাস্ত। এর একমাত্র কারণ ইসলাম এবং ইসলামে উল্লেখিত জিহাদ সম্পর্কে ভুল বুঝে উগ্রবাদী জঙ্গী বা সন্ত্রাসের পথে পা বাড়ানো কিছু ইসলামী দল। পশ্চিমারা তাদের দমনের নামে পৃথিবীতে শান্তি ফিরিয়ে আনার উদ্দেশ্যে রাজনীতি করছে। অর্থনৈতিক অবরোধের নামে পর্যুদস্ত করছে এবং তাদের এসব বদ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য মুসলিম বিশ্বে বেশ কিছু একনায়ক সামরিক জান্তা ক্ষমতায় থেকে মদদ যোগাচ্ছে, যেমন– আমার প্রিয় পাকিস্তানের জেনারেল মুশাররফ। বহিঃশত্রুদের এসব ধ্বংসাত্মক কার্যকলাপের জন্য মুসলিম বিশ্বে জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং সাহিত্য, সংস্কৃতির চর্চা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে। প্রযুক্তি, ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসার লাভ করছে না। দিনের পর দিন তারা যেন অন্ধকারের দিকে ছুটে যাচ্ছে। অথচ মানুষের জীবনে বেঁচে থাকার জন্য এগুলো মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠের মতো সহঅবস্থান প্রয়োজন।

আধুনিক বিশ্বে অতি সম্প্রতিকালে টুইন টাওয়ারে হামলার ঘটনাটি মুসলিম বিশ্বে সন্ত্রাস উচ্ছেদের নামে প্রবেশের পথটি আরো সহজ করে দিয়েছে। মহাকাব্যিক এই ঘটনার পরম্পরায় পশ্চিমাদের একমাত্র লক্ষ্য এখন মুসলিম বিশ্ব। এবং সেই লক্ষ্য হাসিলে এশিয়ার জন্য পশ্চিমারা বেছে নিয়েছে পাকিস্তানকে। তাদের সেই বেছে নিয়ে ঘাঁটি গড়তে সাহায্য করেছে জেনারেল মুশাররফ। ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য তার এই লোভের ফল হবে ভয়াবহ। পাকিস্তানকেও ওরা এক সময়ে সন্ত্রাসীদের আখড়া বলে হামলা চালাবে। পাকিস্তান বা মুসলিম বিশ্বের সবদেশগুলোরই ইসলাম, গণতন্ত্র এবং তাদের থেকে এই বিষয়গুলো নিয়ে আমাদের পার্থক্য কোথায় তা বোঝানো দরকার। অর্থাৎ শান্তি ও মীমাংসার পথে আসা প্রয়োজন। তার অর্থ এই নয় যে, মাথা নত করতে হবে তাদের কাছে।


www.pathagar.com

এই বইটি আমার কাছে অত্যন্ত প্রিয় এই কারণে যে, দুবাই থেকে ২০০৭ সালে আমি যেদিন করাচি আসি, সেদিন আমার প্রাণনাশের জন্য হামলা হয়। পাকিস্তানের সাধারণ জনতার ঢল দেখে আমি অবাক হই। আমার ব্রিফকেসের মধ্যে তখন এই বইয়ের পাণ্ডুলিপি। যেখানে ইসলামকে এই শতাব্দীতে নতুনভাবে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি, গণতন্ত্র এবং পশ্চিমাদের নিয়ে মীমাংসার পথ দেখানো আছে। হামলাকারীরা আমাকে আমার সমর্থনকারী জনগণ দেখে অবাক হয়। তারপরও হামলা চালায়। সেই হামলায় সৌভাগ্যবশত আমি বেঁচে গেলেও আমার এই বইয়ের পাণ্ডুলিপির বেশকিছু অংশ আমার রক্তে ভিজে যায়। এমনকি বেশ কিছু পাতা পুড়েও যায়।

পাকিস্তানে আমার প্রত্যাবর্তনটা ছিল ইসলাম এবং ইসলামের মধ্যকার বিস্তৃত বিষয় এবং গণতন্ত্র নিয়ে এক রেনেসাঁর শামিল। শুধু পাকিস্তানেই নয় এই রেনেসাঁ বা নব জাগণের ছোঁয়া এখন যেন সারা মুসলিম বিশ্বেই লেগে ছিল। যে কারণে ইসলামকে ভুল বুঝে ইসলাম কায়েমের নামে যারা সন্ত্রাসের পথ বেছে নিয়েছিল তারা সামরিক জান্তা মুশাররফের উসকানীতে আমার ওপর ক্রোধান্ধ হয়ে উঠেছিল।

১৯৮৬ সালে যখন আমি পাকিস্তানে আসি তখন পাকিস্তানের সবচেয়ে জনবহুল প্রদেশ পাঞ্জাবের রাজধানী লাহোরে প্রায় ৪০ লক্ষ জনগণের জমায়েত হয়। অর্থাৎ এটি ছিল পাকিস্তানের পিপলস পার্টির পক্ষে জনগণের স্বতস্ফূর্ত সামরিক জান্তা একনায়ক জেনারেল জিয়াউল হকের বিরুদ্ধে সংগ্রামের প্রতিচ্ছবি। তখন আমি দেখেছিলাম কিভাবে পাকিস্তানের সর্বস্তরের জনগণ শিক্ষিত-অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র, উচ্চ ও মধ্যবিত্ত, ব্যবসায়ী, সেনা অফিসার, শিল্পপতি, লেখক, শিল্পী-সাহিত্যিক, সাংবাদিক, সুশীল সমাজ এমনকি সচেতন ইসলাম বোঝা লোকজনও আমার পাশে এসে দাঁড়ালো। তাদের সাথে বিশ্ব জনমত ছিল পাকিস্তানকে সামরিক শাসনের হাত থেকে বাঁচানোর জন্য। এরপর যখন ২১ বছর পর দুবাই থেকে করাচি ফিরলাম ২০০৭ সালে– তখন মনে হলো সেই ১৯৮৬ সাল আবার ফিরে এসেছে। আমার প্রত্যাবর্তনের যেসব দৃশ্য বিবিসি, সিএনএন সরাসরি প্রচার করে তা দেখে বিশ্ববাসী উৎফুল্ল জনতার উল্লাস দেখে বুঝতে পেরেছিল যে কি শ্বাসরুদ্ধকর পরিবেশ ছিল পাকিস্তানের। কি বর্বরোচিত অগণতান্ত্রিক শাসনের অত্যাচার চলতো তাদের ওপর। সেই দৃশ্য যেন নতুন করে জাতির জন্মের কথা বলে।

সেদিন আমি মোটেও অবাক হইনি। আমাদের গাড়ি বিমানবন্দর ছেড়ে করাচির প্রধান সড়কে উঠছে আর ঠিক তখনই স্টার গেট পেরুনোর সময় সূর্য পশ্চিম দিকে অস্ত যাচ্ছিল। সে এক অপূর্ব দৃশ্য। রাস্তার দু'পাশে সাধারণ


www.pathagar.com

জনতার সারি। তারা নীরব প্রতিবাদ জানাচ্ছে সামরিক জান্তা জেনারেল মুশাররফের পতনের জন্য। আমি আরো অবাক হলাম যখন আমাদের গাড়ি শের-ই-ফয়সাল হাইওয়েতে প্রবেশ করলো তখন। দুই পাশে সাধারণ মানুষ, তাদের কারো কারো বুকে গেঞ্জির ওপর লেখা- জানে নিজার বেনজির- অর্থ হচ্ছে আমাদের জান বেনজিরের জন্য। হাজার হাজার মানুষ হাতে হাত ধরে মানব ঢাল বানিয়ে আমাকে এক নজর দেখার জন্য নাচানাচি করছে। আমাদের যারা দেহরক্ষী ছিলেন তারা আমার চেয়ে আসিফের নিরাপত্তাকে বেশি করে দেখছিলেন। কেন জানি এমন একটি পরিবেশ পরিস্থিতি দাঁড়াবে সেটি আসিফ বুঝতে পেরেছিলেন। আর সেজন্য সে বিদেশ থেকে বুলেট প্রুফ গাড়ি আনার জন্য উদ্যোগ নিলে তৎকালীন পাকিস্তান সরকার সামরিক জান্তা জেনারেল মুশাররফ তার অনুমতি দেয়নি। সাধারণ জনতা দেখে মনে হলো ইরাক বা প্যারিসে এমন জনগণ পরিবেষ্টিত পরিবেশে অনেক বড় বড় বোমা হামলা হয়েছে। এখানে যদি এমন হয়। এখানেও তো থাকতে পারে সেই সব বর্বর সন্ত্রাসীদের কেউ কেউ।

আমার স্বামী, জারদারি পরম স্নেহ এবং ভালোবাসায় সিক্ত হয়ে আমার জীবন রক্ষার্থে নিজের ভ্যানকে কেটে ছিঁড়ে অদ্ভুত ধরনের এক পাল্কির মতো চলমান যান বানালো যা মাটি থেকে বেশ উঁচুতে, আমি জনগণকে দেখতে পাবো কিন্তু তারা পাবে না। এমনকি স্বাভাবিক বোমা হামলায় সন্ত্রাসীরা আমার কিছুই করতে পারবে না।

তখন আমাদের ভ্যান চলছে বসে আছি আনন্দে। দু'পাশে হাজার হাজার সাধারণ জনগণ। তার মধ্যে নারী, শিশু, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা, যুবক-যুবতী মিলে হাত নাড়ছে এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির পক্ষে শ্লোগান দিচ্ছে। বিদ্যুৎ এবং টেলিফোনের খুঁটিতে মানুষ ঝুলছে। তাদের মুখে আধুনিক রক বা পপ গানের সুর বাজছে। সাথে সাথে বিশাল বিশাল ডেক সেটে ইংরেজি গান বাজছে। মনে হচ্ছে এ যেন গণতন্ত্র উদ্ধারের এক মহাযাত্রা। আমরা চলেছি সেই মহাবিজয়ের জন্য মহাযাত্রায়। ওদের দেখে আমার মনের মধ্যে তখন স্মৃতিময় হয়ে উঠছে পাকিস্তানের গ্রাম থেকে শহর, খাদ্য খাবার থেকে পোশাক-পরিচ্ছদ, বাশমতি চলের সুগন্ধ। এক কথায়, জনগণ মুক্তি পেতে চায়, মুক্ত হতে চায় সামরিক জান্তার পিঞ্জর থেকে। সেই অভ্যর্থনা ছিল অসাধারণ। আন্তরিক ভালোবাসা সিক্ত এবং গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানোর জন্য এক অযাচিত সুযোগ।

সাধারণ জনতার নেমে আসা এই ঢলে আমি তাকিয়ে থাকলাম। দেখি শুধু মানুষ আর মানুষ। তাদের হাতে আমার বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টোসহ আমার ছাপানো ছবির প্ল্যাকার্ড। চারিদিকে লাল, কালো এবং সবুজ রঙের বন্যা।


www.pathagar.com

পাকিস্তান পিপলস পার্টির ছোট পতাকার বন্যা। আমার বাবাকেও ওরা এভাবেই আপ্যায়ন করতো। ভাবলাম, হয়তো এদের মধ্যে অনেকেই আছেন যারা এভাবে আমার বাবাকেও আপ্যায়ন জানানোর সুযোগ পেয়েছিল –আজ তারা সামরিক জান্তা মুশাররফের জন্য আইনের কাছে বন্দী। তবু তারা গণতন্ত্রের মুক্তি চায়।

## জেনারেল মুশাররফের কূট চাল

সেই ১৯৭৭ সালে পাকিস্তানের মাটিতে আমার পিতার মৃত্যুর সাথে সাথে গণতন্ত্রের কবর রচিত হয়। মজার ব্যাপার হলো আমার পিতার মৃত্যুর সাথে যারা জড়িত ছিলেন তারা মুশাররফ জান্তার আমলে তার জানা থাকা সত্ত্বেও, বড় বড় সরকারী পদে সমাসীন। যেমন– জান্তা মুশাররফের নিয়োগপ্রাপ্ত এটর্নী জেনারেল জনাব মালিক কাইয়ুম, তিনি ছিলেন সেই জল্লাদের পুত্র যিনি আমার পিতাকে ফাঁসিকাষ্ঠে পাঠিয়ে ছিলেন।

অবিশ্বাস্য হলেও সত্য জেনারেল মুশাররফ চাননি যে, আমি পাকিস্তানে ফিরে আসি। তিনি প্রচণ্ডভাবে আমাকে নিরুৎসাহিত করেন। আমাকে বলে পাঠান যে, পাকিস্তানে ফিরে এলে করাচি বিমানবন্দর থেকে আমার নিজের বাড়ি বিলওয়াল হাউজে যেতে হবে সেনা প্রহরায়, হেলিকপ্টারে করে। রাস্তায় গাড়ি চলে যাওয়া যাবে না। তার উদ্দেশ্যই হলো যেন সাধারণ মানুষ আমার সাথে মিশতে না পারে। আমি যেন পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের মনোভাব বুঝতে না পারি। তাদের সাথে মিশতেও না পারি। আমাদের নিরাপত্তার অজুহাত দেখিয়ে তার উদ্দেশ্য সফল ছিল এসব সতর্কতা অবলম্বন করার মূলমন্ত্র। অথচ কি আশ্চর্য ব্যাপার আমার দেশের সাধারণ জনগণের সাথে সাথে বিশ্ববাসী সাধারণ মানুষের সমর্থন আমার প্রতি বাড়তে থাকে। এটা প্রমাণিত হয় যখন পাকিস্তানের কিংবা পার্টি, পাকিস্তান মুসলিম লীগ (কিউ) কোন জনসমাবেশ করে তখন। ওরা জনসভা ডাকলেই লোক সমায়েত বড় জোর ১০০ কি ২০০ জন। আর আমার জন সমাবেশের কথা কেমন করে যেন ফাঁস হয়ে গেলেই লক্ষ লক্ষ মানুষের ঢল নামে বন্যার পানির মতো। মুশাররফ সরকার অন্যান্য রাজনৈতিক দলের জন্য গোপনে পয়সা ঢালতো। কিন্তু তাতে কোনো লাভ হতো না। আমার দলের জন্য সাধারণ মানুষকে কোনো পয়সা দিতে হতো না। তারা স্বেচ্ছায় এসে জমা হতো।


www.pathagar.com

সত্যি বলতে কি, জেনারেল মুশাররফ যখন প্রথম জানালেন যে, ইসলামী কয়েকটি গ্রুপ মিলে হামলা করার জন্য তারা প্রস্তুত। তিনি বেশ ক'জনের নাম এবং ফোন নাম্বার দেখালেন। আমি মুসলিম বিশ্বের বেশ কিছু নেতাদের পরবর্তীকালে এসব নাম এবং ফোন নাম্বার দেখিয়েছিলাম, তাদের মতে ওসব নাম এবং নাম্বারগুলো ছিল ভুয়া। সেগুলো জান্তা মুশাররফের সাজানো মানুষ এবং প্রদত্ত ফোন নাম্বার। তিনি এমনও বলেছিলেন যে, ঐ সব ইসলামী জঙ্গী দলগুলো এতো ভয়ঙ্কর যে, যা খুশি তাই করতে পারে, যেমন করেছে লন্ডন, প্যারিস, বালি দ্বীপে। এমনকি খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের টুইন টাওয়ারে। ওরা নাকি বাস করে পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে। অসম্ভব যোদ্ধা জাতি। পাকিস্তান তাদের কাছে নস্যিমাত্র। আমি জেনারেল মুশাররফের এসব কথায় কান দিইনি। জানতাম ওগুলো মিথ্যা কথা। তার কোনো অজুহাতে কান না দিয়ে আমি জোর করেই বলা যায় পাকিস্তানে এলাম। বিমানবন্দরে নামার পর সন্ত্রাসী হামলা হবে এই অজুহাতে পাকিস্তানের স্থপতি নেতা কায়েদ-ই-আজম আলী জিন্নাহর স্মৃতিস্তম্ভের সামনে দাঁড়িয়ে সাধারণ জনতার উদ্দেশ্যে আমাকে ভাষণ দিতে দেওয়া হয়নি। কিন্তু সারা পাকিস্তান থেকে যে পরিমাণ সাধারণ মানুষ জড় হয়েছিল তা দেখে মনে হয় মুশাররফের পালিত জঙ্গী বাহিনী রাস্তায় নামার সাহস পায়নি। আমার ওপর তাদের আস্থা ছিল, কেননা আমি তাদের দেয়া প্রতিশ্রুতি সবসময় ঠিক রেখেছি। আমি কখনও তাদের বসিয়ে রেখে আর আসিনি এমন কাজ করিনি। আমি, আমার বাবা অর্থাৎ আমরা পাকিস্তানের সাধারণ মানুষকে ভালোবেসেছি। তাদের দুঃখে-কষ্টে পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছি। তারাও কখনও নিজেদের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ কাজ ফেলে রেখে কখনো নিজের পকেটের পয়সা খরচ করে আমাদের ডাকে সাড়া দিয়ে ছুটে এসেছেন। আমরা জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা, সাম্য-স্বাধীনতা, শান্তি-শৃঙ্খলা এবং সুখের কথা ভাবি- তাই যত বিপদই থাক না কেন আমরা জনগণের কাছে বার বার ছুটে আসি- দল, দেশ এবং রাজনীতির কারণে জনগণের কাছে আমাদের আসতে হয়, আসতে হবে চিরকাল। যেন আমিও এলাম ১৮ অক্টোবর ২০০৭ সালে, নিজ বাসভুমে পাকিস্তানী জনগণের কাছে এক মহাওয়াদা রক্ষা করার জন্য।

জেনারেল মুশাররফ এবং তার সাঙ্গ-পাঙ্গরা আমার ওপর যে কতটা ক্ষুব্ধ ছিল এবং আমিসহ আমার দলকে যে কত ভয় পেত তার প্রমাণ পেলাম অল্প কিছু সময় পরেই। সন্ধ্যা গড়িয়ে রাত নামার সাথে সাথে সরকারী লোকজন রাস্তার উজ্জ্বল আলোর বাতিগুলোকে ধীরে ধীরে নিভিয়ে দিতে থাকলো। আমার দলের কর্মী-নেতা এবং সংসদ সদস্যগণ অবাক, একি! রাস্তা, বাজারসহ পুরো শহর ধীরে ধীরে অন্ধকারে নিমজ্জিত হচ্ছে কেন? আমার গাড়ির আশেপাশে



www.pathagar.com

সরকারি টেলিভিশনসহ বেসরকারী চ্যানেল এবং প্রিন্ট মিডিয়ার বহু সাংবাদিক ছিলেন। তাদেরকে বিষয়টি জিজ্ঞাসা করলে তারা বলে, এ নাকি সরকারি আদেশ। তখন বেশ অন্ধকারের মধ্য দিয়ে আমাদের গাড়ি এগিয়ে যাচ্ছে। আলো বলতে আমাদের গাড়ি থেকে যতটুকু ছড়াচ্ছে ঠিক ততটুকু। আমার মনে আশঙ্কা ছিল যদি এর মধ্যে হঠাৎ কোনো হামলা হয়! কিন্তু না, বেশ কিছু সময় পর দেখলাম আমার প্রত্যাবর্তনের এই দৃশ্য সরাসরি বেশ কিছু বিদেশি চ্যানেলে প্রচার হচ্ছে।

সুতরাং হামলার সম্ভাবনা খুব কম। হঠাৎ গাড়ির পাশ থেকে কে একজন বলে গেল, আলো বন্ধ করে ভালোই করেছে। আপনি এসেছেন এবার গণতন্ত্রের আলো জ্বালাবেন। কথা শুনে আনন্দে আমার চোখে আনন্দাশ্রু গড়িয়ে পড়লো। এর মধ্যে ঘণ্টাখানেক পেরিয়ে গেছে আমাদের। দলের যোগাযোগ সম্পর্কে এর মধ্যে সরকারি লোকজনের সাথে বহু তর্ক-বির্তক করে রাস্তায় আলো জ্বালানোর ব্যবস্থা করলেন। আমার এক কর্মী বন্ধুকে তখন আমি বলেছিলাম দেখেছেন সামরিক জান্তারা জনগণকে কত ছোট করে দেখে! জনগণের নির্বাচনে নির্বাচিত নেতা-নেত্রীকে কত ভয় পায়!

আরেকটি বিষয় বললে একেবারে মিথ্যা মনে হবে, তা হলো মোবাইল ফোনে অত্যন্ত কায়দা করে জ্যামের সৃষ্টি করা হয়েছিল। ভেবে দেখুন জেনারেল মুশাররফ কত নিচ মনের অগণতান্ত্রিক ছিলেন। এই অকাজ করার জন্য জেনারেল মুশাররফকে বুদ্ধি দিয়েছিলেন তার নিরাপত্তা বিষয়ক উপদেষ্টা জেনারেল তারিক আজিজ। যিনি ঐ সময় আমার নিরাপত্তার ব্যাপারে উপদেষ্টার কাজ করছিলেন। মজার ব্যাপার হচ্ছে, আমার পাশে বসে আসিফ দুবাই অবস্থানরত আমার স্বামী অর্থাৎ ওর বাবা জারদারির সাথে কথা বলছে, অথচ আমি বলতে পারছি না, আমার সেল ফোন বোবা হয়ে বসে আছে– আমি দেখে তো অবাক! আমাদের গাড়িতে জারদারির এক বন্ধু ছিল আমার নিরাপত্তার জন্য, তিনি বললেন, আপনার সেল ফোনকে সরকার বন্ধ করে রেখেছে। আপনার ঐ নাম্বারে কোথাও কোনো কথা বলতে পারবেন না। জারদারি তখন দুবাইয়ে বসে আমাদের এই অনুষ্ঠান বিবিসির নিউজ চ্যানেলের মাধ্যমে দেখছেন। হঠাৎ সামনে এক মোড়ে দেখি ক'জন সেনা অফিসার। সবাই নিজ নিজ সেল ফোন কানে দিয়ে বসে আছে। তারপর তারা হাত নেড়ে কি যেন বললো আর সবার সেল ফোন বন্ধ হয়ে গেল। ব্যাপারটা আমার কাছে ভালো ঠেকলো না। সাথে সাথে আসিফ আমাকে গাড়ির একেবারে সামনে থেকে টেনে এনে পেছনে বুলেটপ্রুফ কাচের পাশে বসালো। তার ভয় বোমা নয়, তার যত


www.pathagar.com

ভয় বোমার বিষাক্ত- স্নিপার নিয়ে। তবু আমি প্রতিবাদ জানালাম, বললাম আমার জীবন যায় যাক, তবু আমি আমার পাকিস্তানের জনগণের ভালবাসার উত্তর দিতে চাই। আমি হাত নেড়ে তাদের হৃদয় নিংড়ানো আনন্দ ইশারার উত্তর দিলাম।

একটি কথা আমাকে অবশ্যই স্বীকার করতে হবে যে আমার দলের সমর্থক কর্মী বিশেষ করে আমার দেশের জনগণ আমাকে মধ্যরাত পর্যন্ত যেভাবে মানব ঢাল এবং মানব বন্ধন বানিয়ে আগলে রেখেছিলেন তাতে করে কোনো আত্মঘাতী বোমাবাজ বা স্নিপার দিয়ে আঘাতকারীর পক্ষে হামলা চালানো সম্ভব হয়নি। আমরা মনে মনে অনেক সময় পার করেছি আত্মঘাতী বোমা হামলা বা স্নিপার আক্রমণের জন্য –কিন্তু জেনারেল মুশাররফের পক্ষে এতো কম লোকজন ছিল যে, তারা কিছুই করতে পারেনি। .একটি বিষয় আমাদের মাথাতেই আসেনি, তা হলো, গাড়ি বোমা। বেশকিছু গাড়ি আমাদের গাড়ির পাশ দিয়ে চুটে গেছে অথবা কখনও কখনও পাশে দাঁড়ানোও ছিল, তবু তাদের দ্বারা আমাদের কোনো ক্ষতি হয়নি।

একেবারে মাঝরাতে এসে আমরা জানতে পারলাম যে, কায়েদ-ই-আজম সাহেবের স্মৃতিস্তম্ভ থেকে আমরা অনেক দূর চলে এসেছি। সেখানে আমি এবার ট্রাকের মাঝখানে উঠে বসলাম। হঠাৎ দেখি সেখানে এক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত ছিলেন পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত আবিদা হোসেন। ইতোমধ্যে আবিদা তার অসংখ্য সাথী-বন্ধু নিয়ে আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে যোগ দিয়েছেন এবং বর্তমানে তিনি নিবেদিতপ্রাণ। ততক্ষণে আমার পায়ে বেদম ব্যথা শুরু হয়ে গিয়েছে। কেননা এভাবে দশ ঘণ্টা আমি কখনও দাঁড়িয়ে থাকিনি। মনে হচ্ছিল আমার দু'পা যেন জুতার মধ্যে আর আঁটছে না। জুতা জোড়া অসম্ভব টাইট লাগছে আর পা যেন চলছে না।

ব্যথা সহ্য করতে না পেরে আমি স্যান্ডেল জোড়ার ফিতা খুলে আমার পা দুটোকে মুক্ত করলাম। অল্প কিছুক্ষণ পরেই আমার রাজনৈতিক সচিব নাহিদ খান বললেন, এখনই আপনি একটি বক্তৃতা লিখে ফেলেন। আপনাকে এই সুযোগে এই উৎফুল্ল জনতার মাঝে ঠিকমতো আওড়াতে পারলে একটা বিষয় হয়ে দাঁড়াবে। আমি সাথে সাথে আমার বক্তৃতার সারাংশখানা জানিয়ে লিখতে বললাম। তিনি আরো বললেন, দেখবেন আপনার এই বক্তৃতা এক সময় গণতন্ত্র এবং ইসলামের ওপর বয়ে যাওয়া ইতিহাসের পাতায় উক্তি হিসেবে শোভা পাবে। কেননা পাকিস্তানের নাগরিকরা এমন কথাই শুনতে চায়। তারা চায় গণতন্ত্রের মুক্তি হোক, সামরিক শাসন নিপাত যাক, ঘরে ঘরে ইসলামের আলো জ্বলে উঠুক।


www.pathagar.com

## ওহ আল্লাহ, না, এতো নির্দয় হয়ো না

আমার গাড়িবহর তখন কারসাজ প্রদেশের সীমান্তে এসে হাজির। কারসাজ লাহোরের খুব কাছের একটি জায়গা, সেখানে এসে দেখি আগের দিনের চেয়ে বেশি জনতা। তারা আরো বেশি উৎফুল্ল, উৎসাহিত এবং আনন্দঘন তাদের পরিবেশ। আমি অভিভূত হলাম। আর তর সইতে না পেরে বক্তৃতা শুরু করলাম। তার পরের দৃশ্য আমি যেন আর লিখতে পারছি না। কি আনন্দ! কি উৎসাহ! কি উৎসব! কি আলোর বন্যা! মানুষের ঢল! আমি বলে বোঝাতে পারবো না। এ হলো নাহিদের কথার সত্যতা। সেই রাতের গণজমায়েত পাকিস্তানের এক ইতিহাস হয়ে রইলো। এবার সেই দুঃখ এবং বেদনাভরা ঘটনার কথা বলবো– বক্তৃতার বিষয় ছিল পাহাড়ি উপজাতীয়দের মধ্যে রাজনৈতিক অধিকার প্রমাণ করতে হবে। তাদের রাজনৈতিক কোনো অধিকার নেই বলে তাদের মধ্যে উগ্র মৌলবাদীরা বাসা বাঁধছে। তারা যেন বাসা বাঁধতে না পারে এজন্য আমরা সুপ্রিম কোর্টের আদেশ চাই। আমাদের দাবি পাহাড়ি উপজাতীয়দের রাজনৈতিক অধিকার।

যাই হোক, যেই 'চরমপন্থী উগ্র মৌলবাদী' শব্দগুলো আমি উচ্চারণ করলাম, অমনি বুম ... বুম শব্দ। আমাদের গাড়ি দুলছে, কাঁপছে, সামনে বিচিত্র বিষাক্ত দুর্গন্ধ, ভারী ঘন ধোঁয়া। বুঝলাম আমার গাড়ি বহরে বোমা মারা হয়েছে। এর সাথে কান ফাটানো শব্দ, তারপর চোখ ধাঁধানো আলো। পাশাপাশি মানুষের আর্তচিৎকার।

তারপর এক সময় সব শেষ। পরিবেশ থমথমে। শব্দ নেই বললেই চলে। তখন জান খুলে চিৎকার করে বললাম, 'হে খোদা, না, না, তুমি এতো নিষ্ঠুর হয়ো না। তুমি আমাকে তুলে নাও কিন্তু কোনো অসহায় জনগণকে নয়।"

যখন প্রথম বোমাটি বিস্ফোরিত হলো তখন– বোমা বিস্ফোরণের জায়গাটি এবং আমি সমান্তরালভাবে ছিলাম। আমি টের পেয়েছিলাম বেশ ভালোভাবে। ঠিক একইভাবে ট্রাকের উপরে, মধ্যে এবং ধীরে ধীরে চারিপাশে ঝাঁকি শুরু হলো মুহূর্তের মধ্যে।

যখন দ্বিতীয় বোমাটি বিস্ফোরিত হয়, তখন প্রথমেই কি অবাক করা ব্যাপার, ট্রাকে বাজতে থাকা পাকিস্তান পিপলস পার্টির নিজস্ব সঙ্গীতসহ পাকিস্তানের জাতীয় সঙ্গীত বন্ধ হয়ে গেল। দ্বিতীয় বোমার আওয়াজ, আলো, ধোঁয়া, সবকিছুই বেশি ছিল। শুধু তাই নয়, তার ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণও ছিল অনেক বেশি। এবং মনে হলো কিছু যেন একটি আমাদের ট্রাককে আঘাত হেনেছে। ততক্ষণে আমি বুঝে ফেলেছি যে, আমি বোমা হামলার মধ্যে পড়ে


www.pathagar.com

গেছি– আমার ওপর বোমা হামলা চলছে। এরপর বিরতিহীনভাবে ট্রাকের চারপাশে বোমা ফাটতে লাগলো।

বোমা ফাটা শেষ হলে দেখি এপাশে ওপাশে দু'পাশে দু'খানা ট্রাক দুমড়ে মুচড়ে পড়ে আছে। যেটির ওপর ভয়াবহ বোমা হামলা হয়েছে আমি তার খুব কাছেই আছি।

অকস্মাৎ দেখি একজন ইউরোপীয় রিপোর্টার, সে আমাকে বলছে আপনার ওপর অত্যন্ত পরিকল্পিত একটি বোমা হামলা হয়েছে, আপনি কি অনুমান করতে পারছেন যে এসব বোমা কত ভয়াবহ! ঐ দেখেন আপনার বুলেটপ্রুফ কাচেও চিড় ধরেছে। তখনও ধোঁয়া উড়ছে। যতদূর চোখ যায়, ততদূর পর্যন্ত দেখি রক্ত আর পোড়া মাংস একাকার হয়ে আছে মাটিতে। যারা এই কিছু সময় আগেও নেচেছে, গেয়েছে, উল্লাসে-উৎসাহে আনন্দে ভেসেছে –এখন তারা মৃত, নিস্তব্ধ শরীর, অসাড়-অনড়। তারা আর কোনোদিন জাগবে না। জেগে উঠে ট্রাকের সামনে এসে দাঁড়াবে না। তারা বানাবে না মানব ঢাল। তারা হাতে হাত ধরে হয়ে উঠবে না মানব শিকল। বহু হত্যা, মৃত্যু, দুর্ঘটনা আমি দেখেছি, কিন্তু এমন ভয়াবহ, লোমহর্ষক মৃত্যুদৃশ্য আমি দেখিনি। খোদার কাছে দু'হাত তুলে বলি, 'না আমার জীবনে পাকিস্তানে অন্তত যেন এমন ঘটনা আর দেখতে না হয়।'

মৃতদেহগুলো ক্ষত-বিক্ষত হয়ে গেছে। শহরের রাস্তায় রক্তের বন্যা। এর মধ্যে কেউ কেউ চিৎকার করে বলছে 'জয় বেনজির... বেনজিরের জয় ... বেনজির দীর্ঘজীবী হোক। যে তিনজন মানুষ আমার সাথে ট্রাকে ছিলেন– তারা সবাই মারা গেছেন। এদের মধ্যে খুব কাছের এবং মূল্যবান মানুষ হচ্ছেন পাকিস্তানের সিন্ধু প্রদেশের নেতা– সংসদের বিরোধী দলের উপনেতা। তার শরীরের বোমার আঘাত ছিল অবিশ্বাস্য ধরনের বর্বরোচিত। এর কারণ হচ্ছে জীবন দিয়ে আমাদের বাঁচানো। তাঁর নেতৃত্বে আমাদের ট্রাকের সামনে যে মানব ঢাল এবং মানব শিকল বানানো হয়েছিল তাতে বোমা হামলাকারীরা আমাদের খুব কাছাকাছি আসতে পারেনি। বোমা হামলার সব আঘাত সহ্য করেছে ঐ উপনেতাসহ শত শত উৎফুল্ল দর্শক। এবং তারাই জীবন দিয়েছিল। এই হামলায় মোট ১৭৯ জন সাধারণ জনতা মৃত্যুবরণ করেছিল। এদের মধ্যে ৫০ জন ছিল তরতাজা তরুণ ছাত্র। তারা আমাকে ভালবেসে আমার জন্য তাদের মূল্যবান জীবন দান করেছিলেন। আমি তাদের আত্মার সম্মান করবো চিরকাল।

এরপর পাকিস্তান পিপলস পার্টির সমর্থক, কর্মী এবং সাধারণ জনগণের নিরাপত্তার মাধ্যমে আমাকে ট্রাক থেকে এনে জেনারেল (অব.) আহসান সালিম


www.pathagar.com

হায়াত-এর ভ্যানে ওঠানো হলো। তিনি আমার মিছিলের নিরাপত্তাদানকারী কর্মকর্তা ছিলেন। শুধু তাই নয় এই হামলাতে তিনিও মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন। এরপর আমরা আমার প্রিয় আবাসস্থল বিলাওয়াল হাউসের দিকে রওনা হলাম। পুরো আট বৎসর পর যখন আমার ঐ প্রিয় আবাস স্থলের কাছে এলাম তখন বুঝলাম এই আমার আসল জায়গা –এ হচ্ছে আমার নিরাপদ স্থান। পাকিস্তান আমার কাছে স্বর্গের সমান, করাচি আমার জান, রাওয়ালপিন্ডি এবং বিলাওয়াল হাউস আমার কাছে রক্ত-মাংসের মতো। বাসায় এসে জানলাম যে ঘটনা ঘটেছিল– তা সম্পূর্ণ পূর্বপরিকল্পিত। যার সাথে জড়িত পাকিস্তানের সাধারণ জনতা নয়। তাদের সাথে জড়িত মুশাররফ জান্তা শাসকের বেশকিছু দালাল সেনা অফিসার এবং ইসলামপন্থী উগ্র মৌলবাদী জঙ্গী গোষ্ঠী।

বিলাওয়াল হাউস সম্পর্কে একটু না বললেই নয়। এটি প্রকৃতপক্ষে আমার স্বামীর ঘর। আমার বিবাহের পর প্রথম সন্তান বিলাওয়াল ভূমিষ্ঠ হলে তার নামানুসারেই আমার স্বামী এই বাড়ি বানায় এবং আমাকে উপহার দেয়। সেই প্রিয়তম বিলাওয়াল হাউসে প্রবেশ করে আমি উপরতলায় গেলাম আমার তিন সন্তানের ছবি দেখে আনন্দের কান্নায় ভেঙে পড়লাম। আমি বুঝতে পেরেছিলাম– যারা এই বোমা হামলা করেছে তারা পেশাদার নয়। এই অভিজ্ঞতা হয়েছে আমার বাবার গ্রেফতার প্রহসনের বিচার অতঃপর হত্যাকাণ্ড দেখে। আমি জানতাম আমার জীবনেও হয়তো এমন কিছু আসতে পারে। কিন্তু তাতে কি? তাই বলে কি ঘরে বসে থাকবো, না কি? আমি ইচ্ছা করলে তখন অনেক কিছু করতে পারতাম। কিন্তু শুধুমাত্র স্বামী, সংসার, পাকিস্তান বিশেষ করে পাকিস্তানের জনগণের মুখের দিকে তাকিয়ে আমি কিছু করিনি। দু'চোখ ভরে দেখেছি, দু'কান খাড়া করে শুনেছি, বুঝেছি কিন্তু কিছুই করিনি শুধুমাত্র আমার পিতার মৃত্যু, ভাইয়ের পরিণতি, স্বামীর হাল অবস্থা দেখে। স্বামী-পুত্র-কন্যাকে শুধুমাত্র উষ্ণ ও আন্তরিক অভ্যর্থনার কথা বলেছিলাম। কেননা সত্য সত্য তারা টেলিভিশনে আমার উষ্ণ অভ্যর্থনার ঘটনা দেখেছিল– বোমা হামলার ঘটনা দেখতে পায়নি। আর কাগজে দেখে বা রেডিও শুনে অনুমান করতে পারেনি যে কি ভয়াবহ হামলা আমার ওপর চালানো হয়েছিল। পেপারে পড়ে, রেডিওতে শুনে আমার মেয়ে তার বাবার কোলে পা ঘেঁষে আদুরে কণ্ঠে আমার বিষয় জিজ্ঞাসা করলে আমার স্বামী মেয়েকে জবাব দেয়, তোমার মায়ের কিছুই হয়নি। তোমার মা এখন অনেক ভালো।


www.pathagar.com

## সন্দেহ ঘনীভূত হতে থাকে

সকালে ঘুমের ঘোর কেটে উঠতেই দেখি সকাল ৬টা বেজে গেছে। বিলাওয়াল হাউস তখন সাধারণ মানুষ, রিপোর্টার, টেলিভিশন চ্যানেলের নিউজ প্রেজেন্টার, ডাক্তার, নার্স এবং আমার বাবা, মা, স্বামী ইত্যাদি সম্পর্কের আত্মীয়-স্বজনের পদচারণায় মুখরিত। মনে হলো এই কি আল্লার হুকুম। আজ কি দেখছি। আর কাল কি দেখলাম। এত মানুষ আমাকে ভালবাসে। গতকাল এরা ছিল কোথায়? পত্র-পত্রিকায়, রেডিও-টেলিভিশনে ফলাও করে প্রচার করা হচ্ছে আমার ওপর আল কায়েদা বা তালেবানদের বোমা হামলার ঘটনাকে। সূর্যের আলো যত ছড়াচ্ছে, রোদ যত বাড়ছে– তার সাথে সাথে মানুষও তেমন বাড়ছে। এক সময় আত্মীয়-স্বজনের মতামতে আমাকে করাচি হাসপাতালে নেয়া হলো। রাত্রে আমি টেরই পাইনি কিন্তু এখন সকাল বেলা দেখি আমার কপাল, ঠোঁট, হাত, পিঠ এবং পায়ের বেশ কিছু জায়গা থেকে রক্ত পড়ছে। ডাক্তাররা অতি যত্নে আমার চিকিৎসা শুরু করলো। সবই হচ্ছে আমার আত্মীয়-স্বজন এবং সাধারণ মানুষের স্বতস্ফূর্ত আহ্বানে, প্রচেষ্টায় এবং ভালোবাসার প্রতিদানস্বরূপ। মাঝে মাঝে সেনা অফিসার এবং পুলিশ আসছে, দেখছে তারপর চলে যাচ্ছে। তারা কোনোরকম কাজ আমার জন্য করছে না।

দুপুরের দিকে ধীরে ধীরে আমার কক্ষটি ফাঁকা হলো। তখন একা একাই ভাবছি– যে নেত্রীর পেছনে এতো মানুষ আছে তাকে হামলা করে কে? তাকে যেভাবে জীবন দিয়ে তারা বাঁচিয়েছে নিজেরা জীবন দিয়েছে, তাতে করে কোনো সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন কাজ করাটা সম্ভব নয়। এ হচ্ছে উগ্রপন্থী মৌলবাদী নারী ও বিজাতীয় বিদ্বেষী সন্ত্রাসী দল তালেবানদের কাজ। এরা ইসলাম, গণতন্ত্র, নারীর আসল অধিকার এবং ইসলাম সম্পর্কে আমার যুগোপযোগী আধুনিক ব্যাখ্যা ও মতামত পছন্দ করে না।

আর আল কায়দাকে ব্যবহার করা হতে পারে ঐ একই কারণে। কারণ ওসামা বিন লাদেনও আমাকে পছন্দ করতো না। বরং বিদ্বেষ ছিল রাজনৈতিক, ধর্মীয় ইত্যাদি নানা বিষয়ের মত বিরোধ নিয়ে। এছাড়া ক্ষমতায় থাকার জন্য জেনারেল মুশাররফ তালেবান এবং আল কায়েদা বাহিনীকে সেনা থেকে শুরু করে যাবতীয় সব কিছু দিয়ে সাহায্য করেছিলেন। যার ফলে ঐ বাহিনীর সদস্যগণ মিলেমিশে সেনা এবং পুলিশ বাহিনীর সহায়তায় তারা এ কাজ করেছিল– এ আমার শতভাগ বিশ্বাস। পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সী তো ছিল সম্পূর্ণরূপে তালেবান এবং আল কায়েদা বাহিনীর বাপুতি মাল। তারা তাদের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতো।


www.pathagar.com

আমার ওপর বোমা হামলা যে তালেবান, আল কায়েদা এবং পাকিস্তান ইন্টেলিজেন্স এজেন্সীর মিলিত প্রয়াস তার প্রধান প্রমাণ হলো সাধারণ মানুষ বোমা হামলা করলে সেটা আত্মঘামী হামলা হতো না। কিন্তু আমার ওপর হামলাটি আত্মঘাতী। হামলার দ্বিতীয় প্রমাণ সাধারণ মানুষের পাশে এতো উন্নত মানের বোমা, সঠিক সময় ও স্থান সর্বোপরি এতো পুঙ্খানুপুঙ্খ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হামলা এটি হতো না। এতো কিছুর পরও আমি প্রাণে বেঁচে গেছি শুধুমাত্র আমার দেশের মানুষের ভালবাসার কারণে। তারা জীবন দিয়ে আমাকে বাঁচিয়েছেন। পরবর্তীকালে আমি বুঝতে পেরেছি জেনারেল মুশাররফ কি পরিমাণ কূটচালের লোক। এতো বড় হামলার পর তিনি কোনো ধরনের সহযোগিতাই করেননি অথচ পত্র-পত্রিকা, রেডিও টেলিভিশনে হর-হামেশাই নানা রকম মিথ্যা প্রচারণা চালাচ্ছেন তিনি। দেশের একজন শীর্ষ স্থানীয় সেনা অফিসার এবং শাসক হয়ে, গায়ে সেনা উর্দি পরে, মাথায় নিশানঅলা টুপি লাগিয়ে এমন অনায়াসে মিথ্যা কথা বলেন কিভাবে। বলতে পারেন বলেই তিনি ক্ষমতালোভী একনায়ক, সামরিক জান্তা। তিনি জনগণের নেতা-নেত্রী ভয় পান। ভয় পান বলেই আমাকে হত্যার পরিকল্পনা তিনিই করেছিলেন এ আমার বিশ্বাস।

এর পরের ঘটনা বললে বিষয়টি আরো পরিষ্কার হয়ে যাবে। তখন জেনারেল মুশাররফের এক স্নেহভাজন বিশ্বস্ত মন্ত্রী ছিলেন, যিনি ২০০২ সালে আমার দল থেকে আমি বিতাড়িত করলে সে মুশাররফের কাছে ঠাঁই পায়– আমার ওপর বোমা হামলার তদন্তের ভার পড়ে তার কাঁধে। ফলে আমার ওপর বোমা হামলার বিষয়টি তদন্ত করা নিয়ে গড়িমসি শুরু হয়ে গেল। দেশের জনগণ চায় সুষ্ঠু তদন্ত এবং এর সুবিচার। তারপর দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর অন্যদিকে মুশাররফকে আঙুল তুলে শাসাচ্ছে ইসলামী চরমপন্থী সন্ত্রাসীরা। যাদের পেছনে আছে তালেবান গোষ্ঠী এবং ওসামা বিন লাদেনের আল কায়েদা বাহিনী। এই সুযোগে আমি এই তদন্ত করার জন্য জগদ্বিখ্যাত গোয়েন্দা সংস্থা স্কটল্যান্ড ইয়ার্ড পুলিশ স্কোয়াড বা এফ.বি.আই.-এর জন্য দাবী জানালাম। আমার দাবি নাকচ করলেন মুশাররফ জান্তা। নাচককারী সেই মন্ত্রীর নাম আফতাব শেরপা। এর আগে পাকিস্তানের ইসলামাবাদে অবস্থিত মিশরীয় রাষ্ট্রদূতের কার্যালয়ে বোমা হামলা হলে তখন ঐ দুই গোয়েন্দা সংস্থাকে ডাকা হয়। আমি সেই সূত্রমতে তাদেরকে চেয়েছিলাম। এছাড়া ১৯৯৩ সালে তৎকালীন পাকিস্তানের সেনাবাহিনী প্রধান আসিফ নওয়াজ এবং ১৯৯৬ সালে আমার ভাই মুর্তজার মৃত্যুর পরও ঐ দুই সংস্থা এসেছিল তাদের মৃত্যুর কারণ বের করার জন্য। শুধু তাই নয় জেনারেল জিয়াউল হক এবং রাষ্ট্রদূত আনি


www.pathagar.com

র‍্যাফেল-এর অকস্মাৎ দুর্ঘটনায় মৃত্যুর কারণ নির্ণয়ের জন্যও তাদের আনা হয়েছিল। মুশাররফের দীর্ঘ শাসনামলে অনেকগুলো বোমা হামলা এবং খুন হয়েছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় কোনো ঘটনারই সুষ্ঠু তদন্তও হয়নি এবং তিনি করতেও দেননি। তার কারণ, সবগুলোতেই প্রত্যক্ষ এবং পরোক্ষভাবে তার হাত ছিল কিংবা তিনি জানতেন।

১৯ অক্টোবর ২০০৭ সালের আমার ওপর বোমা হামলার মধ্য দিয়ে আমার কণ্ঠ স্তব্ধ করার অর্থ গণতন্ত্র বা ইসলামের যুগোপযোগী ব্যাখ্যাদাতার কণ্ঠকে স্তব্ধ করে দেয়া। শুধু তাই নয়– এই হামলা হলো মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমানের যুদ্ধ, মুসলমানের প্রতি মুসলমানের ঘৃণা, হিংসা, বিদ্বেষ ইত্যাদি ছড়িয়ে দেয়া। যে ধ্বংসাত্মক মনোভাব এবং বিদ্বেষ ততোদিনে ইরাক এবং আফগানিস্তানে ছড়িয়ে পড়েছিল।

সেখান থেকে সেই বিষাক্ত শাসন ব্যবস্থার বেশখানিকটা বাতাস এসে বইতে শুরু করেছিল পাকিস্তানের উত্তর পশ্চিমাঞ্চলের সীমান্তবর্তী পাহাড়ী বা উপজাতীদের মধ্যে বিরাজিত শাসন ব্যবস্থায়। সেসব অঞ্চল তালেবান গোষ্ঠীরা শাসন করতো এবং এই শাসন কাজে পূর্ণ সাহায্য-সহযোগিতা করতো সামরিক জান্তা জেনারেল মুশাররফ। এই বই লেখার কিন্তু মূল চিন্তার কেন্দ্রবিন্দু ছিল জেনারেল মুশাররফ, পাকিস্তানে ইসলাম, গণতন্ত্র এবং মানবতা ও অন্যান্য জনগণের কল্যাণে ও মঙ্গলময় বিষয়গুলোকে জনগণের সামনে বা জগৎবাসীর সামনে তুলে ধরা।

এ যুগে ইসলাম কেমন হবে, গণতন্ত্রের গুণাগুণ, ইসলামে জিহাদের বিষয়কে ভুল বুঝে যারা সন্ত্রাসী বলে সারা বিশ্বে পরিচিত– তাদের বিষয়, তারা কেন ভুল পথে পরিচালিত, কাদের দ্বারা পরিচালিত, উগ্রপন্থী মৌলবাদী বা ইসলামী সন্ত্রাসী দলগুলো কত ভয়াবহ– সেসব বিষয়গুলোকে লেখাও ছিল আমার অন্যতম প্রধান কারণ। তবে সামরিক শাসন এবং সামরিক জান্তারা যে কত হিংস্র, ভয়াবহ এবং দেশের জন্য ক্ষতিকর তা আমি এবং আমার পরিবার খুব ভালো জানি। বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশের জনগণই এখন জানেন এবং বোঝেন।

সামরিক জান্তা মানেই হলো দেশের আত্মাকে ধ্বংস করা। রক্ত-মাংসকে শুকিয়ে ফেলা। কিন্তু মুসলিম বিশ্বে এই শাসন ব্যবস্থা এতো বেশি প্রচলিত যে– এই ব্যবস্থার বেড়াজাল থেকে তারা বেরিয়ে আসতে পারছে না। এই শাসন ব্যবস্থায় জনগণ অতিরিক্ত শাসনে থেকে অবাধ্য হয়ে যায়, গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা হারিয়ে ফেলে।


www.pathagar.com

এসব কথার যুক্তি এবং ফলাফল আমরা খুব সহজেই পাবো যদি গত তিন শত বছরের মুসলিম বিশ্ব এবং পশ্চিমের ইতিহাস ঘেঁটে দেখি। তারা গণতন্ত্রকে চর্চা করছে পরিবার থেকে শুরু করে সর্বত্রই। সাহস, উৎসাহ, চর্চা, উদ্দীপনা এবং প্রাতিষ্ঠানিকভাবে রূপ দেয়ার ফলে আজ তারা গণতন্ত্রের সুফল পাচ্ছে। তারা সফল জ্ঞান-বিজ্ঞান, রাজনীতি, অর্থনীতি, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি, সঙ্গীত, চলচ্চিত্র এবং ধন বিস্তারেও। আমার ব্যক্তিগত অর্জিত অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি গণতন্ত্র হচ্ছে ইসলামের নির্যাস। অন্যদিকে উগ্রমৌলবাদ ইসলামের মহাশত্রু। তারা ভুল বুঝে হয় ইসলাম নিয়ে ব্যবসা করছে নয়তো উদ্দেশ্যপ্রণোদিত হয়ে ইসলামকে ধ্বংস করছে। তাদের কার্যক্রম ইসলামকে শুধু ধ্বংসই করছে না, বিশ্ববাসীর কাছে অর্থাৎ অন্যান্য জাতির কাছে ঘৃণারই করে তুলছে বটে। এই বই লেখার আমার উদ্দেশ্যই হচ্ছে যে এসব বিষয়ের একটি পূর্ণ মীমাংসায় আসা। এভাবে পৃথিবীর মহৎ এবং একমাত্র সর্বোত্তম জীবন ব্যবস্থাকে ধ্বংস হতে দেয়া যাবে না। ইসলাম নিয়ে বিজাতীয়দের মধ্যেই শুধু নয়– বর্তমানে মুসলমানদের মধ্যে মহাভুল বুঝাবুঝি এবং বিতর্কের সৃষ্টি হচ্ছে। যে ভুল বুঝাবুঝির কারণে আজ মুসলিম বিশ্বের সাথে পশ্চিমা বিশ্বের মধ্যে বিশাল সংঘর্ষ বেধে যাচ্ছে। ক্ষুণ্ণ হচ্ছে মানবাধিকার, স্ত্রী ও শিশু অধিকার। সমাজ সংস্কৃতি নষ্ট হচ্ছে। ধ্বংস হচ্ছে ইসলামী জীবনবোধ, মূল্যবোধ। অথচ একমাত্র ইসলামই এসব সমস্যার সমাধান করেছে এবং দিয়েছে সুন্দর সমাধান। সেই সমাধান সুসম্পন্ন হবে গণতন্ত্রের উত্তরণের মধ্য দিয়ে। এই ছোট্ট বইটি লিখে আমি নারীর মূল্যবোধ এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্বে ইসলাম অনুযায়ী নারীর অধিকার দানের জন্য আহ্বান জানাই। যেন তারা শুধুমাত্র নারী নয়– মানুষ হয়ে মান-সম্মান নিয়ে পৃথিবীর এই স্বল্প সময় অতিবাহিত করতে পারে।


www.pathagar.com

## ইসলামকে বিতর্কিত করার এক অজ্ঞ কার্যক্রম ৯/১১-এর হামলা

১১ সেপ্টেম্বর ২০০১ সালে যখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আল-কায়েদা গোষ্ঠী বিমানে হাইজ্যাক করে, তখন আমার মনে হয়েছিল তারা বিমান নয়, তারা আমার ধর্ম ইসলাম এবং ইসলামের মহান শান্তির বাণীকে হাইজ্যাক করছে। শুধু তাই নয়, এই কর্মের মাধ্যমে তারা যন এই শতাব্দীতে নতুন যুদ্ধ শুরু করলো- যা বিশ্বজুড়ে বেশ কিছু মানুষের মতামত। ওই আক্রমণে তিন সহস্রাধিক নিরীহ এবং সরজ-সরল মানুষের মৃত্যু শুধু ইসলামিক জিহাদের নামে আধুনিক সভ্যজগতের মুখে কালিমা লেপনই নয়- এই আক্রমণ ছিল শান্তির ধর্ম ইসলামকে বিতর্কিত করে তোলারও এক অজ্ঞ কার্যক্রম। মূলত সন্ত্রাসীদের দ্বারা পরিচালিত ইসলামের বিপক্ষে এক সফল অভিযান। যে সফলতার ফসল আজকের পৃথিবীতে সভ্য ও শান্তিপূর্ণ ইসলামিক রাজনৈতিক দলগুলো উগ্র মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসী দল বলে পারিচিত, অন্যদিকে তারা অন্তর্গত কুটিল রাজনীতিকে ইসলামের বিরুদ্ধে খুব সহজে সংঘবদ্ধ করতে সদা সচেষ্ট। মোটকথা আধুনিক বিশ্বে ইসলামের মান বা মূল্য এবং সম্মান ও সম্প্রীতির সবকিছু আয়-কায়েদার নানা কার্যক্রমের জন্য নষ্ট হয়। তাদের ভালোমন্দ সব ধরনের কার্যক্রমই সন্ত্রাসী কার্যক্রম বলে ধরা হয়। আল-কায়েদার অকস্মাৎ এমন মাথা তোলার মূল হচ্ছে ইসলামের মাহাত্ম্যকে বুঝতে না পারা বা ভুল বোঝা বা মিশ্রজ্ঞানের প্রতিফলনও হতে পারে। ফলে আল-কায়েদা কতৃক প্রতিটি আক্রমণই মিশ্র প্রতিবাদের সৃষ্টি করে। মুসলমানদের হারিয়ে যাওয়া গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসকে মনে করে তাই আধুনিক বিশ্বের মুসলমানরা তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আজ দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভুগছে। সামনে মস্তবড় প্রশ্নবিদ্ধ ভবিষ্যৎ। আর হবেই বা না কেন? একাধারে একই শতাব্দীতে মাত্র কয়েক দশক আগে-পিছে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় নিউইর্য়ক, ওয়াশিংটন এবং পেনসিলভানিয়ার নানা জনপদ ও বাণিজ্য এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠান এতে শুধু যে ইহুদি-নাছারা বা বিজাতীয়রা ক্ষতিগ্রস্ত হয় তা নয়, এতে বেশি করে ক্ষতিগ্রস্ত হয় মুসলমানসহ পুরো মুসলিম বিশ্ব।

অথচ ইসলাম শিখিয়েছে শান্তি, প্রগতি এবং বিশ্বভ্রাতৃত্ব। এমনকি তার আলোকে রাজনীতি ও মানবতাবাদী সব রকমের যুদ্ধ করার জন্যও আমাকে জন্মগত অধিকার দান করেছে। যার ফলে আমি মানসিক এবং রাজনৈতিকভাবে এত শক্তিশালী।


www.pathagar.com

ইসলাম প্রতিনিয়ত অবিচার, অসমতা এবং মানুষের মধ্যে বিরাজমান সব ধরনের মানবতাবিরোধী কাজের বিরুদ্ধে তার মতামত পেশ করে। কোনো ধরনের নিপীড়ন-নির্যাতন শুধু এর অনুসারীদের ওপরেই নয়, বিশ্বের মানবজাতির ওপরই যে কোনো জোরজবরদস্তি পছন্দ করে না। জাতি, বর্ণ ও লিঙ্গভেদে ইসলামের বাণী সবার পক্ষে সমানভাবে প্রতীয়মান হয়।

ইসলামের এত কিছু গুণ আছে বলেই পশ্চিমা বিশ্বের অর্থাৎ ইউরোপ এবং আমেরিকার বেশকিছু প্রচার মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে নানা ধরনের মিথ্যা প্রচার-প্রচারণা চালানো সত্ত্বেও সে সব দেশে ইসলাম আজ দ্রুত বিস্তৃতি লাভ করছে। ইসলাম ব্যক্তিবিশেষ থেকে শুরু করে সমাজ ও রাষ্ট্রের শান্তি প্রতিষ্ঠার ধর্ম, যা একটি সুনিয়ন্ত্রিত এবং তিনটি স্তর দ্বারা পরিচালিত। যেমন (১) সুরা- যা গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার প্রতিনিধিসভা পার্লামেন্টের মতো রাজনৈতিক মানব সংঘ। (২) ইজমা- সম্পূর্ণ আত্মশুদ্ধি ও আত্মার সচেতন বুদ্ধির এক অসাধারণ অথচ বিজ্ঞানসম্মত কৌশল। (৩) ইজতিহাদ- নিরপেক্ষ বিচার, আইন এবং তার নানা ব্যাখ্যা। আইনের চোখে সবাই সমান বা আইনের উর্ধ্বে কেউ নেই, এই মতবাদ আর কি।

অর্থাৎ পরিষ্কারভাবে বলা যায়, ইসলাম এবং তার গুণাগুণগুলো গণতন্ত্রের পূর্ণ রূপ। এর মূল প্রমাণ ইসলামের সেই গৌরবময় ইতিহাসের সময়কাল। মধ্যযুগে যখন উত্তর ইউরোপে চলছে পেশীশক্তিতে বলীয়ান খুনি, লুটেরা ও ধর্ষণকারীদের স্বেচ্ছাকার আচরণ, তখন ইসলাম বিশ্বে প্রচার করছে শান্তির বার্তা, দেশে দেশে নির্মাণ করছে বিদ্যালয়, বিশ্ববিদ্যালয়, লাইব্রেরি এবং বিজ্ঞানাগার। যার ফলে ওই সময় মুসলমানরা জ্ঞানে-বিজ্ঞানে, সভ্যতা-সংস্কৃতিতে, দর্শন-সাহিত্য চর্চায়, রাজনীতি-অর্থনীতি এবং মানবতাবাদে শীর্ষ শিখরে পৌঁছে যায়। এর মূলে ছিলেন মহামানব এবং জগতের শেষ নবী হজরত মুহাম্মদ (দ.)। কেননা তিনিই প্রথম সমাজে নারীর অধিকারের কথা বলেন এবং বাস্তবে রূপদান করেন। সমাজ সংস্কার থেকে শুরু করে ব্যবসায়-বাণিজ্য, যুদ্ধক্ষেত্র, সর্বক্ষেত্রে ইসলাম নারীর সঠিক বিচরণ নিশ্চিত করেছে। এমনকি পরিবারে, সমাজে, রাষ্টব্যবস্থায় সহ পুরুষের ওপরেও তার আধিপত্য বা অধিকার কতটুকু তা নিশ্চিত করেছে।

এই মহান এবং বাস্তব ধর্মের কথা বুঝতে না পেরে যারা ইসলামের নামে সরল, নিরীহ, নিষ্পাপ, সাধারণ মানুষের ওপর ঘৃণ্য ও জঘন্য হামলা চালায়, তারা কখনই ইসলামের অনুসারী হতে পারে না। তারা তো আধুনিক সভ্যতার ধ্বংসকারী। তারা একাধারে মাদ্রিদ, লন্ডন, রিয়াদ এবং বালিতে আক্রমণ


www.pathagar.com

চালালো। অতঃপর ইসলামের ভ্রান্তধারণাকারী এসব উগ্র মৌলবাদী হিংসাত্মক আক্রমণ চালালো আমার ওপর, আমার শহর করাচিতে ২০০৭ সালের ১৯ অক্টোবরে, এতে প্রাণ হারালো আমার পাকিস্তান পিপলস পার্টির সমর্থক, কর্মী, আমার নিরাপত্তাকর্মী, দেহরক্ষীসহ গণতন্ত্রের জন্য আপসহীন সংগ্রামরত ১৭৯ জন নিরীহ, নিষ্পাপ সাধারণ মানুষ, যারা আমাকে তাদের জীবন দিয়ে বাঁচিয়েছে।

## এরা কারা?

এরা হচ্ছে– এক শ্রেণীর ইসলামের ভ্রান্ত ধারণাকারী উগ্র মানসিকতার মানবতাবিরোধী মানবজাতির শত্রু মানব। ইসলাম যা বলে না, এরা তাই করে। এরা প্রাগৈতিহাসিক যুগের ইসলামের নামধারী লুটেরা। যারা অন্য ধর্ম বা সম্প্রদায়ের মানুষকে সহ্য করতে পারে না। জোর করে চাপিয়ে দিতে চায় নিজেদের ভ্রান্ত ধারণা। বিশ্বসাহিত্য-সংস্কৃতি, জ্ঞান-বিজ্ঞানকে যারা অস্বীকার করে। নারী স্বাধীনতার যারা ঘোরবিরোধী। তাই তারা পারে আমেরিকার নারী স্বাস্থ্য উন্নয়ন কেন্দ্র বা আরব শিশুদের ওপর বোমা হামলা চালাতে।

তারা ম্যাসাকার করেছে ইহুদিবাদ ধ্বংসের নামে পবিত্র নগরী প্যালেস্টাইনের প্রাচীন উপাসনালয়। তারা ইসলামের নামে একের পর এক ধ্বংসযজ্ঞ বা বোমাবাজি চালিয়ে নষ্ট করছে বিশ্বে ইসলামের ভাবমূর্তি। ধর্ম প্রাণতা নয়, ধর্মান্ধতা তাদের প্ররোচিত করছে আধুনিক বিশ্বসভ্যতার অনেক কিছু ধ্বংস করতে। যে ধ্বংসযজ্ঞের কথা ভাষায় প্রকাশ করাটাও সম্ভব নয়। ইসলামের ভ্রান্ত ধারণাকে পুঁজি করে যে যুদ্ধ ওইসব ধর্মান্ধ মানুষ ধর্ম এবং ধর্মের প্রগতির রূপদানকারী, চিন্তাশীল ব্যক্তি, গণতন্ত্রবাদী এবং একনায়কদের বিরুদ্ধে করে যাচ্ছে– তা কখনই ইসলাম সমর্থন করে না।

একবিংশ শতাব্দীর বিশ্ব জেগে উঠছে নতুন এক শান্তিকামী মনমানসিকতা নিয়ে। ইসলাম বিশ্বভ্রাতৃত্বের সেই সাম্যবাদের পেছনে আছে; কিন্তু ইসলামের ভ্রান্ত ধারণায় এসব মানুষ একাধারে আমেরিকা, স্পেন, ব্রিটেন, ইন্দোনেশিয়া, আফগানিস্তান, পাকিস্তান এবং সর্বশেষ ১৯ অক্টোবর করাচিতে আমার এবং আমার দলের ওপর হামলা বা বোমাবাজির পেছনে বিশ্বশান্তি ভঙ্গের এক মহাষড়যন্ত্রের কথাই মনে করিয়ে দেয়।


www.pathagar.com

# জিহাদ হলো নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ সত্যের অর্জন অসত্যের বিসর্জন

আমার দৃঢ় বিশ্বাস ইসলামের ভ্রান্ত ধারণা নিয়ে বিদ্রোহকারীদের কার্যক্রমের দরুন ইসলামে মানবজাতির উদ্দেশ্যে পবিত্র কোরআন শরিফে যে নির্দেশ আছে সে সম্পর্কে বিশ্বের বেশির ভাগ মানুষেরই আজ জিহাদ নিয়ে ভ্রান্ত ও কু-ধারণার সৃষ্টি হয়েছে। জিহাদের মূল চিন্তা-চেতনা প্রকৃত দর্শন থেকে তাই আজ সবাই অনেক দূরে। তার প্রধান কারণ হচ্ছে যে, ইসলামের ভ্রান্ত ধারণা বহনকারী ওই সন্ত্রাসীরা তাদের কর্মকাণ্ডকে অর্থাৎ হত্যাকাণ্ড বা বোমাবাজিকে জিহাদের মূল কাজ বলে উল্লেখ করে। ফলে আজকের বিশ্বে মানবতাবিরোধী এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডকে পশ্চিমা বিশ্বসহ সভ্যজগতের সব শান্তিকামী মানুষেরই আজ ধারণা জন্মেছে যে, ধর্ম-বর্ণ-জাতি, দেশ-কাল ও সমাজভেদে সর্বত্র সবাই উগ্র ধর্মান্ধতার বশবর্তী হয়ে যে বোমাবাজি, হাইজ্যাক ইত্যাদি চালায়- সেগুলো ইসলামিক জিহাদ। এমন মনে করাটা খুব সহজ, কিন্তু সেটা ঠিক নয়। আমাদের উচিত হবে যত শিগগিরই সম্ভব এই ভ্রান্ত ধারণাকে মুছে দেয়া।

আবার বিশ্বব্যাপী কিছু মানুষের ধারণা যে, জিহাদ অর্থ হলো সেনা যুদ্ধ; কিন্তু এটিও ঠিক নয়। জিহাদের সঠিক অর্থ হচ্ছে সত্য ও ন্যায়ের পথে নিজেকে ঠিক রাখা এবং পৃথিবীতে বেঁচে থাকার জন্য নানা বিষয়ের পক্ষে-বিপক্ষে লড়াই করা। সেখানে থাকবে সত্যের অর্জন, অসত্যের বিসর্জন। অর্থাৎ সোজা কথায় জিহাদ অর্থ হলো নিজের মধ্যে যুদ্ধ যুদ্ধ খেলা।

একজন প্রকৃত মুসলমানের জন্য জিহাদ অবশ্য করণীয় বা পালনীয় একটি বিষয়। এখানে একটি বিষয় অবশ্য উল্লেখ্য, জিহাদের বিষয়টি বুঝতে হলে মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর প্রাথমিক জীবনের সঙ্গী-সাথী বা সহচরদের জীবন ও কার্যক্রমকে জানতে হবে, বুঝতে হবে এবং উপলব্ধি করতে হবে। তাদের জীবনটা ছিল পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম। পুণ্যব্রতে নিজেকে আল্লাহর পথে সঁপে দেয়া। এখানে যে কোনো ধরনের হত্যাকাণ্ড বা বোমাবাজি থাকতে পারে না। কল্পনা করাটাও অসম্ভব ব্যাপার। বর্তমানে বেশকিছু মুসলিম দেশে প্রচলিত ধারণা হয়ে গেছে যে, পশ্চিমাদের যে কোনো বিষয়ের বিরোধিতা করাটাই জিহাদ। এ এক মস্তবড় ভুল ধারণা এবং অজ্ঞতা। যে কারণে ওইসব দেশের সঙ্গে পশ্চিমাদের বিরোধ দিনের পর দিন বেড়েই যাচ্ছে। ফলে মুসলিমদের সঙ্গে অমুসলিমদের দূরত্ব বেড়ে যাচ্ছে।



www.pathagar.com

বর্তমানে বিশ্বে আর একটি বিষয় পরিষ্কার, অধিকাংশ মুসলমান মনে করেন বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি, অর্থনীতি, সমাজনীতি, শিল্প-সাহিত্য, সংগীত, সংস্কৃতি, চলচ্চিত্র ইত্যাদির যে অবস্থা– তাতে করে মুসলমান হিসেবে টিকে থাকতে হলে জিহাদ অবশ্য পালনীয়। তারা যখনই দেখছে যে, একটা নির্দিষ্ট কর্তৃত্বপূর্ণ সরকার দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে বিশ্ব, দেশে দেশে বংশ পরম্পরায় ধনীরাই থেকে যাচ্ছে ধনী এবং বাড়ছে তাদের ধন-সম্পদের পরিমাণ, দেশ বা জাতির উন্নতির জন্য ব্যক্তি জীবনের উন্নয়ন ঘটছে অধিকতর, মানুষ হচ্ছে দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর এবং এক সময় ছিন্নমূল– তখন তাদের ভাবনা জিহাদে পরিণত হয়। আবার যখন তারা দেখছে তাদের চারপাশের মুসলিম নারী-পুরুষ এক সময়ে গা ভাসাচ্ছে পশ্চিমা বিশ্বের সংস্কৃতি, পোশাক-পরিচ্ছদে, সংগীতে, টেলিভিশন অনুষ্ঠানে এবং চলচ্চিত্রের জোয়ারে তখনও তারা জিহাদে নামছে। তারা দেখতে পাচ্ছে খুব কৌশলে পশ্চিমা বিশ্বের ধূর্ত সরকারগুলো ধনী বা দরিদ্র মুসলিম দেশগুলো থেকে জনশক্তিসহ খনিজসম্পদ পর্যন্ত মামুলি পয়সার বিনিময়ে নিয়ে যাচ্ছে– শুধু তাই নয়, তারা লুটে নিচ্ছে মুসলিম সভ্যতার নির্দশন; সে সব দেশে এক রকম জোর করেই তাদের পছন্দের সরকারি প্রতিনিধি বসাচ্ছে এবং সমাজগুলোও হচ্ছে পশ্চিমাদের মনের মতো।

সর্বোপরি সত্য কথা হলো, বর্তমান বিশ্বের রাজনীতি বা এমন স্বল্প পরিসরের পুস্তকে জিহাদ নিয়ে আলোচনা করাটা অসম্ভব ব্যাপার। যদি সত্যিকার অর্থে জিহাদ করতেই হয় অন্য ধর্ম বা অমুসলিম জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তা হলে বিশ্বে মুসলমাদের পক্ষে বসবাস করা কঠিন হয়ে দাঁড়াবে, তাদের অনুসরণ করতে হবে বা চর্চা করতে হবে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার। আমার মতে, ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং গণতন্ত্র এক বিষয় নয়– এই দুই ব্যবস্থা এক সঙ্গে চলতে পারে না। অবশ্য দুটো ব্যবস্থার মধ্যে মিল অনেক। যেমন– গণতন্ত্র এবং পবিত্র কোরআন শরিফ কোনোটাই সন্ত্রাসবাদ বা সন্ত্রাসীদের পছন্দ করে না, কিন্তু জিহাদ জায়েজ। অবশ্য গণতন্ত্রে আবার জিহাদের কোনো কথা নেই। ইসলামের ইতিহাসে (আগেই বলেছি) দুই ধরনের জিহাদের কথা আছে। প্রথমত, নিজের সঙ্গে নিজের যুদ্ধ– যে যুদ্ধ একজনকে সুন্দর মানুষ করে গড়ে তোলে। যে অন্তর্যুদ্ধ একজন মানুষের ভেতরের সব কালিমা ধুয়ে-মুছে সাফ করবে, আত্মার উন্নতি ঘটাবে চরমভাবে। মিথ্যা বলার অভ্যাস, ধূর্তামি, ছলনা-চাতুরি সব উড়ে যাবে। এ হচ্ছে অনেক বড় জিহাদ, প্রকৃত জিহাদ।

আর দ্বিতীয় ধরনের জিহাদ হচ্ছে যুদ্ধ বা দ্বন্দ্ব-সংঘাত। মহানবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতিটি যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে বলতেন, একটি অধিকতর কম যুদ্ধ


www.pathagar.com

থেকে এলাম, অথচ আমাদের উচিত প্রতিনিয়ত অধিকতর কঠিন জিহাদ করা, সে জিহাদ নিজের মধ্যে; তাহলে বোঝা যাচ্ছে, যে জিহাদে যুদ্ধ থাকে তার গুরুত্ব অনেক কম, তা ব্যক্তিগত নয়, তা হলো দেশ বা জাতি নিয়ে। অন্তর্গত জিহাদ মানুষ মানুষকে গড়ে আর বাহ্যিক জিহাদ দেশ ও জাতিকে গড়ে। দুটোই মূল্যবান দুভাবে। দুটোই মানবজীবনের মূল্যবান কর্মকাণ্ড। জিহাদ যদিও ইসলামের মূল ৫টি স্তম্ভের মধ্যে নেই- (খারিজি মতবাদ ব্যতিরেকে), তবু শুধু যুদ্ধের অবস্থা বুঝাতে জিহাদ সম্পর্কে পবিত্র কোরআন শরিফে বহুবার বলা হয়েছে; তবে তা বাহ্যিক জিহাদের অন্তর্গত। তবু অন্যান্য ধর্ম যখন খুব সহজেই যুদ্ধকে সহজ করে দিয়েছে- ইসলাম তখন যুদ্ধকে অনুমতি দিচ্ছে শুধু প্রয়োজনের চরম মুহূর্তের জন্য। ইসলাম যুদ্ধ সমর্থন করে না, কেননা এর সঙ্গে ধর্মের কোনো সম্পর্কে নেই। বরং ইসলাম যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানিয়ে আসছে সেই প্রথম থেকেই। অথচ পশ্চিমা বিশ্বের বেশ কিছু তথ্য উদ্ভাবক এবং সমালোচক আরবের প্রাচীন ইতিহাসের আলোকে ইসলাম মানেই যে জিহদ এবং জিহাদ মানেই যে গণহত্যা, বোমা হামলা –এ বিষয়টি বারবার প্রমাণ করার চেষ্টা করছে।

এখানে একটি বিষয় বিশেষভাবে বোঝার আছে, যুদ্ধ যা বাহ্যিক জিহাদ তো সাধারণ মানুষের জন্য মোটেও প্রয়োজন হয় না। যদি ইসলামের ৫টি স্তম্ভের সব কয়টি ঠিকমতো পালন করা হয় তাহলে একজন মানুষ সত্যিকার অর্থে মানুষের পরিণত হবে এবং এভাবে যদি এক সময়ে সমাজের সবাই ভালো মানুষ হয় তাহলে একদিন দেখা যাবে একটি দেশ অতঃপর বিশ্বই শান্তির জায়গা হয়ে দাঁড়াবে। যুদ্ধের তো কোনো প্রয়োজন নেই। যুদ্ধ হলে তাতে মুসলিম, অমুসলিম, স্ত্রীলোক ও শিশুসহ জ্ঞানী এবং অসহায় নিরীহ মানুষ মারা যাবে, ধ্বংস হবে পৃথিবীর অনেক কিছু। পশু-পাখি, গাছ-গাছালি পর্যন্ত নষ্ট হবে, অথচ ইসলাম এসব সমর্থন করে না বরং এনবের ঘোরবিরোধী।

'মানুষ বাঁচাও বা বাঁচতে সাহায্য করো' –এত কোরআনের বাণী। শুধু তাই নয়, কোনো মানুষের জীবন বাঁচানো পার্থিব নানা ফরজ কাজের মধ্যে অনেক উত্তম। যে কারণে আল্লাহ মানবসেবায় যারা নিজেদের সঁপে দেন তাদের সবচেয়ে বেশি ভালোবাসেন। উল্টোদিকে তাই ইসলামে আত্মহত্যারও কোনো সুযোগ নেই। পৃথিবীতে যত কষ্টই হোক সংগ্রাম করে বেঁচে থাকতে হবে, নিজেকে হত্যা করা যাবে না। এটিও বাহ্যিক জিহাদের একটি।


www.pathagar.com

# দক্ষিণ এশিয়ায় চরমপন্থীদের প্রবক্তা মওলানা মওদুদী

ইসলামের জিহাদ সম্পর্কে বুঝতে না পেরে যারা ইসলামের নামে দেশে দেশে বোমাবাজি করছে এবং নানা রকম সন্ত্রাসী হামলা চালাচ্ছে– তারা কেন ভুল পথে চলছে, কিভাবে ওই ভুল পথের যাত্রীদের উত্থান সে সম্পর্কে বলতে গিয়ে তার আগে আমি একটু ইসলামের জন্য নবী যে ৩টি যুদ্ধ করেছিলেন তার কারণটা শুধু বলবো। তা হলে বুঝতে সুবিধা হবে নবীজির কোন কর্মকাণ্ডকে তারা ভুল বুঝছে।

৬২২ খ্রিস্টাব্দে মহানবী হজরত মুহাম্মদ (সা.) এবং তাঁর গুটিকয়েক সঙ্গী মক্কার অবস্থান ছেড়ে মদিনায় চলে গেলেন এবং পৃথিবীর প্রথম মুসলিম ও মুসলিম আইনের শাসনে পরিচালিত রাষ্ট্র গঠন করলেন। ওই সময় এটা ছিল রীতিমতো এক মহাশ্চর্য এবং মহাদুঃসাধ্য কাজ। শুরু হয় ধর্মের বিরুদ্ধে অধর্মের লড়াই, সত্যের বিরুদ্ধে অসত্যের আক্রমণ, পুণ্যের বিরুদ্ধে পাপের প্রচার। সেই চরম সংকটময় মুহূর্তে এক চরম বিপর্যয়ের মুখে পড়ে মহানবী হযরত মুহাম্মদকে (সা.) আল্লাহর নির্দেশে তিন তিনটি যুদ্ধ করতে হয়েছিল। এটি ছিল মক্কা ও তার আশপাশের হিংস্র আল্লাহ বিদ্বেষী, আল্লাহর সৃষ্টির ধ্বংসকারী বন্য পশুর সমান মানুষের বিরুদ্ধে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। কেননা মহানবী (সা.) ধ্বংস হলে তো ইসলাম প্রচার হবে না। যার কারণে আল্লাহরও নির্দেশ ছিল এই আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধের প্রতি।

এখানে আরো একটি কথা বলার আছে যে, আল্লাহ কিন্তু সীমা লঙ্ঘনকারীকে পছন্দ করেন না– তাই এই যুদ্ধ ছিল সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধেও।

মোটামুটিভাবে বলা যায় ভুল পথের যাত্রীরা এই ৩ যুদ্ধের কথাকে স্মরণ করেই তামাম দুনিয়ার মানুষকে সেই ৬২২ খ্রিস্টাব্দের বর্বর মক্কাবাসীর মতো আল্লাহর দুশমন বলে মনে করে ইসলামের নামে জিহাদ ঘোষণা করে দেশে দেশে শিশু হত্যা, নারী হত্যা, নিরীহ মানুষ হত্যা, অপহরণ এমনকি বোমা হামলার মতো মারাত্মক মানবতাবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত, যা আজকের পৃথিবীতে সন্ত্রাসী হামলা বলে পরিচিত। এগুলো প্রাচীন আমলের রোমান রাজা বা ক্রিশ্চিয়ান জেনারেলদের কাজ। যারা শুধু শুধুই নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে গিয়ে এমন বর্বর খেলায় মেতে উঠত। এবার একটু চোখ দেয়া যাক



www.pathagar.com

ইসলামের নামে জিহাদ ঘোষণাকারীদের পৃথিবীতে উত্থান হলো কিভাবে। এরা নিজেদের ইসলামের পুনর্জাগরণের যোদ্ধা বলে ঘোষণা করে। গত ২ শতাব্দী ধরে চলছে এদের কার্যক্রম। এদের মধ্যে কিছু গোঁড়া প্রকৃতির মানুষ আছে যারা পুঁথিগত বিদ্যায় বিদ্বান হলেও পরিত্যাজ্য। যাদের ধ্যান-ধারণায় কোনো নতুনত্ব নেই, যারা ইতিহাস পর্যালোচনা করে বুঝতে পারে না এবং জানতেও চায় না– তারা যে মোতাবেক চলছে তা সঠিক কি না। তারা ভুল করছে না ঠিক করছে। উগ্র চরমবাদী হামলাকারীরা তাদের মতবাদে বিশ্বাস করে অন্ধের মতো সমর্থন করে সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড চালাচ্ছে। যাতে করে নষ্ট হচ্ছে বিশ্ব শান্তি। অথচ মহান ইসলাম বিশ্ব শান্তির কথা বলে। এবং শান্তি রক্ষার জন্য মহান আল্লাহ যুগে যুগে দেশে দেশে ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদে নবী ও রাসুল প্রেরণ করেছেন।

ইতিহাস পর্যালোচনার শুরুতেই বলতে হয় যে, একজন প্রাচীনপন্থী উগ্র ইসলামিক চিন্তাবিদ আহমদ ইবনে তাইমিয়া জানালেন, ইসলামে বারবার জিহাদের কথা বলা হয়েছে এবং সে জিহাদ হলো অমুসলিমদের বিরুদ্ধে। তিনি তার অন্ধ সমর্থকদের বললেন, যারা মুসলমান নয় তারা আমাদের শত্রু। অর্থাৎ তারা ইসলামকে যেভাবে বুঝেছিলেন, কেউ তাদের বাইরের হলেই সে-ই তাদের শত্রু– আর তার বিরুদ্ধে জিহাদ ঘোষণা করো। এবং জিহাদ মানেই যুদ্ধ। তার এই ঘৃণ্য মতবাদ মুদ্রিত হয়ে দেশে দেশে বিতরণ হলো, সঙ্গে সঙ্গে যারা মেনে নিল তারা নানা দেশে নানা ইসলামিক জিহাদের নামে জিহাদি দল গড়ে তুললো। শুরু করলো তাদের সন্ত্রাসী কার্যক্রম। এমন একটি ইসলামী চরমপন্থী দলের সন্ত্রাসী হামলার শিকার হন মিশরের প্রয়াত প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাত। সেই সন্ত্রাসী গোষ্ঠীর নাম ছিল ইজিপশিয়ান ইসলামিক জিহাদ। এর সমসাময়িক আর একটি দল হলো ওসামা বিন লাদনের আল-কায়েদা। তাদের মতবাদ হচ্ছে, তারা সত্য এবং অসত্য বা বিশ্বাসী এবং অবিশ্বাসী বলতে যা বোঝেন তার মধ্যে পড়লে কোনো মাফ নেই। জিহাদ অর্থাৎ আক্রমণ বা যুদ্ধ নিশ্চিত। তবে সেখানে মুসলিমদের কিছু ছাড় দিলেও অমুসলিমদের কিন্তু বিন্দুমাত্র ছাড় দেয়া হবে না।


www.pathagar.com

## লাদেনের চিন্তা-চেতনা কোরআনসম্মত নয়

এবার দেখা যাক আধুনিক বিশ্বের সন্ত্রাসের মহানায়ক ওসামা বিন লাদেন কী বলেন।

১৯৯৮ সালে ওসামা বিন লাদেন আরো একধাপ এগিয়ে নিয়ে বললেন, সন্ত্রাসী হামলা আমরা করি না। আমরা যা করি তা আল্লাহ্‌র ইশারায় হয় এবং সবচেয়ে বড় কথা আমাদের হামলার তোপ থেকে সাধারণ জনগণ এবং সেনাসদস্য কেউই বাদ যায় না।

এখানে একটি কথা না বললেনই নয়, ওসামা বিন লাদেন পবিত্র কোরআনের আলোকে যে ব্যাখ্যা দান করেন তা সম্পূর্ণ তার ব্যক্তিগত চিন্তা-চেতনাপ্রসূত। পবিত্র কোরআন সম্মত হতে পারে না। পবিত্র কোরআনে জিহাদের নামে যে ধর্মযুদ্ধের কথা বলা আছে তা এমন নয়। তা হচ্ছে আত্মরক্ষার জন্য যতটুকু প্রয়োজন ঠিক ততটুকু। আমরা এর প্রমাণ পাবো পবিত্র কোরআন শরিফের বিভিন্ন জায়গায়, বিভিন্ন আয়াতে। সে সব জায়গায় মানব হত্যা, সে যে কারণেই হোক না– একেবারে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়েছে। তাই হলফ করে বলা যায়, ওসামা বিন লাদেন যে মতবাদ নিয়ে এসব কর্মকাণ্ড চালাচ্ছেন তা সম্পূর্ণরূপে ভুলে ভরা। পবিত্র কোরআন তা কোনোভাবেই সমর্থন করে না। একটা কথা মনে রাখার দরকার ওসামা বিন লাদেন আল্লাহ্‌র প্রেরিত কোনো বিশেষ দূত নন। সুতরাং তিনি বললেই আমরা তার মতানুযায়ী কোনো কাজ করতে পারি না। ন্যায় বা অন্যায় পৃথিবীতে আছে– তাই বলে ইসলামের নামে তার মনগড়া এসব সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড তো মোটেই সমর্থন করা যায় না। বরং এসব কর্মকাণ্ডের জন্য বিশ্বব্যাপী মুসলমানরা খামাখা সন্দেহ এবং নির্যাতনের শিকার হচ্ছেন। এতে ক্ষুণ্ন হচ্ছে ইসলামের মহামূল্যমান মর্যাদা। যে কারণে ধর্মযুদ্ধের নামে হামলার শিকার হচ্ছে মুসলমান শিশু ও নারী, সাধারণ মানুষ বা সেনাসদস্যরা। সেগুলো পরিচালনা করছে ওসামা বিন লাদেনদের মতো ভুল পথে চল সন্ত্রাসী উল্টো দিকে ইহুদি বা খ্রিস্টান সন্ত্রাসী গোষ্ঠী। যার পেছনে থাকে প্রতিহিংসা এবং অসৎ রাজনীতি হাসিলের ঘৃণ্য এক চক্রান্তের নীলনকশা। অথচ এই এগুলোও কিন্তু খ্রিস্টান বা ইহুদিদের ধর্মশাস্ত্র সমর্থন করে না। ইসলাম তো সমর্থন করেই না, সমর্থন করলে ইসলামের শ্রেষ্ঠত্ব থাকলো কোথায়?

পবিত্র কোরআন বারবার উল্লেখ করেছে কোনো ধর্মকেই ছোট করে দেখা যাবে না বা কেউ একে অন্যের ওপর জোর করে নিজের ধর্ম চাপিয়ে দেয়ার



www.pathagar.com

চেষ্টা করবে না। এগুলো করলে তো তারা রোমান বা গ্রিস বা স্প্যানিশ বা ওলন্দাজ বা ইংরেজ অত্যাচারী দাস ব্যবসায়ী বা শাসকদের মতো হয়ে যাবে।

বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডে কে থাকবে না থাকবে তা নির্ধারণ করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। তা বুঝেই তিনি সবাইকে জায়গা দেন বা তুলে নেন। সুতরাং আল্লাহর নামে ধর্মযুদ্ধ সম্পূর্ণ ভ্রান্ত এক ঘৃণ্য রুচির পরিচয়। সব মানুষের মধ্যেই একটি ধারণা আছে, যা হলো আমরা সবাই আদম ও হাওয়ার সন্তান। অর্থাৎ আমরা একে অন্যের ভ্রাতা-ভগ্নি বা পিতা-পুত্রের মতো। তা হলে আমাদের মধ্যে এ হামলা বোমাবাজি, হত্যাকাণ্ড, অপহরণের মতো জঘন্য কাজগুলো কেন?

ইসলামের গৌরবোজ্জ্বল ইতিহাসের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই বিশ্বখ্যাত সব মনীষী এবং চিন্তাবিদরা অমুসলিমদের চিরকাল সম্মান ও শ্রদ্ধার চোখে দেখে এসেছেন। তা হলে আজ আমাদের মধ্যে এ হানাহানি কেন?

আমাদের প্রাণপ্রিয় নবী (স.) ৬২২ খ্রিস্টাব্দে যখন মক্কা এবং মদিনা পৃথিবীর প্রথম মুসলিম রাষ্ট্র বলে ঘোষণা দিলেন, তখন সেখানে আরো অনেক অন্যান্য ধর্মের লোকজনের বসবাস ছিল; মহানবী তাদের সর্বোচ্চ নিরাপত্তার জন্য মুজাহিদীন, আনসার এবং ইয়াহুদ নিযুক্ত করেছিলেন এবং তারা সমান অধিকার ভোগ করতেন।

অর্থাৎ মূল কথা একটিই– ওসামা বিন লাদেন বিশ্ববাসীকে যা বুঝাতে চাচ্ছেন তা ঠিক নয়। ইসলামে সন্ত্রাসবাদ, বোমাবাজি বা হামলা, অপহরণের কোনো জায়গা নেই। এটা বিন লাদেনের নিজস্ব মতামত মাত্র।


www.pathagar.com

# গণতন্ত্র নয়, পশ্চিমাদের কাছে বড় বিষয় স্বার্থ হাসিল হলো কিনা

বর্তমান বিশ্ববাসী মুসলমানদের এবং তাদের সমান ও রাষ্ট্রকে বেশ ছোট করে দেখে। কিন্তু তাদের ধারণা নেই যে, ইসলাম কত বিশাল এবং কত মহৎ। তাই তাদের এই প্রচলিত বদ্ধ ধারণা থেকে তারা বিশ্বাস করে যে, ইসলামে কোনো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার স্থান নেই। এমনকি তাদের মূল্যবোধও গণতন্ত্রের পক্ষে নয় এবং ইসলামই হচ্ছে গণতন্ত্রের প্রধান অন্তরায়। তারা বলে– ইসলাম হচ্ছে একনায়কতন্ত্রের হোথা। সেখানে সুলতান-বাদশাহ বা সেনাপতিদের জয়জয়কার। কিন্তু এ ধারণা সর্বৈব মিথ্যা। আমি প্রচণ্ডভাবে এ ধারণার প্রতিবাদ করি এবং প্রত্যাখ্যান করার আহ্বান জানাই। কেননা এই ধারণার মধ্যে ঐতিহাসিক সত্যতা নেই। কোনো তত্ত্বেই এর প্রমাণ হবে না। তবে ইসলাম যে গণতন্ত্র পছন্দ করে না– এমন ভুল ধারণা মুসলিম দুনিয়ায় দীর্ঘদিনের শাসনকারী বাদশাহ-সুলতান বা সেনানায়কদের জন্যই অমুসলিমদের মধ্যে জন্মেছে। পৃথিবীর যে দিকেই তাকানো যাক না কেন আজো দেখা যাবে মুসলিম দুনিয়ায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা রয়েছে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে সুলতান-বাদশাহ বা সেনানায়কদের হাতে। গণতান্ত্রিক পরিবেশ বা পরিস্থিতি সৃষ্টির কোনো লক্ষণ দেখা যাচ্ছে না।

ঊনিশ শততের মাঝামাঝি এবং বিংশ শতাব্দীর প্রায় পুরোটাই গণতন্ত্রায়নের পদক্ষেপের নামে পশ্চিমা বিশ্ব যেসব পদক্ষেপ নিয়েছে তা অন্তত মুসলিম দুনিয়ার জন্য ভালো ছিল না। পশ্চিমাদের ওসব পদক্ষেপ মেনে নেয়ার কারণ অবশ্য জেনারেল মুশাররফদের মতো ক্ষমতালোভী সেনানায়কদের নতজানু মানসিকতা।

গণতন্ত্রের নামে মুসলিম বিশ্বে নেয়া পশ্চিমাদের সব পদক্ষেপই উদ্দেশ্যমূলক এবং সে উদ্দেশ্যগুলো অত্যন্ত হীন ও ষড়যন্ত্রে ভরপুর। ব্যাপারটা গাছে তুলে দিয়ে মই কেড়ে নেয়ার মতো আর কি। গণতন্ত্রের নামে, নির্বাচনের নামে, প্রশাসনের নামে, ধর্মের নামে তারা বিভিন্ন দলের পিছনে থেকে রাজনৈতিক কোন্দল বাধায়। মুসলিম দেশগুলোতে গণতন্ত্র চর্চার আবহকে ধ্বংস করার জন্য তারা বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়। এভাবেই পশ্চিমা বিশ্বের সঙ্গে, তাদের গণতন্ত্রের চর্চা এবং শাসন ব্যবস্থার সঙ্গে ইসলামের এক বিশাল পার্থক্য দেখা দিয়েছে– যা দিনে দিনে আরো প্রকট হচ্ছে।



www.pathagar.com

আমার আর একটি ধারণা আমি মনে করি একেবারে সঠিক, তা হলো– গণতন্ত্রের নামে ইসলামী বিশ্বে যে আন্দোলন তাতে পশ্চিমাদের সমর্থন অত্যন্ত গৌণ। বরং গণতন্ত্রের আন্দোলনকে প্রতিহত করার জন্য জেনারেল মুশাররফদের মতো সেনানায়ক বা বাদশাহ-সুলতানদের তারা ক্ষমতায় বসায়। সত্যি কথা বলতে, আজকের বিশ্বে ইসলামিক জঙ্গি সংগঠনগুলোর জন্ম তাদের এই হীন এবং ভয়াবহ রাজনীতিকে প্রতিহত করার জন্যই। শুধু তাই নয়, এসব গোষ্ঠীর মধ্যে অনেকগুলো তাদের সমর্থনপুষ্ট, ফলে পশ্চিমা বিশ্বের কিছু বিষয় মুসলিম বিশ্বে সমাদৃত হলেও তাদের রাজনীতি এবং শাসকগণ মুসলমানদের কাছে রীতিমতো অগ্রহণীয় এবং ঘৃণার। অথচ জন্মের পর থেকে আমার বেশ ভালো একটা ধারণা ছিল– তাদের গণতন্ত্রের চর্চা এবং সমর্থন অন্তত বিশ্বব্যাপী গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পূর্ণ সমর্থনের প্রতি। মাঝে মধ্যে আমি ভয় পেয়ে যাই একজন মুসলমান বলে; এবং একজন গণতন্ত্রের চর্চাকারী বলে। আমার মাথার ওপর ফণা ফেলে আছেন পশ্চিমা বিশ্বের মদদপুষ্ট জেনারেল মুশাররফ। মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রের চর্চা বা বিকাশ বা তার পূর্ণতা এর কোনোটিই পশ্চিমা বিশ্বের কূটনীতিকরা মেনে নিতে পারেন না। তবে হ্যাঁ, যদি গণতন্ত্রের নামে এক জগাখিচুড়ি মার্কা শাসন ব্যবস্থা কায়েম করে তাদের উদ্দেশ্য সাধন, ব্যবসা-বাণিজ্য, মিশনারিদের অবাধ বিচরণের সাহায্য করা যায় তাহলে কোনো কথা নেই– সে বাহবা পাবে, যেমন পায় তুরস্ক। ইউরোপের বেশ এক উন্নত দেশ হলেও ইসলামের কোনো চিহ্ন সে দেশে নেই– কি শাসন ব্যবস্থা, কি শিল্প সাহিত্য-সংস্কৃতি-সভ্যতায়; কোথাও নেই।

উল্লিখিত মতবাদের আরো একটি প্রমাণ মেলে মিয়ানমারের দিকে তাকালে। সেনা ক্ষমতায় পরিচালিত দেশটি এক আবদ্ধ খামারের মতো। জনগণ খামারের লালিত-পালিত হাঁস-মুরগি বা গরু-ছাগলের মতো। অথচ তাদের নিয়ে পশ্চিমাদের কোনো মাথাব্যথা নেই। কেননা মিয়ানমার জান্তাদের দ্বারা পশ্চিমাদের হীন উদ্দেশ্যগুলোর বাস্তবায়ন ঘটে। যেমন– ব্যবসা-বাণিজ্য পরিচালনা, আন্তর্জাতিক সমুদ্রসীমার রক্ষণাবেক্ষণ, এমনকি পূর্ব-প্রাচ্যের নানা গোপন সংবাদ আদান-প্রদানের মতো ভয়ঙ্কর ব্যাপারগুলো। অর্থাৎ গণতন্ত্রের বাস্তবায়ন নয়, পশ্চিমাদের কতটুকু স্বার্থ হাসিল হচ্ছে, সেটিই বড় বিষয়।

এ ব্যাপারে আরো একটি বাস্তবতা হচ্ছে পশ্চিমা বিশ্ব বলতে ইউরোপের পেছনে সব সময় ছায়াসঙ্গী হয়ে আছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। বর্তমানে তার মদদে চলছে গনতন্ত্রকে ধর্মের মত মনে করে, গণতন্ত্রের উত্তরণের নিয়ম-কানুনগুলো ধর্মের এক একটি স্তবক বলে মনে করে চালিয়ে যেতে হবে আন্তর্জাতিক রাজনীতি। ভাবটা এমন যে, গণতন্ত্র যেন ঈশ্বর প্রদত্ত। এবং এ কারণে ভোটের


www.pathagar.com

অধিকারকে তারা জন্মগত এবং ঈশ্বর প্রদত্ত অধিকার বলে প্রচার করছে। অমুসলিমরা তো সমর্থন করছেনই সঙ্গে সঙ্গে বাধ্য হয়ে মুসলমানরাও লাফাচ্ছে; কিন্তু কোনো লাভ নেই। যদি কোনোভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এসেই যায়– তাহলে ধর্মের মতো করে পশ্চিমাদের নির্ধারিত এবং নির্বাচিত মতবাদে গঠিত সরকারকে তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য দ্বিপক্ষীয় নানাবিধ অপ্রয়োজনীয়, অকার্যকর এবং অকল্যাণকর চুক্তিতে নাম লেখাতে হবে। আমি এই মতবাদে বিশ্বাসী নই, তাতে আমার মরণ স্বীকার। যে জন্য প্রকাশ্য জনসভায় লাখ লাখ জনতার সামনে আমি বহুবার এ কথা বলেছিও গণতন্ত্র, শাসন ব্যবস্থা, মানুষের মুক্তি, মানবতা, অধিকার, স্বাধীনতা, নিজ নিজ ধর্ম ও সংস্কৃতি সটিকভাবে পালন করতে পারার মতো পবিত্র দায়িত্ব পালন করার বিধিব্যবস্থা– এখানে বাধ্যতামূলক কোনো চুক্তি সম্পাদনার কথা বলা হয়নি। তাই আমি তা মানতে পারি না। নীতির বরখেলাপ হয়।

আরো একটি কথা না বললেই নয়, ইসলাম গণতন্ত্রকে সমর্থন করে একনায়কত্বকে নয়। কেননা একনায়কতন্ত্র যদি খারাপ হয় তাহলে তার প্রণেতা বা কায়েমি মানুষগুলোও খারাপ। শুধু কি তাই, একনায়কতন্ত্র প্রবর্তন এবং পালনকারীরা সত্যের বিরুদ্ধে থাকে। দেশে কোনো ধরনের আন্দোলন-উত্তাপ থাক বা না থাক– তারা যেন কোনো এক চিরকালীন অব্যর্থ শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতেই থাকে।

পশ্চিমারা গণতন্ত্র বলতে বা মানবতা বলতে যে সংজ্ঞা নির্ধারণ করে দিয়েছে– তার বাইরে গেলেই বিপদ। বিশ্বব্যাপী সাড়া পড়ে যায় যে অমুক দেশে বিপন্ন হচ্ছে গণতন্ত্র, ধ্বংস হচ্ছে মানবতা। অর্থাৎ বর্তমানে বিশ্বব্যাপী গণতন্ত্র আনতে হবে পশ্চিমাদের পছন্দসই গণতন্ত্র। যা ইসলাম মোটেও সহ্য করে না। অবাক হলেও সত্য যে, পাকিস্তানের সামরিক শাসক জেনারেল মুশাররফ ছিলেন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের আশীর্বাদপুষ্ট। এবং তাকে দিয়ে যতদিন তাদের উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছে ততদিন তাকে ক্ষমতায় রেখেছে। স্বার্থ নেই তো মোশাররফও পদচ্যুত। স্বার্থটা কি? না, সন্ত্রাস দমনের নামে লুট, হত্যাযজ্ঞ এবং দেশ উদ্ধারের নামে ইরান, আপগানিস্তানে যুদ্ধ করার জন্য একজন প্রাণপুরুষ প্রয়োজন এবং সে পুরুষই হলো জেনারেল মুশাররফ। ইরান-আফগানিস্তান থেকে শুরু করে ইরাক, মধ্যপ্রাচ্য পর্যন্ত মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা কায়েমের জন্য বদ মতলবগুলোর কিছুটা হলেও বাস্তবায়ন করতে পেরেছে জেনারেল মুশাররফের কারণে। শুধু তাই নয়, ইসলামিক সুস্থ মনের মূল ভাবধারার অনেক দলকেই সন্ত্রাসবাদীদের দল বলে প্রচার করতে জেনারেল মুশাররফের বিশ্বব্যাপী পদক্ষেপ গ্রহণ ছিল মার্কিনিদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।


www.pathagar.com

বর্তমান বিশ্বের মুসলিম দেশগুলোতে কেন বাদশাহ্ বা সুলতান বা সেনানায়কদের এত রমরমা অবস্থা তা আমার কাছে মোটেও বোধগম্য নয়। খুব অল্প কটি দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে প্রচলিত করার জন্য চলছে আপ্রাণ চেষ্টা। অথচ ইসলামের কথা বলে গণতন্ত্রকে নাজেহাল করছে ইসলামি চরমপন্থীদের কেউ কেউ। যারা ইসলাম বা গণতন্ত্র কোনোটিকে না বুঝেই ইসলামি জেহাদের নামে ভুল পথে চলছে।

এর মূলে আমি বলবো, আমাদের সামান্যতম সহনশীরতার মনোভাব নেই। আমরা যেন কাউকেই সহ্য করতে পারি না। আমাদের অভ্যন্তরীন জাতি বা গোত্রগত অন্তর্দ্বন্দ্ব, সংখ্যালঘুদের অসম্মান করা বা তাদের মেনে নিতে না পারা, অত্যন্ত অন্তর্মুখনীতা এবং সর্বপরি সেনা শাসনপ্রিয়তা। এবং যার পেছনে চরমপন্থী বা মৌলবাদী গোষ্ঠী কিংবা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতায় বেড়ে ওঠা উটকো ও নীতিহীন জনপ্রিয় নামধারী রাজনৈতিক নেতাদের গোপন মদদ। মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র মানায় না বা কখনো কায়েম হবে না। এমন কথা নেহায়েত পশ্চিমা মিডিয়া সন্ত্রাীদের রটানো এক ধরনের বানোয়াট মিথ্যা অপপ্রচার। যে কারণে বিশ্বব্যাপী মুসলিমদের এমন একটি দোষে দোষী করা হচ্ছে; কিন্তু এটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। কেননা ইসলাম মানুষের কথা বলে, মানুষের অধিকার আদায়ের কথা বলে। মানব জাতির জন্য অকল্যাণকর কোনো বিষয়কেই ইসলাম বরদাস্ত করতে পারে না। সমগ্র মুসলিম বিশ্বে অন্যান্য শাসন ব্যবস্থার চেয়ে ইসলাম বেশি জনপ্রিয় এবং গ্রহণযোগ্য, তা বর্তমান বিশ্বে বহুবার বিভিন্ন দেশে বিভিন্ন দশকে বারবার প্রমাণিত হয়েছে।


www.pathagar.com

# গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের চিরন্তন সত্যের অধিকার

একটি নিরপেক্ষ ও সর্বজনস্বীকৃত সত্য কথা না বলে পারছি না, প্রতিটি মুসলমান এবং অমুসলমান মানুষের পৃথিবীতে গণতান্ত্রিক নীতিতে বসবাস করার একটি যেমন জন্মগত অধিকার রয়েছে, তেমনি আছে চিরন্তন বা শাশ্বত সত্যের অধিকার। কিন্তু সে অধিকার মুসলমান একনায়ক বা সেনানায়ক বা বাদশাহ বা সুলতানরা মেনে নিতে চান না। তাই তাঁদের চক্রান্তের কারণে নানা ফন্দি-ফিকিরের দরুন এসব বিপথগামী রাষ্ট্রনায়ক যেমন গণতন্ত্রের বাইরের মানুষ বলে পশ্চিমাদের কাছে পরিচিত, তেমনি মুসলমান অধ্যুষিত দেশগুলোর জনগণকেও তাঁরা গণতন্ত্রের বিপক্ষের মানুষ বলে ধারণা করেন। আলোচনার এই স্থানে আমি একটি জিনিস বলবো, যা আমি মনেপ্রাণে বিশ্বাস করি, তাহলো– স্বাধীনতা এবং সমতা –এ হচ্ছে মানুষের জন্মগত এবং চিরন্তন অধিকারের ফসল। এ দুয়ের মূল্যও চিরন্তন ও শাশ্বতকালের মানব জীবনের সবকিছুর ঊর্ধ্বে। শুধু তাই নয়, এই চিরন্তন অধিকারের মূল্য নির্ভর করে দেশ ও জাতির সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম, আদিম জনগোষ্ঠী এবং স্ব-স্ব সম্প্রদায় বা গোত্রের জাতিসত্তার ওপর। মনে রাখা দরকার, গণতন্ত্র মানে পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলোর চাপিয়ে দেয়া কোনো পছন্দসই শাসন ব্যবস্থা নয়। বারবার বলেছি, গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের চিরন্তন সত্যের অধিকার, সর্বোপরি মানুষের জন্মগত অধিকার, এখানে কোনো দেশ বা জাতির নিজস্ব চিন্তা-চেতনা প্রশমনের কোনো অধিকার নেই। সুদূর ইন্দোনেশিয়া থেকে লুইজিয়ানা পর্যন্ত এটি মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার ধর্ম, বর্ণ, জাতিভেদে এক– সে ধনী দেশের জনগণ হোক আর হোক গরিব দেশের জনগণ।

এ প্রসঙ্গে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময় তৎকালীন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের স্ত্রী ফার্স্টলেডি ইলিয়ানর রুজভেল্ট এবং ওয়েনডেল উইলকি –দুজনে মিলে ফ্রিডম হাউস নামে একটা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন। যেখানে সারাবিশ্বের শান্তিকামী গণতন্ত্রের পক্ষের নেতা, পণ্ডিত এবং তাত্ত্বিকদের নিয়ে গণতন্ত্রের অবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলনের ফলে কোন দেশের অবস্থা কি, তার চুলচেরা বিশ্লেষণ করা হতো। অবশ্য ফ্রিডম হাউস মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সরকারের বানানো কোনো প্রতিষ্ঠান ছিল না। এটি তাবৎ বিশ্বের গণতন্ত্রের পক্ষের পণ্ডিতদের একটি গবেষণার কেন্দ্র ছিল, বলা যায় আন্তর্জাতিক এনজিও ধরনের। তবে তার নাম, যশ এবং প্রভাব-প্রতিপত্তি ছিল


www.pathagar.com

বিশাল, যার সদস্যরাও ছিলেন নিবেদিতপ্রাণ গণতন্ত্রের মানসপুত্র। গবেষণার পাশাপাশি তদের কাজ ছিল গণতন্ত্রের সুরক্ষা, মানুষের জন্মগত অধিকার এবং স্বাধীনতা ও সাম্যের জন্য লড়াই করা। এর জন্য ফ্রিডম হাউস সারা পৃথিবী থেকে গণতন্ত্রের তাত্ত্বিক পণ্ডিতদের সেখানে গবেষণার জন্য নিয়োগ দিতেন। তারা সারা বিশ্বের মানুষকে জাতি, ধর্ম, বর্ণভেদে দুটি প্রধান ভাগে ভাগ করলেন, যথা– একেবারে স্বাধীন এবং আংশিক স্বাধীন। এই দুই স্তরে ভাগ করা হয় রাজনৈতিক অবস্থার ওপর নির্ভর করে। এই নির্ভরতা আবার চালিয়ে যাওয়া হয় দেশের সরকারের জনগণের জন্য চালানো কার্যক্রম, রাজনীতিতে বহুদলীয় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চর্চা এবং নির্বাচন ও নির্বাচন সম্পন্নের আগে ও পরের পদ্ধতির ওপর। সেগুলোর গবেষণাপত্রগুলো এক জায়গায় করে মান বণ্টন করা হতো। তারপর মানুষের একেবারে মৌলিক চাহিদা পূরণে সব মান অর্জনকারী দেশগুলোকে মানের উচ্চ ক্রমানুসারে নিম্নমান পর্যন্ত বণ্টন করা হতো। এরপর সেসব দেশের জনগণের নাগরিক অধিকার, স্বাধীনতা এবং মানবাধিকারের দিকটি লক্ষ্য রেখে তিনটি স্তরে ভাগ করা হতো। যেমন– একেবারে স্বাধীন, আংশিক স্বাধীন এবং স্বাধীন নয় –এমন তিন স্তরে সাজানোর পর সেসব দেশে স্বাধীনতা, সাম্য, মানবাধিকার এবং গণতন্ত্রের চর্চার বাধা প্রদানকারি বিষয়গুলো নিয়ে গবেষণা চালানো হতো। তারপর বিশ্বব্যাপী তারা গণতন্ত্রের অন্তরায়মূলক চিরাচরিত রাজা-বাদশাহ, সুলতান বা সেনানায়কদের বিপক্ষে জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর জন্য বা স্বাধীনতা, সাম্য এবং গণতান্ত্রিক চিরন্তন অধিকারের জন্য বিশ্ব জনমত গড়ে তুলতে সাহায্য করতো।

এতক্ষণ এ কথাগুলো বলার কারণ হচ্ছে– যে মুসলিমপ্রধান দেশগুলোর চিরাচরিত বা প্রাচীনপন্থীর শাসন ব্যবস্থার ফসল হিসেবে যুগ যুগ ধরে যেসব বাদশাহ বা সুলতান ক্ষমতায় বসে আছেন তাঁরা না গণতন্ত্রের পথের, না মহৎ কোরআন শরিফের আলোকের। তাঁদের শাসন ব্যবস্থা এবং তার ফলস্বরূপ জনগণের অবস্থা পবিত্র কোরআন সমর্থন করে না। যার প্রতিফলন পাওয়া গেছে পরবর্তীকালে দেশে দেশে গণতন্ত্রের চর্চায় মুসলমান এবং অমুসলমান দেশের রাজনৈতিক অবস্থার পর্যালোচনা করা হয়েছে, তখন। যে পর্যালোচনার উদগাতা ওই ফ্রিডম হাউস। ফ্রিডম হাউসের অমন চমকপ্রদ ও তথ্যবহুল পরিসংখ্যানের জন্য মুসলমানদের চমকে ওঠার কোনো কারণ নেই। কেননা অমুসলমানদের দেশেও অমন অবস্থা আছে, তবে সত্য হলো এই যে, সে সব দেশের সংখ্যা একেবারে কম। এখানে একটি বিষয় মনে রাখা দরকার, মুসলমান জাতি একেবারে অন্য রকমের। তাদের সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষের কোনো বিষয়েই


www.pathagar.com

কোনো মিল নেই। যদিও মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে পবিত্র কোরআন শরিফের আইন-কানুন যৎসামান্য ব্যবহার করা হয়– তাই রাজনীতিতে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার সামান্য ছিটেফোঁটা হলেও তার প্রভাব রাষ্ট্রীয় এবং সমাজ জীবনে বেশ দেখা যায়। আর অমনি তখন পশ্চিমারা মৌলবাদী বলে নানা রকম অপপ্রচার চালায়। কিন্তু গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থা ইসলামী আইন-কানুন খুব ধীরে মিশিয়ে দিলে তখন দেখা যাবে তা ইরান বা কাজাখস্তানের মতো রাষ্ট্রে পরিণত হয়েছে। সারা পৃথিবীতে সমালোচিত রাষ্ট্র হিসেবে পরিচিতি লাভ করবে। অবাক হলেও সত্য কথা যে, মুসলমান অধ্যুষিত ৪৫টি দেশের মধ্যে ইন্দোনেশিয়া, মালি এবং সেনেগালের জনগণ সত্যিকার অর্থে স্বাধীন বলা যায়। ১৮টিকে আংশিক স্বাধীন হিসেবে ধরা হয়, যেমন– আফগানিস্তান, আলবেনিয়া, বাহরাইন, বাংলাদেশ, জিবুতি, জর্ডান, জাম্বিয়া, কুয়েত, কিরগিজস্তান, তুরস্ক, লেবানন, মালয়েশিয়া, মৌরিতানিয়া, মরক্কো, নাইজার, সিয়েরা লিওন এবং ইয়েমেন। অন্য ২৫টি দেশ, যেমন– আজারবাইজান, মিশর, ব্রুনাই, ইরান, প্যালেস্টাইন, গিনি, ইরাক, লিবিয়া, মালদ্বীপ, ওমান, কাতার, কুযেত, পাকিস্তান, সৌদি আরব, সোমালিয়া, সুদান, সিরিয়া, তাজিকিস্তান, তুর্কমেনিস্তান, সংযুক্ত আরব আমিরাত, উজবেকিস্তান এবং পশ্চিম সাহারার জনগণ স্বাধীন নয়।

এখানে আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করার মতো এই যে, আরব বিশ্ব এবং অনারবীয়দের মধ্যে আবার জনগণের স্বাধীনতার হেরফের আছে। একজন আরবীয় খাস মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও সে অনারবীয় একজন মুসলমানের চেয়ে অনেক বেশি পরাধীন। তার স্বাধীনতাকে গ্রাস করে রেখেছে রাজা-বাদশাহ বা সুলতান-সম্রাটের মনগড়া কোনো ইসলামিক আইন– যা আদৌ পবিত্র কোরআনসিদ্ধ নয়। যাই হোক, গণতান্ত্রিক শাসনব্যস্থা রাতারাতি গড়ে ওঠার মতো কোনো বিষয় নয়। এটি চর্চার বিষয় এবং এর জন্য প্রচুর কালক্ষেপণের প্রয়োজন আছে। পূর্ণ গণতন্ত্র কায়েমের জন্য শুধু নির্বাচন সম্পন্ন বা কঠোর আইন প্রয়োগ ইত্যাদি কাজগুলো করলেই হবে না, জনগণকে প্রকৃত শিক্ষাদান করে সচেতন করতে হবে। এর জন্য চায় সরকার এবং এনজিও গুলোর গণতন্ত্র কায়েমের উপযুক্ত কার্যক্রম এবং বাস্তব পদক্ষেপ। আর সবার ওপরে থাকতে হবে রাজনৈতিক দলগুলোর সদিচ্ছা। সত্যিকারের গণতন্ত্র আনতে দেশে প্রয়োজন প্রচলিত বা প্রাচীন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক ভাবধারার শাসন ব্যবস্থাকে তুলে ফেলে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে সরকার গঠন করে দেশকে একটি সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ হিসেবে গড়ে তোলার জন্য একটি নির্দিষ্ট পথে


www.pathagar.com

সংগ্রাম চালিয়ে যাওয়া। যেখানে থাকবে, মানুষের নিরাপত্তাদানের নিশ্চয়তা, স্বাধীন এবং পৃথক বিচার বিভাগ, অবাধ, নিরপেক্ষ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের অঙ্গীকার, সুশীল সমাজ পরিচালিত নানাবিধ কর্মকাণ্ড, মানবাধিকার বাস্তবায়ন, বাক স্বাধীনতা অর্থাৎ অবাধ তথ্যপ্রবাহের এ যুগে স্বাধীন সংবাদপত্র ও রেডিও এবং টেলিভিশন।

উন্নত বিশ্বে এখন গণতন্ত্রের চর্চা ঘটছে সাংঘাতিকভাবে। তারা মুসলিম দেশগুলোর কাছে থেকে ধরাছোঁয়ার বাইরে। কিন্তু তাদের মতো বাহ্যিক অন্যান্য বিষয়ে উন্নত মুসলিম দেশগুলো একনায়ক বা সেনানায়ক বা রাজা-বাদশাহ, সম্রাট-সুলতান দ্বারা শাসিত কেন? উত্তরে বলা যায়- সে সব দেশে গণতন্ত্রের প্রথম শর্ত অবাধ নির্বাচন, তা শূন্যের কোঠায়। ফলে সে সব দেশে গণতন্ত্রের মরণ হয়েছে। কেননা, নির্বাচনই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার পূর্বশর্ত। কিন্তু ধনী মুসলিম দেশগুলোতে যা চলছে তা হলো নীরব একনায়কতন্ত্র। একটা গণতন্ত্রের সম্পূর্ণ বিপরীতধর্মী শাসন ব্যবস্থা।

এখানে উদাহরণস্বরূপ যদি আমি একটি গাছের কথা বলি তাহলে বলতে হবে, শুধু বীজ বা চারা মাটিতে পুঁতে দিলেই চলবে না, তাতে সময়মতো আলো, বাতাস ও পানির ব্যবস্থা করতে হবে। অন্যথায় গাছটি মারা যাবে। তেমন গণতন্ত্রের জন্য এ প্রবন্ধে দু'বার উল্লিখিত বিষয়গুলো বিশেষভাবে প্রয়োজন। অন্যথায় গণতন্ত্রকে অর্জন ও তার চর্চা, সর্বোপরি তাকে টিকিয়ে রাখা তো যাবেই না, উপরন্তু হয় চরমপন্থী কোনো দল বা সেনানায়ক ক্ষমতা দখল করে এমনভাবে বসবে যে, দেশের রাজনীতির মেরুদণ্ড ভেঙে চুরমার করে দেবে। দেশ ডুববে সীমাহীন এক অন্ধকারে, রাজনৈতিক সংকটে। সেখান থেকে উঠে আসা অত্যন্ত কঠিন হবে সবার পক্ষে।


www.pathagar.com

# পাকিস্তান বর্বরতা পরিহার করে সভ্যতার পথে পা বাড়াচ্ছে

যে কথাটি এতদিন বলবো মনে করেছি কিন্তু পারিনি, সেটি হলো– গণতন্ত্রকে আনতে হলে বা তার চর্চাকে শুরু করতে হলে আমাদের সবাইকে বাস্তববাদী হতে হবে। স্বাভাবিকভাবেই আমাদের চেয়ে পশ্চিমা বিশ্বের মানুষ বা মার্কিনীরা অনেক বেশি বাস্তববাদী– যা গণতন্ত্রায়নের জন্য অবশ্য প্রথম শর্ত। এ শর্তের বাইরে গেলে চলবে না। এ প্রসঙ্গে এক সময় জন এফ কেনেডি নিজেকে উদাহরণ দিয়ে বলেছিলেন, 'গণতন্ত্রায়নের জন্য ভাববাদীদের মতো নানা ভাবনা নিয়ে বসে থাকলে চলবে না। এক ঘোর অমানিশার মধ্যে থাকলে চলবে না। নিজেকে সব কাজের মধ্যে গণতান্ত্রিক হতে হবে। তা না হলে বিপন্ন হবে কাঙ্ক্ষিত গণতন্ত্র।'

আমার মতে গণতন্ত্র কেমন হবে, এর জন্য কী করতে হবে বা নিজেকে কেমন করে গড়ে তুলতে হবে তার পথনির্দেশ এমন মতবাদের চেয়ে আরো ভালো কিছু হতে পারে না। এটিই যথার্থ উদাহরণ। এ মত অনুযায়ী যদি আমার দেশ পাকিস্তানের কথা বলা যায় তাহলে বলবো, পাকিস্তানে বিপন্ন হয়েছে গণতন্ত্র। ধ্বংস হয়েছে মানুষের গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ। অনেক রক্তদান আন্দোলন-সংগ্রামের পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে সুবাতাস প্রবাহের এক সুন্দর সময় আসছে। পাকিস্তান নামে এ সুন্দর দেশটি অসুন্দরের প্রতিনিধি একনায়কত্বের ধ্বজাধারী উদ্ধত সেননায়কের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। এটি আনন্দের সংবাদ, সুখের সংবাদ। সর্বোপরি এটিকে একটি বিজয় বলবো মুসলিম বিশ্বের। বিজয় বলবো একটি শক্তিশালী মুসলিম দেশের জন্য গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানোর বা ওই শাসন ব্যবস্থাকে অর্জন করে নেয়ার। তারা বর্বরতা পরিহার করে সভ্যতার পথে পা বাড়াচ্ছে। এর অবশ্য একটা কারণও আছে। তারা জানে, যে দেশে ক্ষমতা আঁকড়ে ধরে রাখে কোনো এক ক্ষমতালোভী একনায়ক বা সেনানায়ক– তারা ক্ষমতার লোভে ভয়ঙ্কর হতে পারে। তাদের বর্বরতা শয়তানকেও হার মানায়। আমি মনে করি, ইসলাম, গণতন্ত্র এবং পশ্চিমা বিশ্ব, তাদের জীবনধারা বা সবকিছু ছেলেবেলা থেকেই আমার পরিবার, সমাজ, সংস্কৃতি, সভ্যতা ও ধর্ম থেকে বেশ ভালোভাবেই অর্জন করেছি এবং বলতে পারি, সেই দৃষ্টিকোণ থেকেই আমি বুঝি যে গণতান্ত্রিক সরকার কত জনদরদি এবং একনায়করা কত জনশত্রু। শান্তির পথে আসতে হবে অর্থাৎ এখানে ইসলাম প্রয়োজন। তারপর আপসহীন মনমানসিকতানির্ভর নেতাদের অধিকার দিতে হবে অবাধ, নিরপেক্ষ এবং বহুজনের অংশগ্রহণে নির্বাচনে


www.pathagar.com

ব্যালটের মাধ্যমে তাদের মতামত পেশ করার। নির্বাচনের নামে প্রহসন করলে চলবে না।

গুটিকয় গৃহপালিত দালাল নিয়ে নির্বাচনের নামে সাজানো নাটক করলে চলবে না। তাতে গণতন্ত্র আসবে না, শান্তি বিনষ্ট হবে। জনগণের দুর্ভোগের সীমা থাকবে না। যেটা হয়েছে জেনারেল পারভেজ মুশাররফের আমলে। আরো বড় কথা হলো, যেখানে মানুষের নানারকম দুর্ভোগ আছে, অধিকার নেই সেখানে ইসলাম থাকতে পারে না। কিন্তু জেনারেল মুশাররফের মতো সামরিক জান্তারা খামাখা মুখে ইসলামের বড় বড় বুলি আওড়ায়। গণতন্ত্রের কথা বলে মানুষকে ধোঁকা দেয়। যার ফলে এসব সামরিক জান্তা দেশে দেশে যখন রাজনীতিতে নেমেছে তখন তারা জনগণের স্বীকৃতি পাননি। যেমন জেনারেল পারভেজ মুশাররফ পেলেন না। শুধু পারভেজ মুশাররফই নন, পৃথিবীর কোনো দেশেই সামরিক জান্তারা জনগণের কোনো ধরনের সমর্থন পায় না, আর কোনোকালে পাবেও না।

এ বিষয়টি আরো খোলাসা করার জন্য আমি মুসলিম অধ্যুষিত কলোনি দেশগুলোর কথা বলবো। সেখানে বিপন্ন গণতন্ত্র। তার সঙ্গে ধ্বংস হয়েছে মানবতা। পাশাপাশি মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে বর্বরতা। ফলে ওইসব ঔপনিবেশিক একনায়ক শাসকের ওপর থেকে জনগণ প্রত্যাহার করে নিয়েছে তাদের সমর্থন। জনগণের সঙ্গে তারা কারচুপি করার কারণে জনগণ এখন স্বাধীনচেতা। অথচ তাদের উচিত এক মুহূর্ত সময় নষ্ট না করে জনগণের দাবি-দাওয়া মেনে নিয়ে, অধিকার ফিরিয়ে দিয়ে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানো। তাতে মঙ্গল হবে তাদের এবং বিশ্ববাসীর। কিন্তু তারা তা না করে গোপনে পশ্চিমাদের সঙ্গে আঁতাতের মাধ্যমে নিপীড়ন-নির্যাতন চালাচ্ছে নিরীহ জনগণের ওপর। যারা সাম্যবাদী তারা অস্ত্র হাতে নেমে পড়ছে সমরাস্ত্র বিপ্লবে। যে বিপ্লবের লক্ষ্যস্থল অত্যন্ত ক্ষতিকর। আর ইসলামের নামে ভুল পথের যাত্রীরা যে উগ্র ও চরমভাবাপন্ন কাজ করে তাতেও শান্তি বিনষ্ট হচ্ছে। এমনকি তারা পারছে না কোনো দেশেই ইসলামিক আইন-কানুন চালাতে। তাতে বিনষ্ট হচ্ছে বিশ্বশান্তি পর্যন্ত। ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হচ্ছে ইসলামের। তাতে লাভ কি? না, লাভ হচ্ছে ক্ষমতায় বসে থাকা মুসলিম অধ্যুষিত উপনিবেশগুলোর জান্তাদের। তারা সে সব জায়গায় শান্তি বিনষ্টকারী বিদ্রোহীদের দমনের নামে ক্ষমতায় থেকে যায়। তাদের পেছনে ছায়াসঙ্গী হয়ে থাকে পশ্চিমা বিশ্বের কয়েকটি দেশ। তারা ঘোলেও থাকে অম্বলেও থাকতে চায় এবং থাকে। তারা সাপের মুখেও চুমু খায়, ব্যাঙের মুখেও চুমু খায়। অথচ ওইসব কলোনিয়াল দেশের রাষ্ট্রনেতারা যদি ক্ষমতার লোভ না করে গণতন্ত্রের কথা ভাবতেন, দেশের জনগণের বেহাল অবস্থা স্বচক্ষে দেখতেন, সর্বোপরি নিজেকে নবীর উম্মত বলে ভেবে ইসলামের



www.pathagar.com

আদর্শের কথা ভাবতেন তাহলে এমন হতো না। তারা না গণতন্ত্রের পক্ষে, না ইসলামের পক্ষে। অথচ তারা ইসলাম বলতে পাগল, একেবারে বীর জেহাদি মুসলমান পুরুষ– আর গণতন্ত্র বলতে অজ্ঞান। বড় বড় সেমিনার, সভা-সমিতিতে গণতন্ত্রের পক্ষে তাদের বক্তৃতা রোজ একাধিক স্থানে চলতেই থাকে।

এই বইতে বেশ কিছু দেশ সম্পর্কে গণতান্ত্রিক এবং ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা নিয়ে আমি লিখেছি। যার মূল কথাগুলো এখানে না বললেই নয়। যে কথাগুলোর মূলে আছে গণতান্ত্রিক মানদণ্ড। যে মানের ওপর নির্ভর করে বলা যাবে যে কোন দেশের গনতন্ত্রের অবস্থা কি। তারা চর্চা করছে না খামাখাই হইচই করছে– নাকি উত্তরণ ঘটছে কিছু, না বিপন্ন হচ্ছে গণতন্ত্রের অস্তিত্ব।

এরপর আসে গণতন্ত্রের আদর্শের কথা। কোন আদর্শকে সামনে রেখে একটি দেশ গণতন্ত্রের চর্চা চালিয়ে যাচ্ছে বা পরবর্তী সময়ে এগিয়ে যাবে, তার একটি নির্দিষ্ট নির্দেশনা থাকতে হবে। সেই নির্দেশনা দেবেন একজন নেতা। কোনো একনায়ক বা সেনানায়ক নয়। কেননা তারা গণতন্ত্রের আদর্শের নয়। হলে জোর করে ক্ষমতায় বসতে পারতেন না। অর্থাৎ জনগণ গণতন্ত্র চর্চার মাধ্যমে শুধু সরকারই নির্বাচন করবে না– সঙ্গে সঙ্গে নেতাও গড়ে তুলবে। সে নেতা হবে জাতির আদর্শ সন্তান। তার মধ্যে জাতীয়তা, ধর্মবোধ, শিল্প-সাহিত্য-সংস্কৃতি তথা আন্তর্জাতিক ধ্যান-ধারণাকে বোঝায়। এরপর আসে গণতন্ত্র চর্চার নীরব আন্দোলনকে ধীরে ধীরে বেগবান করে উত্তরোত্তর এর উন্নয়ন ঘটানোর ক্ষমতা। নইলে গণতন্ত্র মার খাবে। ইসলামী ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ন হবে। এরপর সামাজিক দায়বদ্ধতা, যে দায়বদ্ধতার ওপর নির্ভর করবে জাতীয়তা, সংস্কৃতি এমনকি সভ্যতার নিদর্শন বহনকারী প্রচেষ্টার কার্যকলাপ। অবশ্য এর জন্য প্রচণ্ড বেগ পেতে হয়। কেননা একটি জাতি যদি বছরের পর বছর ভিন্ন ভিন্ন মানসিকতার একনাযক বা সেনানায়কের দ্বারা পালিশ হতে থাকে তাহলে কলোনি হোক আর স্বাধীন দেশ হোক তাদের গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা বা ভক্তি কিছু থাকে না। তারা পুতুলের মতো হয়ে যায়। বিপ্লব বা আন্দোলন কোনোটাতেই তারা পা বাড়ায় না। তখন দিনে দিনে তারা জাতীয়তা হারায়, নষ্ট হয় ধর্মবোধ। তাই কলোনাইজড ইসলামিক রাষ্ট্রগুলোতে ইসলাম প্রায় নেই বললেই চলে। তাদের আহারে-বিহারে, স্বপনে-শয়নে, পোশাক-পরিচ্ছদে পশ্চিমাদের সংস্কৃতি শোভা পায়। এবং আরো ভয়াবহ ব্যাপার হচ্ছে যদি কেউ এর বাইরে আসতে চায় বা আসার কথা বলে, তাহলে তাকে জবাব দিতে হবে চড়ামূল্যে। কেননা পশ্চিমাদের নির্ধারিত সমাজ বা শাসনব্যবস্থাই হচ্ছে গণতান্ত্রিক, এটা তাদের প্রচারিত এবং চাপিয়ে দেয়া একটি মন্ত্র। এখান থেকে বেরিয়ে আসতে হবে এবং তার জন্য চাই গণতান্ত্রিক আন্দোলন। কোনো ধর্মীয় বা অন্য কোনো গোষ্ঠীর আন্দোলনের নামে হত্যাকাণ্ড বা বোমা হামলা চালানো নয়।


www.pathagar.com

# যারা গণতন্ত্রের পথে হাঁটে তাদের বিষোদগারে পশ্চিমারা থেমে নেই

হাজারো ঘাত-প্রতিঘাতের পরও মুসলিম বিশ্ব কিন্তু থেমে থাকেনি। কালে কালে জন্মেছেন ক্ষণজন্মা এক একজন গণতন্ত্রের পূজারি এবং বীর নেতা। তারা চেষ্টা করেছেন। কেউবা সফল হয়েছেন, কেউবা জীবন নিয়ে ব্যর্থ হয়েছেন। আর পশ্চিমা বিশ্ব যে সব নেতাকে নিয়ে নাচে তারা হলেন– পশ্চিমাদের উদ্দেশ্য হাসিল করার একনায়ক রাজা-বাদশা, সুলতান-শেখ বা সেনানায়ক। আর বাকি দেশগুলোর বিষোদগারে পশ্চিমা বিশ্ব থেমে নেই– তারা হয় গণতন্ত্র চর্চার পথে ঠিকমতো হাঁটছে নতুবা তারা ইসলামী আইন-কানুন নিয়ে ঠিক পথে আছে। বর্তমান বিশ্বে মুসলিম অধ্যুষিত দেশ আছে প্রায় ৪৫টি। আমি এর মধ্যে গুটিকয়েক দেশ নিয়ে সংক্ষিপ্ত আলোচনা করবো।

## ইরান

যে বিষয় নিয়ে আমার আজকের আলোচনা, সেই আলোচনার এক অনন্য উদাহরণের দেশ ইরান। ইরান সম্পর্কে যাদের ধারণা আছে তারা জানেন যে, ইরান সম্পর্কে যতকিছু বলা হয়– ততখানি সব সত্য নয়। প্রাচীনকাল থেকেই ইরানি জাতি জ্ঞান-বিজ্ঞান বা সাহিত্য-সংস্কৃতিতে খুব উন্নত। তাদের শাসন ব্যবস্থা বা রাষ্ট্র পরিচালনা চলে গণতান্ত্রিক ধারায়। কিন্তু এই ধারাকে পরিচালনা করা হয় ইসলামিক মতে, তাদের সমাজ পরিচালিত হয় সম্পূর্ণ পবিত্র কোরআন ও সুন্নাহ মতে। অথচ সেখানে ইসলামিক সমাজ ব্যবস্থাকে ঠিক রেখে ভাস্কর্য, চিত্রশিল্প, চলচ্চিত্র ইত্যাদি নির্মাণ এবং তার চর্চার প্রচলন আছে। সেখানে পশ্চিমাদের রাজনৈতিক মাতব্বরি নেই বলেই তাদের পোশাক-পরিচ্ছদ বা সামাজিক নিয়ম-কানুন নিয়ে ইরান সম্পর্কে আজেবাজে কথা রটানো হয়। ইরান আসলে কোনো ইসলামিক বা মৌলবাদীদের দেশ নয়। এবং এক্ষেত্রে বলা যায় যে, গত ২০০ বছর পর ইরান বর্তমানে গণতন্ত্রের চর্চায় বা সুস্থ রাজনীতির ধারায় অনেকখানি শান্ত অবস্থায় আছে।

একটা সময় ছিল যখন ইরানকে নিয়ে টানাটানি করতো ব্রিটেন ও রাশিয়া। মাঝখানে রেজা শাহ পাহলভি মজা মারতেন এবং তখন ইরান একেবারে পশ্চিমা ধাঁচের দেশ ছিল। গণতান্ত্রিক আন্দোলনকে ইসলামিক রেভুলশেন নামে চালিয়ে আজ ইরান বিশ্বের বুকে এক অনন্য নাম। কিন্তু গণতান্ত্রিক এই সংসদীয়


www.pathagar.com

ব্যবস্থার ইসলামী ভাবধারাকে চালু করতে আগেই বলেছি ইরানকে বেশ বেগ পেতে হয়েছিল। প্রাচুর্যপূর্ণ এই দেশ বারবার রাজা, বাদশা, সামন্ত প্রভু এবং পশ্চিমা শক্তির দেশগুলো শোষণ করেছে; কিন্তু পরে যখন গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে এসেছে তখন তারা সুন্দর জাতি! অবশ্য তাদের মধ্যে যে কিছুটা গোঁড়ামি নেই তা নয়। তবে ওটাকে গোঁড়ামি বললেও ভুল হবে। ওটুকু জাতীয়তা যদি না থাকে তাহলে জাতি আর জাতি থাকবে না। এজন্যই হয়তো বর্তমানে মুসলিম বিশ্বে ইরান অনেক এগিয়ে। একসময় অবশ্য এই ইরানেও রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব-সংঘাত চরম আকারে ঘটেছে। সব দ্বন্দ্ব-সংঘাতের কথা ভুলে ইরান আজ গণতন্ত্রের পথে ছুটে চলেছে।

## আলজেরিয়া

কলোনির দেশ থেকে মুক্ত হয়ে গণতান্ত্রিক ধারায় ফিরে আসার জন্য বর্তমান বিশ্বে তথা মুসলিম বিশ্বের এক অনন্য দেশ আলজেরিয়া। সেখানকার কলোনি শাসনের বিপরীতে শত শত মানুষ জীবন দিয়ে কলোনির শাসনকে উচ্ছেদ করে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ায়। তারা ফ্রান্সের কলোনি রাষ্ট্র থাকার কারণে কলোনি শাসন আমলের অবসানের সঙ্গে সঙ্গে ফ্রান্সসহ ইউরোপের সব দেশের সব ধরনের সম্পর্কের অবসান ঘটে। তাতে কি, তাদের কাছে স্বাধীনতাটা অনেক বড় বলে ধরা ছিল। তাই তারা স্বাধীনতা যুদ্ধের বাহিনী বানিয়ে স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধেরও ঘোষণা করলো। যুদ্ধ চললো। ফ্রান্সও ছেড়ে দেয়ার দেশ নয়। তার ওপর আলজেরিয়ার মতো দেশ। যে দেশ ধন-সম্পদ ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ। দুর্ভাগা জনগণ দেশ স্বাধীন করলো ঠিকই; কিন্তু ক্ষমতায় এসে জেঁকে বসলো সেই একনায়ক সরকার। এরা হলো ইসলামিক উগ্রপন্থীজাত দল। তাদের দলনেতা ছিলেন আহমদ বেন বেল্লা এবং হুয়েরি বুমেদিন। বিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি এই যুদ্ধে প্রায় অর্ধ লক্ষ সাধারণ জনগণ প্রাণ হারায়। এরপর আবার ১৯৯১ সাল নাগাদ যখন এসব দ্বন্দ্ব-ফ্যাসাদ মিটে গিয়ে সাধারণ নির্বাচন এলো তখন আবার একটি ইসলামিক উগ্রপন্থী দল ক্ষমতায় এলো। এবার জনগণ নয়, খোদ আলজেরিয়ার সামরিক বাহিনী আর সহ্য করতে পারলো না নির্বাচিত ওই উগ্রপন্থী ইসলামিক দলকে। তারা ক্ষমতা দখল করে নিল। এর কারণ গণতন্ত্র না আসা। একদলীয় কোনো শাসনই ভালো নয়। তাই জনগণ একদলীয় উগ্র ইসলামিক শাসনব্যবস্থাকে মেনে নিল না। শুরু হলো অভ্যন্তরীণ কোন্দল। মুসলমানের বিরুদ্ধে মুসলমান, আলজেরিয়ানের বিরুদ্ধে অন্য আলজেরিয়ানের সংঘর্ষ। যে যুদ্ধ স্থায়ী হয়েছিল ২০০২ সাল পর্যন্ত। শেষতক রাজনৈতিক নেতারা একত্র হয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার বসিয়ে


www.pathagar.com

নির্বাচন করেন। এতে করে বেশ সংঘর্ষের মধ্য দিয়ে নির্বাচন হয় এবং প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন আবদেল আজিজ বুতেফ্লিকা। নির্বাচনে ব্যালট ছিনতাই, হত্যা ইত্যাদি হলেও জয় হয় গণতন্ত্রের। যে জয়ের পতাকা ওড়ে ২০০৭ সালে। এই নির্বাচনে পুতুলের মতো একজন রাষ্ট্রপতি এলেও নির্বাচিত পার্লামেন্ট প্রতিনিধিরা সচেতন। এখন আলজেরিয়া গণতন্ত্রের চর্চার পথে, উন্নয়নের পথে। তাই বলে ইসলামী জীবন ব্যবস্থাকে তারা ছেড়ে দেয়নি।

## জর্দান

জর্দান মানেই এক বিস্ময়কর দেশ। রূপে-গুণে-ঐশ্বর্যে এক পরম সৌন্দর্যের দেশ, যার ফলে পশ্চিমা বিশ্বের সাথে এই দেশের সম্পর্ক অত্যন্ত উষ্ণ, নিবিড় এবং ঘনিষ্ঠ। বর্তমানে আমরা যে জর্দানকে দেখি তা হচ্ছে প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের একটি অংশ এবং প্রথম বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন সময়ে এটা ব্রিটিশদের অধীনে ছিল। যদিও আধুনিক জর্দান ১৯২১ সালে প্যালেস্টাইন থেকে ভেঙে বেরিয়ে আসে, তবুও প্যালেস্টাইনের সাথে সব বিষয়ে তার সম্পর্ক ছিল আগের মতোই। স্বাধীনতার বেশ আগে দেশটি ট্রান্সজর্দান নামে পরিচিত ছিল।

১৯২১ সালে দেশটি বাদশা শাসিত দেশ হিসেবে রাজা আবদুল্লাহর হাতে চলে যায়। ১৯৩৯ সালে একটি সংসদ বানানো হয়, যেখানে বেশ ক'জন উপদেষ্টা নিয়োগ পায়।

১৯৩৯ সালে এই উপদেষ্টা পরিষদ রাজা আব্দুল্লাহর কেবিনেট হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। গণতন্ত্রমনা এই কেবিনেট ছিল বেশ শান্ত এবং আশপাশে বৃটিশ কলোনীর লর্ডদের সাথে তাদের ছিল সুসম্পর্ক।

১৯৪৮ সালে এই ছোট্ট জর্দান রাষ্ট্রের আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধে ভূমিকা ছিল অসাধারণ। তারা আবেগতাড়িত হয়ে মানবতার কাজে নেমে পড়ে। ছোট্ট দেশটিতে তারা প্রায় ৫ লক্ষ প্যালেস্টাইনি রিফিউজিদের জায়গা দেয়। এক সময় তারা জর্দানের সাধারণ মানুষের সাথে মিলে-মিশে এক হয়ে গেছে। সে সময় জর্দানের জনসংখ্যা ছিল মাত্র ৩ লক্ষ ৪০ হাজার জন। জর্দানের গণতন্ত্র চর্চার মোটামুটি পরিবেশ তৈরি হওয়ার ফলে পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলের ওপর তাদের দখল চলে আসে।

প্রথম থেকেই জর্দানে ছিল বাদশাহ শাসিত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। তাতে করে সংসদ যে কোনো সময় বন্ধ করে দেয়ার ক্ষমতা ছিল রাজার। যদিও প্যালেস্টাইনের জনসংখ্যা সে দেশে ছিল বেশি– সে জন্য বাদশাহ'র হাতে ক্ষমতা কেড়ে নেয়ার প্রবল ক্ষমতা রাখা হয়।


www.pathagar.com

১৯৫২ সালে ক্ষমতায় আসেন অত্যন্ত আধুনিক মনের বাদশাহ্ হুসেইন এবং প্রায় অর্ধ শতাব্দী ধরে তার শাসনকাল বিশ্ববাসী প্রত্যক্ষ করছে।

বিশ্ব রাজনীতিক পরিমন্ডলে জর্দান এবং তার বাদশাহ্ হুসেন-এর পদক্ষেপ অত্যন্ত বিচক্ষণীয় এবং প্রশংসার্হ। যেমন ধরা যাক, প্যালেস্টাইন কর্তৃপক্ষ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত পশ্চিম তীরবর্তী অঞ্চলে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনসহ অন্যান্য গ্রুপগুলোর সাথে ইসরায়েলের যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ার সমস্যাকে সুষ্ঠুভাবে সমাধান করা। বাদশাহ্ হুসেন ১৯৬৭ সালে আরব-ইসরায়েলের যুদ্ধের সময় মিশর এবং সিরিয়ার পক্ষে অংশ নেন। মানবিকভাবে এটি একটি অতি উত্তম পদক্ষেপ ছিল। কিন্তু সে যুদ্ধে আরব সেনারা পরাজিত হয় এবং সাথে সাথে পশ্চিম তীর এবং পূর্ব জেরুজালেম হাতছাড়া হয়ে যায়।

যুদ্ধের পর জর্দানের ওপর প্রচণ্ড চাপ আসে শত শত বা হাজার হাজার যে সব প্যালেস্টাইনি রিফিউজি ওয়েস্ট ব্যাংকে পালিয়ে যায় তাদের জায়গা দেয়ার জন্য।

১৯৭০ সালে ফিদেইন নামের এক গেরিলা বাহিনী সরাসরি বাদশাহ্ হুসেনের বিরুদ্ধে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে ছিল।

১৯৭০ সালেই ফিদেইন বাহিনী বেশ ক'টি বিশ্ব কাঁপানো বিমান হাইজ্যাকের মতো ঘটনা ঘটালো। এর প্রতিউত্তরে বাদশাহ্ হুসেনও বসে থাকলেন না। তিনি সামরিক বাহিনীর সহায়তায় শুরু করলেন ফিদেইন বাহিনীর ওপর প্রচণ্ড আঘাত। যেন সমগ্র জর্দান তার আয়ত্বে আসে। যা মধ্যপ্রাচ্য তথা বিশ্ব ইতিহাসে 'ব্ল্যাক সেপ্টেম্বর' নামে পরিচিত। এর ফলস্বরূপ ১৯৭১ সালে বাদশাহ্ হুসেন আন্তদেশীয় যুদ্ধে জয়লাভ করার পর প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের রাজনৈতিক এবং মিলিটারী উইংকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন। এই সময় বেশ ক'বছর বাদশাহ্ হুসেন চরমভাবে বিপদে পড়ে যান। তাতে করে ব্যহত হতে থাকে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা।

১৯৮৯ সালে বাদশাহ্ হুসেন গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য বেশ কিছু শক্ত পরিকল্পনা হাতে নেন। সেই পরিকল্পনা অনুসারে বাদশাহ্ দেশে গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধারের জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ডাক দিলেন। নির্বচান সম্পন্ন হলো। নির্বাচনে নির্বাচিত পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে কেবিনেট হলো। সেই কেবিনেটের তিনি হলেন সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী বাদশাহ্। রাজনৈতিক দলগুলোকে তিনি অনুমোদন দিলেন। সাথে সাথে সংবাদপত্র ও অন্যান্য তথ্য আদান-প্রদান সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলোর উপর ভীষণ কঠোর হলেন।

১৯৯০ সালের দিকে দেশের অর্থনীতি এবং রাজনীতি ও অন্যান্য বিষয়ে যখন তার ক্ষমতা সীমাহীন, তখন তিনি দেশের রাজনৈতিক অধিকারের নিয়ম-



www.pathagar.com

কানুন পাল্টে ফেললেন। এতে করে তথ্য প্রবাহ আদান-প্রদান ও প্রকাশের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ আনলেন। এরপর বদলালেন নির্বাচনের আইন-কানুন। এবার কিন্তু পার্লামেন্ট সদস্যরা আর বসে থাকলেন না।

১৯৯৭ সাল নাগাদ তারা চরমভাবে বিরোধিতা করে বসলেন। বাদশাহ হুসেন দেশ ও গণতন্ত্র রক্ষার্থে সকল পার্লামেন্ট মেম্বারদের পদ থেকে বাতিল করে দিলেন। গড়লেন একদলীয় শাসন ব্যবস্থার এক সামরিক জান্তা সদৃশ এক নায়ক শাসন ব্যবস্থার গণতান্ত্রিক সরকার।

১৯৯৯ সালে বাদশাহ হুসেন অনেক যুদ্ধ অনেক কূট-কচালির পর মৃত্যুবরণ করলেন। সেই সময় অল্প ক'দিন পরেই সিংহাসনে বসলেন তার তার সদ্য যুবক পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত বিলাসী পুত্র দ্বিতীয় আবদুল্লাহ। তিনিও পিতার পদাঙ্ক অনুসরন করেন। বিলাসী স্বাধীনচেতা পুত্র বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ এগিয়ে যেতে থাকলেন।

২০০১ সালে অনুষ্ঠেয় সাধারণ নির্বাচনকে তিনি বন্ধ ঘোষণা করলেন প্যালেস্টাইনের ঘোলাটে রাজনৈতিক পরিস্থিতির কারণে।

২০০৩ সালে আন্তর্জাতিক মান ও মতামতকে ঠিক রেখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। সত্যিই সে নির্বাচন ছিল প্রশাংসাজনক। সে নির্বাচন ছিল অবাধ, সুন্দর, নিরপেক্ষ এবং সরকারী নিয়ন্ত্রণহীন। জর্দানের জন্য বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ'র এই পদক্ষেপ ছিল অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং সময়োপযোগী। যদিও নির্বাচন সুন্দর ছিল, কিন্তু বাস্তবপক্ষে নির্বাচন, গণতান্ত্রিক সরকার এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার মধ্যে ছিল বিস্তর পার্থক্য। পার্লামেন্টের সদস্যদের নামেমাত্র বসার জায়গা ছিল– অর্থাৎ পুতুল মাত্র, তাদের কোনো ক্ষমতা ছিল না, যা ছিল অত্যন্ত সীমিত। অর্থাৎ পূর্ণ একদলীয় শাসন ব্যবস্থা বলা যায়। বাদশাহ দ্বিতীয় আবদুল্লাহ'র এই শাসন ব্যবস্থা আজ পর্যন্ত চলছে। গণতন্ত্রের নামে চললেনও– এ সরকারের বিশ্বে কোন স্বীকৃতি নেই। যদিও বাদশাহ আবদুল্লাহ'র প্রচার-প্রচারণা সারা বিশ্বে ব্যাপক। কেননা পশ্চিমা শিক্ষায় শিক্ষিত বাদশাহ'র মন-মানসিকতা পশ্চিমা ধাঁচের। দেশটি তেল সমৃদ্ধ, ধনী। ধনে-সম্পদে, প্রাকৃতিক সম্পদে দেশটি অসাধারণ। আপন স্বার্থসিদ্ধিতে এদেশটি পশ্চিমাদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।

## প্যালেস্টাইন

পৃথিবীতে এই একটিমাত্র দেশ, যাকে নিয়ে সারা বিশ্বে প্রতিদিন তৈরি হয় নতুন নতুন প্রশ্ন। উগ্রপন্থী নানান দলে বিভক্ত এই দেশটিতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। বিশেষ করে যে দেশে চলছে


www.pathagar.com

প্রতিদিন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক নির্যাতন-নিপীড়ন সে দেশ থেকে এমনটা আশা করাও অবশ্য ভুল। কেননা এখানকার পার্লামেন্ট পর্যন্ত চরমপন্থীদের দখলে। এ দেশটি মানব জাতির কাছে নানা কারণে উদাহরণস্বরূপ একটি দেশ। এ দেশের পুরানো ইতিহাস অত্যন্ত নিপীড়ন-নির্যাতনের, অত্যন্ত দুঃখ-বেদনার। কেননা ধারাবাহিকভাবে এ দেশকে শাসন করে গেছে অটোমান শাসন, বৃটিশ শাসন, মিশরীয় শাসন, জর্দানিয়ান শাসন এবং সর্বশেষ ইসরাইলি শাসন। এসব শাসন চলেছে পুরো গত শতাব্দী জুড়ে। গত শতাব্দীতে প্যালেস্টাইনের ইতিহাস, ভূগোল, রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক শক্তি– সবকিছুই চলতে থাকে বাইরের নানান দেশ এবং নানান শক্তির ইচ্ছামতো। তাদের ছিল না নিজেদের কোনো দেশ, ছিল না নিজস্ব শাসন ব্যবস্থার অধীনে কোনো স্বার্বভৌম ভূখণ্ড– যা ছিল, তা অত্যন্ত বিতর্কিত এবং যুদ্ধ-বিগ্রহপূর্ণ। তারপর পশ্চিমাদের ইচ্ছায় ইসরায়েল এবং প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ডকে তিনটি অংশে বিভক্ত করা হয় ১৯৬৭ সালে। সবচেয়ে বড় অংশ যায় ইসরায়েল। এছাড়া গাজা স্ট্রীপে এবং ওয়েস্ট ব্যাংক প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড হলেও তারা স্বায়ত্বশাসিত আলাদা আলাদা প্রদেশ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর প্যালেস্টাইন ব্রিটিশ সংরক্ষিত একটি দেশ হিসেবে পৃথিবীতে পরিচিতি পায়। এরপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় তামাম পৃথিবীতে যখন মানুষ যুদ্ধের ভয়াবহ রোষানলে পড়ে জীবন বাঁচাতে ব্যস্ত– তখন ইসরায়েল তার মিত্র দু'দেশের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ব্রিটেনকে নিয়ে দেশ ভাগের মন্ত্রণা দানে ব্যস্ত।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরপরই ব্রিটিশ সরকারের সহায়তায় ইউনাইটেড নেশান বা জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনকে দুই ভাগে বিভক্ত করে। এক অংশ ইহুদীদের অন্য অংশ আরবদের জন্য। এটি এক ধরনের ধর্মভিত্তিক দেশ ভাগ বলা যায়। এই ফাঁকে একটি কথা না বললেই না যে, ঐ সময় ব্রিটিশরা জাতিসংঘের সহায়তায় পৃথিবীর বহু দেশকে ভেঙে দু'ভাগ করেছে। এর মধ্যে এশিয়া মহাদেশেই প্রায় সব। এশিয়া মহাদেশে প্রথম দেশভাগের কাজ হয় ভারতবর্ষে। এই ভাগও ছিল ধর্মকে কেন্দ্র করে। যেমন– ভারতের পূর্ব ও পশ্চিম প্রান্তে মুসলিম অধ্যুষিত দুই দেশকে ভাগ করলো পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান– একত্রে পাকিস্তান এবং হিন্দু ও কিছু মুসলমান ও অন্যান্য ধর্মের লোক নিয়ে ভাগ হলো হিন্দু অধ্যুষিত দেশ ভারত বা ইন্ডিয়া। যাই হোক, জাতিসংঘের এই ভাগ-বাটোয়ারাতে ইহুদীরা খুশি হলেও প্যালেস্টাইন এবং তার প্রতিবেশী আরব রাষ্ট্রগুলো মেনে নিলো না। ১৯৪৮ সালে আরব-ইসরায়েলের যে পায়ে পড়ে যুদ্ধ করার মতো যুদ্ধ হয় তাতে সাংঘাতিকভাবে জয় পায় ইসরায়েল আর পরাজিত হয় আরবীয়রা। শুধু তাই নয়– প্যালেস্টাইন, গাজা স্ট্রীপ এবং ওয়েস্ট ব্যাংকও


www.pathagar.com

হাতছাড়া হয়। গাজা স্ট্রীপ চলে যায় মিশরের অধীনে আর ওয়েস্ট ব্যাংক চলে যায় জর্দানের অধীনে।

এরপর এলো ১৯৬৭ সাল। মধ্যপ্রাচ্যের ইতিহাসে এক ভয়াবহ যুদ্ধ– ইসরায়েল বনাম মিশরসহ আরববিশ্ব। এই যুদ্ধে ইসরায়েল মিশরের কাছ থেকে গাজা স্ট্রীপ এবং জর্দানের কাছ থেকে ওয়েস্ট ব্যাংক দখল করে নেয়। তখন বিশ্বের মানচিত্রে ইসরায়েল এক মস্তবড় স্বাধীন রাষ্ট্রে পরিণত হয়। এর অল্পদিন পর যখন আরব বিশ্ব এবং প্যালেস্টাইনীরা ব্যস্ত নানা অস্থিরতায় তখন দখল করে নেয় পবিত্র নগর জেরুজালেম।

১৯৬৭ সালের সেই ভয়াবহ যুদ্ধের পর ১৯৭৩ সালে পুনরায় সেই পুরানো একই বিষয়– গাজা স্ট্রীপ ও ওয়েস্ট ব্যাংক দখল নিয়ে পুরোদমে যুদ্ধ হলো। আন্তর্জাতিক চাপ এবং পশ্চিমাদের সাজানো শান্তির নামে নানা চুক্তির মাধ্যমে মূলত তারা ইসরায়েলকে আরো শক্তিশালী করে। শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে এইসব চুক্তির মধ্যে ছিল ক্যাম্প ডেভিড-১, ইসরায়েল-জর্দান ট্রিটি অফ পিস প্ল্যান্স, (অসলো ভিত্তিক) ক্যাম্প ডেভিড-২, দি রোড ম্যাপ। কিন্তু কোনো ফল এতে হলো না। বরং ইসরায়েল লেবানন এবং প্যালেস্টাইন নিয়ে আরো বেশি বাড়াবাড়ি শুরু করলো– যা আজ পর্যন্ত বিদ্যমান।

প্যালেস্টাইনের নির্বাচনভিত্তিক রাজনীতি অত্যন্ত ক্ষীণ। দীর্ঘ তিন দশক যুদ্ধ করে দেশে-বিদেশে ঘুরে প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের নেতা ইয়াসির আরাফাত প্যালেস্টাইনের নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট হলেন। এই তিন দশক ধরে ইয়াসির আরাফাত যে কি কষ্ট, কি যন্ত্রণা, কি দুঃখ এবং ইসরায়েলের হাজারো রকমের সৃষ্ট পাহাড় সমান সমস্যার সম্মুখীন হয়েছেন তা বিশ্ববাসীর জানা। তিনিও গাজা স্ট্রীপ এবং ওয়েস্ট ব্যাংক এলাকাকে প্যালেস্টাইনের ভূখণ্ড বলে দাবী করে এসেছেন চিরকাল। কিন্তু কোনো লাভ হয়নি। খণ্ডযুদ্ধ ছিল এই অঞ্চলের ইসরায়েলীদের জন্য অবশ্য প্রধান কর্ম। উল্টোদিকে প্যালেস্টাইনবাসীর কাছে অত্যাচারিত, নিপীড়িত হওয়া ছিল ভাগ্যের নিত্যনৈমিত্তিক নির্মম পরিহাস।

২০০৪ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তিনি একাধারে নির্বাচিত নেতা এবং নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ছিলেন। তার মৃত্যুর পর ২০০৪ সালে ইয়াসির আরাফাতের ফাত্তাহ গোষ্ঠীর সদস্য, তার প্রিয় অনুসারী মাহমুদ আব্বাস প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশনের নেতা নির্বাচিত হন। সাথে সাথে প্যালেস্টাইন রাজ্যের শাসক হিসেবেও নির্বাচিত হন। কিন্তু ধর্মভিত্তিক উগ্রপন্থীদের দল হামাস এই নির্বাচনকে মেনে নিল না। এই মেনে না নেয়ার


www.pathagar.com

আভ্যন্তরীণ ঘটনাটি ইসরায়েলসহ পশ্চিমা বিশ্ব লুফে নিল। এই দেশটি খণ্ড যুদ্ধ বাধিয়ে রাজনৈতিক অস্থিরতাকে জিইয়ে রাখার জন্য।

হামাস কিন্তু সন্ত্রাসবাদীদের দল নয়। যদিও পশ্চিমা বিশ্ব বা ইসরায়েল তা বলছে। হামাস প্যালেস্টাইনীদের তৈরি এবং পরিচালিত একটি রাজনৈতিক দল– তবে এরা ধর্মভিত্তিক এবং তাহলো ইসলাম ধর্ম। তবে প্যালেস্টাইনে যে অন্যান্য জাতির লোকজন বাস করতে পারবে না তা নয়। তারাও প্যালেস্টাইনের পূর্ণ স্বাধীনতা চায়। তারা একটি স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়তে চায়। তাদের না মেনে নেওয়া মনোভাব এবং স্বাধীনচেতা রাজনীতির পথ দেখে ইসরায়েলসহ পশ্চিমা বিশ্বের বহু দেশ হামাসকে একটি সন্ত্রাসীদের দল বলে পৃথিবীতে চিহ্নিত করতে চায়। কিন্তু পারেনি।

২০০৬ সাল আসে প্যালেস্টাইনীয়দের জন্যে এক টার্নিং পয়েন্ট। পূর্ণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য জাতিসংঘের উদ্যোগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সহায়তায়– মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মাধ্যমে একটি উদ্দেশ্য প্রণোদিত নির্বাচন অনুষ্ঠিত হলো। যাকে জাতিসংঘসহ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বললো এই নির্বাচন নিরপেক্ষ, অবাধ, নির্দলীয় এবং অত্যন্ত সুন্দর। জিমি কার্টার ও তার নিজস্ব সংস্থা কার্টার সেন্টার এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ন্যাশনাল এনডোমেন্ট ফর ডেমক্রেটিক এবং ন্যাশনাল ডেমক্রেটিক ইনস্টিটিউট মিলে মিশে এই নির্বাচন প্রত্যক্ষ করে, অতঃপর সুন্দর ও অবাধ বলে প্রচার করলো। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাবেক প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার সারা বিশ্বে এক শান্তির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। সুতরাং নির্বাচন সম্পর্কে তার মন্তব্যকে মুসলিম বিশ্বসহ বিশ্বের সব দেশই মেনে নেয় কিন্তু বছর পার না হতেই পুনরায় শুরু হলো পেশা বা জীবনকর্ম নিয়ে, রাজনৈতিক অধিকার নিয়ে, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড নিয়ে সামাজিক উন্নয়ন কর্ম নিয়ে, সমাজে জীবনযাপনের স্ট্যান্ডার্ড নিয়ে শুরু হলো আবার সংঘাত।

রামাল্লায় ইতোমধ্যে ঘটে গেল এক অদ্ভুত ঘটনা। সেখানে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভূত উন্নতি করার জন্য রামাল্লার প্যালেস্টাইনীয়দের কর্তৃপক্ষের পার্লামেন্টের নির্বাচনে হামাস পুনরায় কর্তৃপক্ষ নির্বাচিত হয়। তাদের অভূতপূর্ব বিজয়, বহুদলীয় গণতন্ত্রের পক্ষে জনগণের রায়– তাদের সাহসী করে তোলে। ফলে তারা এবার গাজা এবং ওয়েস্ট ব্যাংক নিজেদের আয়ত্বে নেয়ার জন্য দাবি তোলে।

এর মধ্যেই পশ্চিমাদের যে স্বভাব তা প্রকাশ পেতে থাকলো। নির্বাচন নির্ভর গণতন্ত্রের চর্চায় পশ্চিমা বিশ্ব নানা বিরূপ সমালোচনা এবং হামাস ও ফাতাহ গ্রুপের বিভিন্ন ধরনের অপপ্রচার চালাতে থাকে। রটনা করতে থাকে


www.pathagar.com

হামাস যে গণতন্ত্র চায় তা হলো বিপজ্জনক ধরনের গণতন্ত্র। এই রটনা শুধু প্যালেস্টাইনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকলো না, সারা বিশ্বসহ আমার পাকিস্তানেও এই রটনা রটে গেল এবং বহু মানুষ হামাসের বিরোধী হয়ে উঠলো। এবার পশ্চিমা বিশ্বের বিশেষ করে ইউরোপীয়ান ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নতুন এক কূট চাল চাললো। হামাস এবং ফাতাহ্ গ্রুপের মধ্যে কোন্দল বাঁধানোর জন্য পুনরায় এক প্রহসনের নির্বাচন হলো। সে নির্বাচনে ফাত্তাহ গ্রুপের সদস্যগণ অধিক সংখ্যক আসন পেয়ে জয়লাভ করে। জনগণের এই রায় দেখিয়ে ঐ দুই পশ্চিমা শক্তি হামাসকে এবার জোরেসোরে সন্ত্রাসের দল বলে অপপ্রচার চালাতে থাকে। এই সময় ইসরায়েল এগিয়ে আসে ফাতাহ্ দলের নানা কর্মকাণ্ডে সাহায্য-সহযোগিতা করার জন্য। ফাতাহ্ গ্রুপ তা মেনে নেয় না, আবার বিরোধীতাও করে না। ফাতাহ্ গ্রুপের এমন নমনীয় আচরণ দেখে হামাস গ্রুপ চরমভাবে ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠে। তারা ফাতাহ্ গ্রুপকে কিছু বললো না বটে, তবে ভয়াবহভাবে ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ওপর ক্ষেপে উঠলো। তারা অর্থনৈতিক ও অন্যান্য সাহায্য-সহযোগিতা প্রত্যাখ্যান করলো। ফলে প্যালেস্টাইনের অর্থনীতি একেবারে ভেঙে পড়ে। এই সুযোগের অপেক্ষায় ছিল এতদিন পশ্চিমা বিশ্ব। অর্থনৈতিক পরিস্থিতি যত নাজুক হলো– প্যালেস্টাইনের রাজনীতিক, সামাজিক গোলযোগ তত বেড়ে গেল। হামাস এবং ফাতাহ্ গ্রুপের মধ্যে শত্রুতা বাড়ার সাথে সাথে তাদের সমর্থকেরাও পরস্পর পরস্পরের শত্রুতে পরিণত হয়ে গেল। গণতন্ত্রের জন্য যুদ্ধ, স্বাধীনতা রক্ষার জন্য যুদ্ধ, সব ভুলে গিয়ে তারা প্যালেস্টাইনের ওপর আধিপত্য বিস্তারের জন্য পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়লো। যাকে বলে গৃহযুদ্ধ। উপায়ান্তর না পেয়ে মুসলিম বিশ্বের রাষ্ট্রপ্রধাগণ সৌদী বাদশাহ আবদুল্লাহ'র মাধ্যমে হামাস এবং ফাতাহ্ গ্রুপের মধ্যে এক ঐতিহাসিক শান্তি চুক্তি করান। তারপরও গৃহযুদ্ধ হামাস-ফাতাহ্ গ্রুপের মধ্যে গোপনে চলতে থাকে।

২০০৭ সাল নাগাদ এর রূপ এতো ভয়াবহ হলো যে, এক রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ চলতে থাকলো বেশ ক'দিন। শেষে ফাতাহ্ গ্রুপকে হটিয়ে হামাস গ্রুপ পুনরায় ক্ষমতায় আসে। তখন থেকে গাজায় উড়তে থাকে হামাসের সবুজ পতাকা। ততদিনে অবশ্য হামাস নেতা মাহমুদ আব্বাস তার পার্লামেন্ট ভেঙে দেয়।

বর্তমানে সেখানে পৃথক দুটি স্বায়ত্বশাসিত প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র। একটি গাজা, অন্যটি ওয়েস্ট ব্যাংক। এর মধ্যে হামাস নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র গাজা এবং ফাতাহ নিয়ন্ত্রিত রাষ্ট্র ওয়েস্ট ব্যাংক। লক্ষ্যণীয় যে, ওয়েস্ট ব্যাংক অঞ্চলটি সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা, স্বাস্থ্য, চিকিৎসা, শিক্ষা, অর্থনৈতিক স্বচ্ছলতা, বাসস্থানের মান, এমনকি ধর্ম পালন ও সামাজিকতার দিক দিয়ে গাজার চেয়ে এগিয়ে আছে অনেকখানি।


www.pathagar.com

এর জন্য দায়ী হামাস গ্রুপ। কেননা তারা গাজাকে শাসন করে। তারা দুর্ভাগা এই কারণেই যে, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে নোংরা রাজনীতি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হচ্ছে- ফলে তারা এসব ব্যাপারে লক্ষ্য রাখতে পারছে না। আর যখনই লক্ষ্য রাখতে পারছে না, তখনই সুযোগ পাচ্ছে হামাস গ্রুপকে সারা দুনিয়ায় সন্ত্রাসীর দল বলে অপপ্রচার চালাতে। উল্টো ফাতাহ গোষ্ঠী শাসিত ওয়েস্ট ব্যাংকের লোকজন গোপনে ঐ অঞ্চলের দালাল এবং ভোগী শ্রেণীর লোকজনকে গোপনে ইউরোপ, ইসরায়েল এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র নানাভাবে সাহায্য করছে। ফলে জনগণ চুপ, ফাতাহ গ্রুপ হামাস গ্রুপের চেয়ে অনেকখানি নমনীয়। এমনকি ওয়েস্ট ব্যাংকের সাধারণ জনগণের জীবনযাত্রা পশ্চিমাদের মতো আধুনিক, তবে রক্ষণশীল তারা।

এছাড়া হামাস নিয়ন্ত্রিত গাজায় অবস্থিত বিদেশী এনজিও এবং মানবাধিকার সংস্থাকে পশ্চিমাদের সমর্থনে, ইসরায়েলের যোগসাজসে উঠিয়ে নেয়া হয়। ফলে গাজার সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে অসহ্য। সত্য বলতে কি, গাজায় কিন্তু সম্প্রতিকালে হামাস গ্রুপের তেমন আর কোনো প্রভাব-প্রতিপত্তি বা দাপট যাই বলি না কেন, তা আর নেই। তাদের কাছে অস্ত্র আছে বলে সাধারণ মানুষ তাদের ভয় করে, সমীহ করে, তবে মনে মনে পছন্দ করে না। গাজায় স্বাধীনভাবে রাজনীতি অর্থাৎ বহুদলীয় গণতান্ত্রিক রাজনীতির কোনো জায়গা নেই। সংবাদপত্রের স্বাধীনতা তো নেই বললেই চলে। গণতন্ত্রের সুষ্ঠু চর্চা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আদৌ এ দেশটিতে আসবে কি না তা হলফ করে বলা যায় না। এ হচ্ছে এখন সম্পূর্ণ ভাগ্যের ব্যাপার।

## তুরস্ক

মুসলিম বিশ্বের একমাত্র তুরস্কই হলো সফল গণতন্ত্র চর্চা এবং শাসন ব্যবস্থা কায়েমকৃত দেশ। বিশাল শক্তিশালী অটোমান সাম্রাজ্যের বিরুদ্ধে স্বাধীনতার লড়াই চালান মুস্তাফা কামাল আতাতুর্ক। এবং প্রবর্তন করেন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা। শুধু তাই নয়, জাতীয়তাবাদীতা, ধর্ম নিরপেক্ষতা, নারীর পূর্ণ অধিকার দান করে যান তিনি নিজে। তাই তুর্কীবাসী তাকে তাদের রাষ্ট্রের জনক বলে মানে। তিনি তুর্কী ভাষাকে রোমান হরফে লেখার প্রচলন ঘটান। এমনকি নামাজ পড়তে আরবী ভাষার বদলে তুর্কী ভাষার প্রচলন ঘটান। তার এই পরিবর্তন দেখে প্রথমে অনেককে সমালোচনার ঝড় তোলেন। কোনো কোনো দেশ এমন পরিবর্তন আনার চেষ্টা করে- কিন্তু পারেনি। তারা ব্যর্থ হয় সঠিক নেতৃত্ব দিতে পারেনি বলে। কেননা কামাল আতাতুর্কের মতো মস্তবড় ব্যক্তিত্ব তাদের ছিল না। জনগণের ভালোবাসায় তিনি ছিলেন সিক্ত।


www.pathagar.com

১৯২৪ সালে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা রাখা হলো শক্তভাবে এবং রাষ্ট্রের প্রধান হিসেবে রাষ্ট্রপতির ক্ষমতা আরো বাড়ানো হলো। এটা করা হয় জনগণের কল্যাণের দিকে নজর রেখে।

১৯৩৮ সালে যখন কামাল আতাতুর্ক মারা যান– তখন ক্ষমতায় এলেন ইসমেত ইনিনি, তিনি দেশ ও জনগণের শান্তি, সুখ ও কল্যাণের জন্য শান্তি, প্রগতি ও গণতন্ত্রের নানাদিকের শক্তিকে আরো দৃঢ় করলেন। অবশ্য কামাল আতাতুর্কের সৃষ্ট কোনো নিয়ম-কানুনকেই বিন্দুমাত্র রদবদল করেননি।

কামাল আতাতুর্কের দলের নাম ছিল রিপাবলিকান পিপলস পার্টি। ১৯৩০ সালে তখন গড়ে ওঠা ডেমক্রেটিক পার্টি তার দলকে নির্বাচনে হারিয়ে ক্ষমতায় যায়। প্রথম দিকে ডেমক্রেটিক পার্টির কার্যকলাপ ভালোই ছিল। জনগণের কাছে তাদের গ্রহণযোগ্যতাও যথেষ্ট ছিল কিন্তু বিরোধী দলের প্রতি তারা এমনই বিরূপ মনোভাব প্রকাশ করতো যে দিনে দিনে দেশটিতে সংঘর্ষ নেমে আসলো। ডেমক্রেটিক পার্টি যখন কামাল আতাতুর্কের দল– রিপাবলিকান পিপলস পার্টির সাথে পেরে উঠছিল না, তখন তারা সেনাবাহিনীকে ক্ষমতায় টেনে আনলো। ব্যস, তুরস্কের গণতন্ত্র মস্তবড় এক হুমকির সামনে দাঁড়িয়ে গেল।

ক্ষমতায় এলেন জেনারেল কারনেল গিরসেল। এসেই ডেমক্রেটিক পার্টির সরকারকে উৎখাত করলেন। একটি নতুন সংবিধান তখন লিখিত হলো এবং সেই সংবিধান অনুযায়ী দেশে রেফারেন্ডাম দিলেন। এতে তিনি শতকরা ৯০ ভাগ জনগণের সমর্থন পেয়ে ক্ষমতায় বসলেন। তাকে সরাতে সময় লেগে যায় অনেক বছর।

১৯৬১ সালে জাতীয় নির্বাচনের মাধ্যমে পুনরায় তুরস্কে গণতন্ত্র আসে।

তুরস্কে পুনরায় গণতন্ত্র হুমকির মুখে পড়ে ১৯৭১ সালে প্রেসিডেন্ট সুলিমান ডেমিরিলের আমলে। তিনি যখন ডানপন্থী দলের দ্বারা সমালোচিত হন– তখন। ঠিক সেই সময় সেনাপ্রধান প্রেসিডেন্ট সুলিমান ডেমিরেলকে ডেকে পাঠান এবং দেশে একটি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার গঠনের প্রস্তাব দেন। এতে ডেমিরিল রাজি না হয়ে সরাসরি পদত্যাগ করলেন।

১৯৭৩ সালে নির্বাচন হওয়া পর্যন্ত পর্যায়ক্রমে অনেকগুলো সরকার আসে এবং বিদায় নেয়। ১৯৭৩ সালের সেই নির্বাচনকে তুর্কীবাসীরা আজো নীরব নির্বাচন যুদ্ধ বলে আখ্যায়িত করে।

১৯৭০ সালে তুরস্কের জনগণ বেশ ক'টি রাজনৈতিক সহিংসতার দৃশ্য দেখলো। এমনকি পরপর বেশ ক'টি সরকারের পতনও তুরস্কবাসী প্রত্যক্ষ করলো। শেষে নেমে এলো সেনা আইন।



www.pathagar.com

১৯৮০ সাল নাগাদ সহিংসতা চরম পর্যায়ে পৌছলো। এর কারণ হলো ইসলামিক দলগুলো। তারা জাতীয় সঙ্গীত বর্জন করলো, জাতীয় পতাকা পুড়িয়ে দিল। যে দুটোর মধ্যে কামাল আতাতুর্কের উদ্দেশ্য ও মতবাদ নিহিত ছিল। এমন রাজনৈতিক উত্থান-পতনের মধ্যে হঠাৎ করে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে গেল। এই অভ্যুত্থান ছিল আগের দুটির চেয়ে ভয়াবহ। ফলে প্রায় তিরিশ হাজার সাধারণ মানুষ গ্রেফতার হলো বিনা কারণে।

১৯৮২ সালে জুলাই মাসে একটি সংবিধান আবার লেখা হলো এবং সেই সংবিধানে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতা আরো বাড়ানো হলো। সেই বছরেই নভেম্বরে পুনরায় নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং নতুন এক জনগণের সরকার ক্ষমতায় আসে। তুরস্কের ইতিহাসে গণতন্ত্রকে টিকিয়ে রাখার জন্য বলতে গেলে সবচেয়ে বড় ঝুঁকি আসে সাম্প্রতিককালে, জাস্টিস অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট পার্টি ক্ষমতায় যখন থাকে– তখন। এই পার্টির প্রধান ছিলেন তাইয়িপ এরদোগান। কিন্তু তার সাথে তলে তলে ইসলামিক দলগুলোর যোগাযোগ আছে, এই অজুহাত দেখিয়ে তাকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়িত করা হয়।

২০০৭ সালে জাস্টিস অ্যান্ড ডেভলপমেন্ট পার্টি পুনরায় প্রেসিডেন্ট হিসাবে এরদোগানের নাম সবার আগে প্রস্তাব করলো। কিন্তু সে প্রস্তাবে তিনি রাজি তো হলেনই না বরং প্রস্তাবকে নাকচ করে দিলেন। তাকে ক্ষমতা থেকে বিতাড়নের জন্য ধর্ম নিরপেক্ষ বিরোধী দল, ক্ষমতাবান সেনা কর্মকর্তাগণ বিশ্বাস করতেন যে, এরদোগান ক্ষমতায় এলে তুরস্ক হবে একটি গোঁড়া ইসলামিক দেশ। কেউ কেউ বললো, এরদোগান প্রেসিডেন্ট হলে সে দেশের আইন-কানুন গোপনে পাল্টিয়ে আতাতুর্কের স্বপ্নকে নস্যাৎ করে দেবে।

এমন যখন রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে কথা চালাচালি চলছে– তখন তুর্কী সেনা কর্মকর্তারা জানালো, যদি অনতিবিলম্বে দেশের সংবিধানকে সংশোধন না করে, নির্বাচন না করে, তাহলে ক্ষমতায় তারা আসবে। আর সেনাবাহিনী যদি ক্ষমতায় আসে তাহলে সহসাই সে ক্ষমতা আর জনগণকে ফিরিয়ে দেয়া হবে না। শুধু তাই নয়, প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থী কোনো ইসলামিক দলের হতে পারবে না।

বিরোধী দলের লোকজন এসব মেনে নিয়ে একজন উদারপন্থী প্রগতিশীল ব্যক্তিকে মনোনয়ন দিয়ে নির্বাচনে অংশ নিলেন। নির্বাচন হলো ২০০৭ সালের অগাস্টে এবং সে নির্বাচনে আব্দুল্লাহ গুল নামের ডেমক্রেটিক রিপাবলিকান পার্টি প্রার্থী প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন। তুরস্কের পেছনের ইতিহাস পড়ে যে কেউ ভাববেন যে, তুরস্কের গণতন্ত্রের ইতিহাস মানে– গণতন্ত্র চর্চার ব্যর্থ ইতিহাস, সেনা অভ্যুত্থানের ইতিহাস, মাঝে মাঝে সেনাবাহিনীর মাতুব্বরির ইতিহাস।


www.pathagar.com

আসলে তা কিন্তু সর্বৈব সত্য নয়। তুরস্ক একটি প্রগতিশীল আদর্শ দেশ হিসেবে গড়ে ওঠে ৯০ বছর আগে থেকে। কিন্তু দেশের অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক কোন্দলে এবং বহির্বিশ্বের খামাখা কালো হাতের ছোঁয়ায়, তার উল্লেখ করার মতো গণতান্ত্রিক চর্চার প্রভূত ক্ষতি হয়ে যায়। তুরস্কের গণতন্ত্রে মৌলবাদীদের যে প্রথম থেকেই এক ধরনের আধিপত্য ছিল তা সাম্প্রতিককালে প্রমাণিত হয়েছে। তারপরও জনগণ তাদের মেনে নিতে পারেনি। এর মধ্যে পুনরায় নির্বাচন আসে এবং সে নির্বাচনে প্রতিটি দল অংশগ্রহণ করে। জনগণ স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্বাচনে অংশ নেয়। অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে যে সরকার আসে তা যথেষ্ট গণতন্ত্রমনা এবং উদারনীতির। তুরস্ক কোন দিন মৌলবাদী, উগ্রপন্থী, চরমপন্থী, ইসলামী সন্ত্রাসী কোনো দলকে প্রশ্রয় দেয়নি। কেননা তারা গণতন্ত্রকে ভালোবাসে, গণতন্ত্রের পূজারী এক অসাধারণ জাতি।

## ইন্দোনেশিয়া

ইন্দোনেশিয়া বর্তমান বিশ্বের সর্ববৃহৎ মুসলিম দেশ। ইতিমধ্যে তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার ধারাতেই সর্বোচ্চ পর্যায়ে আছে। বলা যায় মুসলিম বিশ্বে ইন্দোনেশিয়া একটি উদাহরণ– অন্তত গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রবর্তনে। যদিও ফ্রিডম হাউজ ইন্দোনেশিয়াকে মুসলিম বিশ্বের একমাত্র সত্যিকারের গণতান্ত্রিক দেশ বলে আখ্যায়িত করেছে– তবু সেখানকার সুশীল সমাজ এবং স্বাধীনতার মান রাজনৈতিক অধিকার বাক স্বাধীনতা কতটুকু তার বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী কতটুকু অর্জন করেছে তা ভেবে দেখার বিষয়।

তবু মুসলিম অধ্যুষিত ইন্দোনেশিয়ার গণতন্ত্র বেশ হুমকির মুখে। স্বাধীনতার পূর্বে ইন্দোনেশিয়া ছিল ডাচ কলোনী এবং তখন ইন্দোনেশিয়া ডাচ ইস্ট ইন্ডিজ নামে পরিচিত ছিল।

১৯১৮ সালে ভোক সভাস্থল গঠিত হয়। তাতে অবশ্য স্থানীয় জনগণ ভোট দিতে পারতো না। কলোনির শাসকদল অর্থাৎ ডাচ অধিপতিরাই এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতো। কিন্তু সময়ের আবর্তনে একটি শক্তিশালী জাতীয়তাবাদী শক্তি মাথা তুলে দাঁড়ালো।

১৯২৭ সালে সুকর্ণ নামের একজন জাতীয়তাবাদের মন্ত্রে দীক্ষিত এক যুবক মাথা তুলে দাঁড়ালেন। তিনি একটি দল গড়লেন। সে দলের নাম ছিল ইন্দোনেশিয়ার জাতীয়তাবাদী দল (পি.এম.আই.)। কালবিলম্ব না করেই ডাচরা তাকে গ্রেফতার করে। কেননা ডাচরা তাদের অর্থনীতিকে ঠিক রাখার জন্য যে কোনো মূল্যে কলোনি সৃষ্ট ইন্দোনেশিয়ার শান্তি-শৃংখলার বিন্দুমাত্র বিঘ্ন ঘটতে


www.pathagar.com

দিতো না। ইন্দোনেশিয়া তখন রাবার এবং খনিজ তেলের জন্য অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ছিল। যে সমৃদ্ধির সাংঘাতিক চাহিদা ছিল বিশ্বজুড়ে। কেননা তখন বিশ্বজুড়ে চলছে অটো মোবাইলের জয়জয়কার এবং জমজমাট ব্যবসা। যে ব্যবসাতে তেল এবং রাবার দুটোই অত্যন্ত অপরিহার্য কাঁচামাল।

সুকর্ণ মাথাচাড়া দিয়ে ওঠার সাথে সাথে ডাচরাও অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক দিক দিয়ে সচেতন হয়ে উঠলো। কেননা ইস্ট ইন্ডিজ ইন্দোনেশিয়া কলোনির গভর্নর জেনারেল একই সাথে এই দ্বীপপুঞ্জের প্রাইমারী অয়েল কোম্পানি 'রয়েল ডাচ'-এর ডিরেক্টর ছিলেন।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় জাপানীরা ইন্দোনেশিয়ানদের ওপর চরম অত্যাচার চালায়। তাদের স্বাধীনতা এবং সার্বভৌমত্বের সচেতনতা এতে বৃদ্ধি পায়। জাপানীদের কারণে যুদ্ধ চলাকালীন সময়ে ডাচরা ইন্দোনেশিয়ানদের ওপরে তেমন কোনো অত্যাচার চালাতে সাহস পায়নি।

কিন্তু বিশ্বযুদ্ধ যেই শেষ হলো জাপানীরা দেশে ফিরে গেল আর অমনি ডাচরা তেল এবং রাবারের লোভে এবং এই দুই কাঁচামাল নিয়ে তাদের অর্থনীতিকে সচল রাখার জন্য পুনরায় তারা অত্যাচার শুরু করে দিলো। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক গণতান্ত্রিক সম্প্রদায় এই অত্যাচার সহ্য করলো না। তারা জোর প্রতিবাদ জানালো এর সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বললো, সারা বিশ্ব আজ ধ্বংসস্তূপের ওপর দাঁড়িয়ে। সেই ধ্বংসস্তূপের মধ্যে সমস্ত ইউরোপ আজ ছিন্নভিন্ন। ইওরোপের জন্য আমরা মার্শাল প্ল্যান করেছি অর্থনৈতিক সাহায্য দেবার জন্য। সেই মতো নেদারল্যান্ডকে দেয়া হচ্ছে প্রচুর অর্থ সাহায্য। যদি ডাচরা ইন্দোনেশিয়াতে তাদের কলোনি শাসনের মনোভাব পরিহার না করে এবং অত্যাচার বন্ধ না করে তাহলে আন্তর্জাতিকভাবে তাদের সব ধরনের সাহায্য বন্ধ করে দেয়া হবে। শেষে যখন তাই হলো– তখন দ্বীপপুঞ্জের সাধারণ মানুষ জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্বুদ্ধ হয়ে জেগে ওঠে। খুব অল্পদিন পরেই দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীন হয় –নাম হয় ইন্দোনেশিয়া।

১৯৪৯ সালে যখন পৃথিবীর বৃহত্তম এই মুসলিম দেশটির জন্ম হয় তখন পৃথিবীতে চলছে পুঁজিবাদের সাথে সমাজতন্ত্রের ঠাণ্ডা কিন্তু গভীর লড়াই। তার একদিকে পশ্চিমা বিশ্ব অন্যদিকে কম্যুনিস্ট দুনিয়া। স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর শাসন ব্যবস্থা সুকর্ণের হাতে থাকলো। কিন্তু মুশকিল হলো ইন্দোনেশিয়ার সমস্ত অফিসিয়াল কাজ হেগ থেকে পরিচালিত হতো বলে স্থানীয় ইন্দোনেশিয়ানরা প্রশাসনের কিছুই বুঝতো না। উপরন্তু তারা ছিল অশিক্ষিত, উগ্র এবং মূর্খ। ছিল না অভিজ্ঞ শাসক এবং উপযোগী শাসন ব্যবস্থা। ছিল না উন্নত প্রযুক্তি। অর্থাৎ



www.pathagar.com

একটি দেশ চালাতে গেলে যা প্রয়োজন তার কিছুই ছিল না। উপায়ান্তর না দেখে সুকর্ণ ১৯৫৭ সালে দেশে.সামরিক আইন জারি করলেন।

১৯৫৯ সালে তথাকথিত এক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য তিনি ডাক দিলেন। আর ভিতরে ভিতরে তার প্রেসিডেন্সি ঠিক রাখার জন্য সমস্ত ক্ষমতা ধীরে ধীরে কেন্দ্রীভূত করতে লাগলেন।

১৯৬৩ সালে এসে এর পুরোটাই পাল্টে যায়। সেপ্টেম্বর মাসে ৬ জন জেনারেলকে হত্যা করে প্রেসিডেন্ট সুকর্ণের অনুসারী ইন্দোনেশিয়ার কমিউনিস্ট পার্টির (পি.কে.আই.) নেতা-কর্মীগণ। মজার ব্যাপার হলো যে সেই মাসেই জেনারেল সুহার্তো সেই সব অনুগত কমিউনিস্ট নেতাদের হত্যা করেন।

এই ঘটনা ঘটনার সাথে সাথে চীনা বংশদ্ভূত কমিউনিস্ট পার্টির শত শত নেতারা আন্দোলনে নেমে পড়লো। সুহার্তো বাহিনী তাদেরও হত্যা করে।

১৯৬৭ সালে পরিষ্কার হয়ে গেলো যে, জেনারেল সুহার্তো এমনভাবে ক্ষমতা কুক্ষিগত করলেন যে, ক্ষমতা তার হাতে তুলে দেয়া ছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না।

সুহার্তো প্রায় ৩১ বছর দেশ শাসন করেন এবং এই সময়ে ইন্দোনেশিয়ার অর্থনৈতিক অবস্থার উন্নতি হয় আশাতীতভাবে। কিন্তু রাজনৈতিক, সামাজিক বা অন্যান্য কোনো কিছুরই তেমন উল্লেখযোগ্য কোনো উন্নতি হয়নি। গণতন্ত্র চর্চার কোনো পথ সেখানে খোলা ছিল না।

সুহার্তোর শাসন আমল ১৯৯০ সালে প্রবেশের সাথে সাথে তাঁর শাসন ব্যবস্থা নিয়ে দারুণভাবে সমালোচনা উঠলো। ইন্দোনেশিয়ানরা তাঁর নির্দেশনাকে মেনে নিতে পারছিল না।

১৯৯৭ সালে জনগণ রাস্তায় নেমে তাঁর শাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধে আন্দোলনের ডাক দিলো। তারা তাঁর শাসনের অবসান চাইলো। সুহার্তো বুঝলেন যে, তাঁর শাসন ব্যবস্থা এবং জনগণের মানসিকতা এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌছেছে যে, তাঁর পদত্যাগ করা ছাড়া আর কোনো উপায় নেই। ১৯৯৮ সালে তিনি ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ালেন।

সুহার্তোর পদত্যাগের সাথে সাথে ইন্দোনেশিয়া প্রবেশ করে গণতন্ত্রের উত্তরণের পথে। বেশ কিছু নতুন নিয়ম শাসন ব্যবস্থার মধ্যে প্রবেশ করানো হলো। যেমন- দেশের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হবেন সরাসরি দেশের জনগণের ভোটের মাধ্যমে। এর সাথে থাকবে পার্লামেন্ট মেম্বার যারাও জনগণের ভোটে নির্বাচিত এবং যারা একত্রে একজন প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করতে পারবেন।


www.pathagar.com

উপরন্তু নির্বাচিত প্রেসিডেন্টের পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে থাকবে সেনাবাহিনী। অর্থাৎ একেবারে গণতান্ত্রিক পরিবেশ। এবং এভাবে বর্তমানে ইন্দোনেশিয়া এখন মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র উত্তরণের এক মডেল। ইন্দোনেশিয়া প্রমাণ করেছে যে, ইচ্ছা থাকলে গণতন্ত্রের প্রতি শ্রদ্ধা থাকলে একটি জাতি সে শাসনতন্ত্রকে চর্চা করতে বেশি সময় দরকার হয় না। তাদের কোনো সাহায্যকারী কেউ ছিল না। ইন্দোনেশিয়া প্রমাণ করেছে ইসলাম এবং গণতন্ত্র পাশাপাশি চলতে পারে। তারা একে অপরের প্রাণ। একজন নির্জীব হলে অন্যজন তাকে প্রাণ দেবে। মূলকথা মুসলমানরাও পারে গোঁড়ামি বাদ দিয়ে, মৌলবাদীতা বাদ দিযে, উগ্রতা পরিহার করে চলে গণতন্ত্র কায়েম করে একটি গণতান্ত্রিক দেশ গড়তে –যেমন ইন্দোনেশিয়ার জনগণ গড়েছে।

## সেনেগাল এবং মালি

পৃথিবীতে মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে সেনেগাল এবং মালির ইতিহাস বেশ উজ্জ্বল। এই দেশ দুটোর মতো সফল ইতিহাস খুব কম মুসলিম দেশেরই আছে। সেনেগাল এবং মালির গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস বা অর্জনের ইতিহাস লক্ষ্য করার মতো।

১৯৮৩ সালে প্রেসিডেন্ট আবোদু দিউক প্রথম নির্বাচনের মাধ্যমে দেশে গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা করেন। ২০০০ সালে যখন পুনরায় নির্বাচন হয় এবং সে নির্বাচনে তিনি পরাজিত হন –তখন স্বেচ্ছায় এবং খুব সুন্দরভাবে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এটা ছিল সেনেগালের প্রথম সুষ্ঠুভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের নিদর্শন। সে নির্বাচনও হয়েছে মুক্ত এবং অবাধভাবে। ঠিক সেভাবে মালিতেও ১৯৯২ সালে নির্বাচন হয়, সে নির্বাচনে তৎকালীন স্বৈর সরকারের পতন ঘটে। সে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট আলফা ওমর কোনাফ ক্ষমতা ছেড়ে দেন। তিনি ক্ষমতা ছেড়ে গেলে নির্বাসনের মাধ্যমেই ক্ষমতার হাত বদল হয় এবং শাসনকর্তার পরিবর্তন ঘটে।

ইন্দোনেশিয়া, সেনেগাল এবং মালি তিন পোস্ট কলোনিয়াল মুসলিম রাষ্ট্র গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠায় অত্যন্ত সফল। পোস্ট কলোনিয়াল রাষ্ট্র হিসেবে যদিও এসব দেশে গণতন্ত্রের চর্চা, প্রতিষ্ঠা এবং উত্তরণের জন্য কোনো পথ ছিল না– তবু তারা এই শাসন ব্যবস্থা অর্জনে সার্থক এবং মুসলিম দেশগুলোর কাছে মডেল বলা চলে এবং বলা যায় খুব অল্প সময়ে তারা সফলতা অর্জন করে। যে কোনো দেশই স্বাধীনতা প্রাপ্তির পর খুব অল্প সময়ে গণতন্ত্র কায়েম করতে পারে না– কিন্তু এই দেশগুলো পেরেছিল। অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হয়, কলোনিয়াল রাষ্ট্রগুলোর গণতন্ত্র সম্পর্কে কোনো ধারণাই থাকে না।


www.pathagar.com

সেনেগাল এবং মালি এমন দুটি দেশ। তবু তারা পেরেছিল শুধুমাত্র তাদের নেতাদের কারণে। তবে মুসলিম দেশগুলোর ব্যাপারে বলা যায় যে, তারা যেন ভাগ্যাহত। বেশিরভাগ দেশই শোষিত এবং বঞ্চিত। অন্যদিকে তারা সম্পদশালী। যেমন– ইন্দোনেশিয়া, সেনেগাল, মালি –এই তিনটি দেশও তাই। এক সময়ের কলোনি শাসিত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দেশগুলো আজ পূর্ণ গণতান্ত্রিক দেশ।

## মধ্য এশিয়া

মধ্য এশিয়া বলতে সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নের সদ্য স্বাধীন ৫টি দেশকে বোঝানো হয়। যারা সমাজতান্ত্রিক ছত্রছায়া থেকে বেরিয়ে এসে গণতন্ত্রের চর্চায় পৃথিবীর অন্যান্য গণতান্ত্রিক দেশের সমকক্ষ। অথচ এই সব দেশগুলোর মধ্যে ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতির মধ্যে রয়েছে ব্যাপক পার্থক্য। এমনকি এসব জায়গায় কোনো কোনো স্থানে দৃশ্যত ইসলামের কোনো নিদর্শনই পাওয়া যায় না। এটা অত্যন্ত আশ্চর্যের ব্যাপার এখানকার বেশিরভাগ এলাকা সাম্প্রতিককালের। যেমন– কাজাখস্থান এক সময় ছিল রাশিয়ান সাম্রাজ্যের অধীনে, পরে তা চলে যায় ইউএসএসআর অর্থাৎ সোভিয়েত ইউনিয়নের অধীনে।

১৯৯১ সালে সোভিয়েত ইউনিয়নের অন্যান্য অঙ্গরাজ্যের মতো এটিও স্বাধীন হয়। সোভিয়েত শাসনামলে নূর সুলতান নাজারবায়েভ ছিলেন এর নেতা। ১৯৯১ সালের নির্বাচনে তিনি অভূতপূর্ব এক জয়ের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। অবশ্য এই নির্বাচনে তার প্রতিদ্বন্দ্বী কোনো প্রার্থী ছিলেন না।

২০০৫ সালে সে দেশের পার্লামেন্টেও ভোটের মাধ্যমে রাষ্ট্রপতি হিসেবে দেশ শাসন করার ক্ষমতা প্রদান করে। তিনি যেভাবে চেয়েছিলেন সেভাবেই তাঁকে ক্ষমতায় বসানো হয়েছিল। কাজাখস্তান বহুদলীয় গণতান্ত্রিক দেশ, কিন্তু সে দেশের রাজনীতিকে নিয়ন্ত্রণ করতো প্রেসিডেন্টের দল 'ওটান'।

বহুদলীয় নির্বাচন সে দেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু বিরোধী দলগুলো হঠাৎ করে অভিযোগ এনে নির্বাচন চেয়ে বসলো। সেই সূত্রে সাম্প্রতিককালের নির্বাচন অর্থাৎ ২০০৭ সালের নির্বাচনে ওটান পার্টি ৮৮টি আসন জয় করলো। বলে রাখা ভালো যে, কাজাখস্থান তার বাজার অর্থনীতি অনুযায়ী একটি ধনী দেশ। বহু ধর্ম এবং বহু জাতের বহু বর্ণের মানুষের বাস এখানে। নাজারবায়েভ যখন ক্ষমতায় বেশ সুন্দর মতো দেশটাকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন– তখন বিভিন্ন এনজিও'র তৎপরতা বৃদ্ধি পায়। এবং সাথে একাধিক রাজনৈতিক দলের জন্ম হয়। পরবর্তীকালে কাজাখস্থানের রাজনৈতিক অবস্থার বিশাল বিস্তৃতি ঘটতে থাকে।


www.pathagar.com

কিরগিজ প্রজাতন্ত্র স্বাধীন হয় ১৯৯১ সালে। ১৯৯০ সাল থেকে তাদের নেতা ছিলেন আসকার আকায়েভ। তিনিও ১৯৯১ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

১৯৯০ সাল জুড়ে বেড়ে ওঠা স্বাধীন পার্লামেন্টে তাঁকে সদস্যদের সাথে সংগ্রাম করতে হয়। এই দ্বন্দ্ব বা সংগ্রাম ২০০২ সালে এসে প্রকট আকার ধারণ করে, যখন সরকার বিরোধী দলের নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় চালায় এবং পুলিশের হাতে অহেতুক ৫ জন নিরীহ জনতা মৃত্যুবরণ করেন– তখন।

কিরগিস্তানের রাজনীতির মোড় ঘুরে যায় ২০০৫ সালের পার্লামেন্ট নির্বাচনে। বেনামি ভোট, কারচুপি ইত্যাদি ন্যাক্কারজনক ঘটনা ঘটলে জনগণ এর প্রতিবাদে রাস্তায় নেমে আসে। পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে আকায়েভকে জোরপূর্বক অপসারণ করা হয়। এই কর্মকাণ্ডের নাম দেয়া হয় 'টিউলিপ রেভ্যুলোশন'। ২০০৫ সালের নির্বাচনে জয়ী হয়ে প্রেসিডেন্ট হিসেবে কুরমান বেক বাকিয়েভ ক্ষমতায় না আসা পর্যন্ত এই রেভ্যুলেশন চলতে থাকে।

২০০৬ সালের ডিসেম্বরে বহু দলীয় গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য একটি উচ্চ ক্ষমতাসম্পন্ন সুশীল সমাজের নেতা এবং পার্লামেন্টের সদস্যদের নিয়ে আইনসিদ্ধ গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রচলন ঘটানো হয়। যার পক্ষে সে দেশের জনগণের এবং প্রেসিডেন্টের আস্থা ছিল শত ভাগ।

তাসকন্দ সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের পরপরই বিভক্ত হয়ে গৃহযুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে। যদিও ইমামালি রাখমোনোভ ১৯৯৪ সালের নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হন –তবু এই গৃহযুদ্ধ চলতেই থাকে। অবশেষে ১৯৯৭ সালের শান্তিচুক্তির মাধ্যমে এই গৃহযুদ্ধ বন্ধ হয়। যদিও মানবাধিকার সংস্থা বলছে যে, ১৯৯৭ সালের নির্বাচন ছিল প্রহসন মাত্র – তবু তিনি পুনরায় প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন।

আন্তর্জাতিক মহল এবং ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক ইনস্টিটিউটের মতে ২০০৬ সালের নির্বাচন ছিল গণতান্ত্রিক উত্তরণের পথে এক ধাপ এগিয়ে। কিন্তু দুর্ভাগা তাজিকিস্তানবাসী –গুটিকয় মনোনীত উপদেষ্টা নিয়ে তিনি দেশটাকে ধীরে ধীরে একনায়ক শাসকের মতো স্বৈরশাসনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকেন।

সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভের জন্য তুর্কমেনিস্তানের জনগণকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়েছিল। তখন তুর্কমেনিস্তানের শাসনকর্তা ছিলেন সুপারমুরাত নিয়াজভ। তিনিও ১৯৯২ সালে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় নির্বাচিত হন। তাঁর শাসনকাল প্রায় ৮ বৎসর পর্যন্ত।


www.pathagar.com

১৯৯৪ সালে পুনরায় নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেন এবং অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে সে নির্বাচন ছিল রেফারেন্ডাম স্টাইলের। সেই নির্বাচনে তিনি প্রায় ৯৯.৯% ভোট পান। ১৯৯৯ সালে নির্বাচনের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট হতে হবে এ তাঁর পক্ষে সম্ভব নয়। তিনি মুক্তি চান –এই কথা বললেন। সাথে সাথে পার্লামেন্ট তাঁকে আজীবন প্রেসিডেন্ট পদে থাকার জন্য অনুমতি দেয়।

২০০৬ সালে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্রসন্তান –গুরবাঙগুলি বার্দিমুখাম্মেদোভ নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। কিন্তু আন্তর্জার্তিক মহলের ভাষ্য মতে– সে নির্বাচন ছিল দুর্নীতিপূর্ণ পক্ষপাতমূলক। তিনি তাঁর দলেরই অন্যান্য ৪ জনের সাথে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করেন। প্রেসিডেন্ট হয়ে গুরবাঙগুলি সব ক্ষমতা তাঁর হাতে আনলেন এবং সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে ছিনিয়ে নিলেন।

উজবেকিস্তানের স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে তাদের কম্যুনিস্ট নেতা ইসলাম কারিমভ (যিনি পার্টির ফার্স্ট সেক্রেটারি ছিলেন) ১৯৯১ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন।

২০০৪ সালেও তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন। ২০০৭ সালের নির্বাচনেও অংশ নেন। কিন্তু আন্তর্জাতিক সংস্থা হিউম্যান রাইটস ওয়াচ বলছে –২০০০ সালের নির্বাচন বৈধ ছিল না। কেননা সংবাদপত্রের স্বাধীনতাকে হরণ করা হয় এবং বিরোধী কোনো দলকেই অংশগ্রহণ করতে দেয়া হয়নি সে নির্বাচনে। এই একই দোষে দুষিত বলে ধরা হয় তার ২০০৪ সালের নির্বাচনকেও। মধ্য এশিয়ার অন্যান্য দেশের মতোই উজবেকিস্তানেও গণতন্ত্র এক গভীর ষড়যন্ত্রের জালে জড়িয়ে পড়লো। ইসলাম কারিমভ দিনে দিনে স্বৈরশাসকের ন্যায় আচরণ শুরু করলো।

## মধ্যপ্রাচ্য

আমাদের গণতান্ত্রিক ইতিহাস উদ্ধারের পথচলায় মধ্যপ্রাচ্য একটি বিশাল ভূখণ্ডমাত্র। কিন্তু তাদের গণতন্ত্র চর্চার কোনো ইতিহাস নেই বললেই চলে। ফ্রিডম হাউজ মতে মধ্যপ্রাচ্যে খুব কম দেশই আছে যারা স্বাধীন। এইসব দেশের মধ্যে অনেকগুলোর জনগণের জীবন কলোনি শাসিত দেশের জনগণের মতো। তারা অদৃশ্য কিন্তু অত্যন্ত শক্তিশালী ক্ষমতার দ্বারা শাসিত তবে অত্যাচারিত বা নিগৃহীত নয়। যার জন্য সেসব দেশে গণতন্ত্র আসা বা গণতন্ত্র কায়েমের জন্য আন্দোলন এক অসম্ভব ব্যাপার। কুয়েত এবং ওমান এই ধরনের দেশের মধ্যে পড়ে। মধ্যপ্রাচ্যের বাইরে ব্রুনেই-এরও সেই একই অবস্থা।


www.pathagar.com

## আফ্রিকা

আফ্রিকাতে দুই ধরনের গণতন্ত্র দেখা যায়– স্বাধীনতার পূর্বে একরকম, আর স্বাধীনতার পর আর এক রকমের। সেখানে সামরিক অভ্যুত্থান অবশ্য ঘটনীয় একটি বিষয়। এবং এসব অভ্যুত্থান ঘটায় উচ্চাভিলাষী ক্ষমতালোভী কিছু সামরিক বাহিনীর পদস্থ জেনারেল। এমন দেশগুলোর মধ্যে আছে গাম্বিয়া, গিনি, মৌরতানিয়া এবং নাইজার। এসব দেশের সামরিক বাহিনী সাধারণ জনগণের চেয়ে অত্যন্ত শক্তিশালী বলে নিরীহ অসহায় নিরক্ষর জনগণ আন্দোলনে নামতে পারে না।

অন্যদিকে কলোনি শাসকেরা কলোনির ঐসব সাধারণ জনগণকে শাসনের নামে নিপীড়ন-নির্যাতন চালানোর সামরিক বাহিনীকে অত্যাধুনিক অস্ত্র এবং প্রশিক্ষণ দিয়ে সজ্জিত করে। ফলে যে কোনো ধরনের আন্দোলনের কোনো প্রশ্নই ওঠে না।

কলোনি থাকাকালীন সময়ে যে শাসন ব্যবস্থা থাকে তারা খুব কায়দা করে পাহাড়ী উপজাতি এবং সমতল ভূমির মিশ্র জাতির মধ্যে জাতি, ধর্ম, সম্প্রদায় ভেদের বিষবাষ্প ঢুকিয়ে দেয়। তখন হয় কি, দেশ বা তার শাসন ব্যবস্থা বা তার অর্থনৈতিক বা সামাজিক অবস্থা কি তখন তাদের খেয়াল থাকে না। পরস্পর পরস্পরের সাথে দেশের মধ্যে জাতিতে জাতিতে পরে পাশাপাশি দেশগুলোর সাথে পর্যন্ত যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।

এইসব যুদ্ধের এক শক্তির পেছনে থেকে অর্থ ও যুদ্ধাস্ত্র যোগান দেয় পশ্চিমা বিশ্ব আর অন্য পক্ষকে অর্থ এবং যুদ্ধাস্ত্র দিয়ে সাহায্য করে কলোনির শাসকেরা। এভাবে এক সময় তাদের স্বাধীনতার চেতনা বা বোধ দু'টোই নষ্ট হয়ে যায়– গণতন্ত্র চর্চা তো দূরের কথা! এই ধরনের দেশগুলো হচ্ছে লেবানন, সোমালিয়া, সুদান এবং পশ্চিম সাহারা। ইরাককেও এই ধরনের দেশের পর্যায়ে ফেলা যায়।

বাকি অন্যান্য মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে আছে সিরিয়া এবং সৌদি আরব। এই দুই দেশে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা না থাকলেও তাদের কেন্দ্রীয় সরকার অত্যন্ত সংগঠিত এবং শক্তিশালী।

এছাড়া জিবুতি, কমোরস, মালদ্বীপ, ইয়েমেন, সিয়েরালিয়ন, মরক্কো এবং মালয়েশিয়ায় একনায়ক পদ্ধতির সরকার দিনে দিনে বাতিল হয়ে গণতন্ত্রের পথে পা বাড়িয়েছে এবং আশা করা যায়, ঐসব দেশে একদিন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটবে, গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হবে।


www.pathagar.com

# গ্রীস

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর গ্রীস গ্রেট বৃটেনের খুব কাছের দেশ হয়ে গেলো- ফলে গ্রীসের সরকার প্রধানের নির্বাসিত জীবনে লন্ডনে বাস করার অনুমতিও পেয়ে যান। যুদ্ধ শেষ হলে পরে বোঝা গেল গ্রীসের সরকার প্রধান নির্বাসিত রাজা জর্জের (২য়) পক্ষে ক্ষমতায় ফিরে আসা খুব কঠিন হয়ে দাঁড়াবে। তখন গ্রীসে আমব্রেলা লেফটিস্ট পার্টি (ই.এ.এম.) দাবি করলো গ্রীসের ভবিষ্যৎ সরকার নিয়ে একটি নিরপেক্ষ স্বচ্ছ চিন্তা করার প্রয়োজনের উপযুক্ত সময় এটা। এগিয়ে আসে সেনাবাহিনী এবং অত্যন্ত সুন্দর একটি ভূমিকা পালন করে। এই বাহিনীর ভূমিকা দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধেও মিত্র বাহিনীর পক্ষে উল্লেখযোগ্য ছিল।

১৯৪৪ সালে গ্রীস থেকে নাজী বাহিনীকে তুলে নেয়া হয়, কিন্তু বামপন্থীরা তাদের অস্ত্র জমা দিল না। তখন বৃটেনের প্রধানমন্ত্রী উইনস্টোন চার্চিল, তিনি বৃটিশ সেনাবাহিনী পাঠালেন তৎকালীন গ্রীস সরকার জর্জ পাপান্ড্রুর পক্ষে কাজ করার জন্য। যার ফলে দেশটাতে শান্তি পুরোপুরি বিনষ্ট হলো।

১৯৪৬ সালে সৃষ্ট অশান্তি, গৃহযুদ্ধে পরিণত হলো। অবশেষে চার্চিল এবং স্ট্যালিনের মধ্যে একটি শান্তিচুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। সেখানে বলা হয়, গ্রীসে বৃটিশ কর্তৃত্ব চলবে অধিকতর। এইভাবে গ্রেট বৃটেন প্রথমে এই দেশে ঢোকার পর তার পাশে একসময় এসে দাঁড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। তাদের উদ্দেশ্য ছিল গ্রীসকে একটি নন কম্যুনিস্ট দেশ হিসেবে ধরে রাখা। গ্রীসকে নন কম্যুনিস্ট দেশ হিসেবে রাখতে হলে বামপন্থীদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে হবে। এর জন্য গ্রীসের সরকারের প্রয়োজন প্রচুর অর্থ। তাই কম্যুনিস্ট ঠেকাও আন্দোলনের জন্য ১৯৪৭ সালে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান গ্রীস সরকারকে প্রায় ২০০ মিলিয়ন ডলার দান করলেন।

এই গৃহযুদ্ধে শেষ পর্যন্ত জয় হলো ডানপন্থীঅলাদের। কেননা গ্রীসের কম্যুনিস্ট আন্দোলনকারীদের পেছনে ছিলেন যুগোস্লাভিয়ার প্রেসিডেন্ট জোসেফ ব্রোজ টিটো। তিনি হঠাৎ যুগোস্লাভিয়ার সাথে গ্রীসের সীমান্ত বন্ধ করে দেন। ফলে বামপন্থী এবং কম্যুনিস্ট নেতারা আর যুদ্ধ চালিয়ে যেতে পারেনি।

১৯৪৬ থেকে ১৯৪৯ সাল পর্যন্ত গৃহযুদ্ধ চলার পর ক্ষমতায় এলো কট্টরপন্থী শাসক। সেই সময় ঐ সরকারের পাশে এসে দাঁড়ায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। আধুনিক অস্ত্র, গোয়েন্দা প্রশিক্ষণ এমনকি অস্ত্র সরবরাহ করলো যেন গ্রীসের মাটি থেকে কম্যুনিস্টরা চিরতরে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত সবকিছু গেলো উল্টে। ১৯৬৭ সালে সামরিক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে জনগণের সরকারকে উৎখাত করে ক্ষমতায় বসলেন বাম ভাবধারার সেনাপ্রধান। ধীরে ধীরে সামরিক



www.pathagar.com

জান্তা সামরিক শাসনকে ঢেলে সাজালেন। রাজনৈতিক স্বাধীনতা এবং জনগণের অধিকারও অনেকখানি খর্ব করা হলো।

বৃটিশ এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নেতাদের এমনই একটি চাওয়া ছিল যে, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতালোভী একজন আসুক, অঢেল অর্থ সাহায্য দিয়ে তাকে ক্ষমতায় থাকার সুযোগ করে দিলেই এখান থেকে কম্যুনিস্টদের পক্ষে খুব সহজেই যুদ্ধ চালানো যাবে। অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট ট্রুম্যান-এর ১৯৪৭ সালের চিন্তাধারার সফল বাস্তবায়ন হলো। গণতন্ত্র চুলায় যাক– সামরিক জান্তা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং বৃটিশদের আহ্বানে খুব অল্প পরিমাণেই সাড়া দিয়েছিল। তবু তাতেই তারা খুশি হলো এবং সামরিক জান্তা ধীরে ধীরে কট্টর ডানপন্থী চিন্তার স্বৈর সরকারে পরিণত হতে থাকলো।

## আর্জেন্টিনা

পুরো বিংশ শতাব্দী জুড়েই আর্জেন্টিনাতে ছিল সংঘাতময় গণতন্ত্র। যে কোনোভাবেই হোক এখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রধান এবং প্রথম শর্ত জনগণের নির্বাচনে অংশগ্রহণ ক্ষমতা এবং নির্বাচন উত্তর পর্বে একটি গণতান্ত্রিক সরকার –তা এখানে ছিল। কিন্তু সাথে সাথে দুর্ভাগ্য হলো যে হর-হামেশাই ক্ষমতায় চলে আসতো সামরিক শাসকগণ। কিন্তু এক যুগান্তকারী পরিবর্তন ঘটলো তাদের জনপ্রিয় নেতা জুয়ান পেরন ১৯৭৩ সালে নির্বাসন জীবন শেস করে আসার পরই তার আগমনে দেশে রাজনৈতিক সংঘাত শুরু হলো।

এর শুরু পেরনকে বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা দেয়ার সময় থেকেই। সংঘর্ষ বেঁধে গেলো প্রধান দুই দলের মধ্যে। এই দুই দল হলো– পেরণবাদী ডানপন্থী মনেটানিরো পার্টি এবং সেটিও পেরনবাদী বামপন্থী দল এলিয়েনজা অ্যান্টি কম্যুনিস্ট আর্জেন্টিনা পার্টি। এই সংঘাত-হানাহানিতে শতাধিক লোক আহত হয় মৃত্যুবরণ করে মোট ১২ জন।

তৎকালীন আর্জেন্টিনার প্রেসিডেন্ট হেক্টোর জোসে ক্যামপোরা পেরোনকে বললেন সামনে ১৯৭৩-এর গুরুত্বপূর্ণ নির্বাচন, সেই নির্বাচনে শতকরা ৬১ ভাগ ভোট নিয়ে ক্ষমতায় আসুন, আমি অচিরেই পদত্যাগ করছি। দুর্ভাগ্যের বিষয় পেরণ ক্ষমতা পাওয়ার কিছুদিন পরই হার্ট অ্যাটাকে মারা যান। তখন ক্ষমতা দেয়া হয় তাঁর দ্বিতীয় স্ত্রী এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট মারিয়া ইস্টেলা ইসাবেল মার্টিজেন ভি পেরন। কিন্তু তিনি সেই সময়কার আর্জেন্টিনা নিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছিলেন। হু হু করে বেড়ে ওঠা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডের পাশে পাশে একেবারে ভগ্নপ্রায় অচল অর্থনীতি –কোন দিক সামাল দেবেন তিনি।


www.pathagar.com

১৯৭৬ সালে হঠাৎ করে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে গেল। তাতে তিনি ক্ষমতা হারালেন। সামরিক জান্তারা জানিয়ে দিল এ হচ্ছে জাতিকে পুনর্গঠনের জন্য পদক্ষেপ মাত্র। এবং এই পদক্ষেপে রাজনৈতিক নিপীড়ন নির্যাতন একেবারে চরম পর্যায়ে চলে যায়। এই সরকারের মূল লক্ষ্য ছিল বামপন্থী পেরনবাদী লোক এবং কম্যুনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের ওপর। এই সামরিক সরকার ক্ষমতায় থাকাকালীন সময়ে মোট ১৯ হাজার নেতা-কর্মীদের বিনা বিচারে হত্যা, কিডন্যাম এবং গুম করে।

১৯৭৯ সাল, তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টার। তিনি মানবতাবাদী এবং মানবাধিকারে বিশ্বাসী নেতা। বিশ্বের কোথাও রাজনৈতিক নিপীড়ন নির্যাতন তিনি মোটেও সহ্য করতে পারতেন না। যেই শুনলেন যে, আর্জেন্টিনার রাজনৈতিক অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে– অমনি প্রেসিডেন্ট কার্টার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র কর্তৃক প্রদত্ত সব ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা বন্ধ করে দিলো।

এরপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্ষমতায় রোনাল্ড রিগান আসলেন– তখন এই নীতির পরিবর্তন ঘটলো। রিগানের আমলে নিকারাগুয়া কন্ট্রা বিদ্রোহীদের দমন করতে গিয়ে সিআইএ আর্জেন্টিনার সামরিক সরকারের প্রতি অসন্তুষ্ট থাকলেও হাত মিলাতে হয়েছিল আর্জেন্টিনার গোয়েন্দা সংস্থার সাথে। তাদের নানারকম সাহায্য-সহযোগিতা করার সাথে সাথে কন্ট্রা বিদ্রোহীদের দমনের জন্য আর্জেন্টিনার পদস্থ গোয়েন্দা অফিসারদের প্রশিক্ষণও দিয়েছিল।

সত্যি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মতো একটি গণতান্ত্রিক দেশের জন্য এহেন আচরণ অত্যন্ত ন্যাক্কারজনক। কেননা আর্জেন্টিনায় তখনও গণতন্ত্রের পক্ষের রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের ওপর চলছে চরম নির্যাতন-নিপীড়ন।

## কঙ্গো

১৮৮৫ সাল থেকে কঙ্গো বেলজিয়ামের রাজা লিওপোল্ড (২য়)-এর ছিল ব্যক্তিগত সম্পত্তি। ১৯০৮ সালে এটিকে রাষ্ট্র হিসেবে ঘোষণা করা হয় –তখন এর নাম হয় কঙ্গো এবং কঙ্গো তখন ছিল বেলজিয়ামের কলোনিমাত্র। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর পৃথিবীর অন্যান্য কলোনির মতো বেলজিয়ান কঙ্গোতেও সাংঘাতিকভাবে বিদ্রোহ দেখা দিল, স্বাধীনতার আন্দোলন। এর পাশে আফ্রিকা এগিয়ে এসে দাঁড়ালো। তারাও মরিয়া স্বাধীনতার জন্য। সঙ্গী হিসেবে কঙ্গোকেও নিলো।


www.pathagar.com

১৯৫০ সাল জুড়ে কঙ্গোর দুই প্রধান স্বাধীনতাকামী দল এমএনসি, এর নেতা ছিলেন পেট্রিস লুমুম্বা এবং আবাকো-এর নেতা ছিলেন যোশেফ কাসাভুবু–এঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রামকে একবিন্দুতে নিয়ে দাঁড় করালেন।

১৯৫৯ সালের জানুয়ারিতে বেলজিয়ান সরকার জানালো যে, ঐ বছরের শেষে কঙ্গোতে জাতীয় এবং প্রাদেশিক দুই নির্বাচনই অনুষ্ঠিত হবে। ১৯৬০ সালের জুন মাসের সেই নির্বাচনে লুমুম্বা নির্বাচনে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করেন এবং কোয়ালিশন সরকার গঠন করেন –যেখানে কাসাভুবু ছিলেন তার প্রেসিডেন্ট।

নতুন এই রাষ্ট্রের ভাগ্য খারাপ ছিল– দেশের আইন-শৃঙ্খলা প্রায় ভেঙে পড়লো। এই সুযোগ বেলজিয়ান বাহিনী কঙ্গোতে পুনরায় প্রবেশ করে। তারা বললো, দেশে শান্তি-শৃঙ্খলা ফিরে এলেই আমরা চলে যাবো। কঙ্গো তখন থেকেই খনিজ সম্পদে অত্যন্ত সমৃদ্ধ ছিল। প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বা কাল বিলম্ব না করে জাতিসংঘের কাছে আল্টিমেটাম পাঠালেন যে অতি দ্রুত বেলজিয়ামকে সৈন্য সরিয়ে নেয়ার জন্য বলা হোক অন্যথায় আমি (ইউএসএসআর) সোভিয়েত ইউনিয়নের কাছে সাহায্য চাইবো। এই আহ্বান বেশ কাজে দিয়েছিল। জাতিসংঘ সোভিয়েত ইউনিয়নের নাম শোনামাত্র সৈন্য পাঠালো, বেলজিয়ান সৈন্যরা ফিরে গেল কিন্তু বিষয়টা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভালো চোখে দেখলো না। তারা বললো, কঙ্গো কমিউনিস্ট রাষ্ট্র হয়ে যাচ্ছে, সুতরাং ...।

অল্পকাল পরেই কাসাভুবু-লুমুম্বা কোয়ালিশন দেশ চালাতে ব্যর্থ হয়। তখন একদিন কাসাভুবু প্রধানমন্ত্রী লুমুম্বাকে অফিস থেকে বের করে দেন। এর পর ধারাবাহিকভাবে বেশ কতগুলো সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। এর মধ্যে প্রথম অভ্যুত্থানে ব্যর্থ হন জেনারেল যোসেফ দেশিরি মোবুতু –কিন্তু ১৯৬৫ সালের নভেম্বর মাসের অভ্যুত্থানে জায়েরেকে বাদ রেখে বাকি অংশের শাসনভার কেড়ে নিলেন। অবশ্য প্রথম অভ্যুত্থানেই লুমুম্বাকে বেলজিয়ামের সহযোগিতায় গ্রেফতার করে খুন করা হয়। এতে সিআইএরও হাত ছিল। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রই প্রথম এবং একমাত্র দেশ যে নতুন এই সামরিক জান্তাকে স্বীকৃতি দিয়েছিল।

মোবুতু পশ্চিমা বিশ্বের সাহায্য-সহযোগিতা পেতে থাকলো। পার্লামেন্ট থেকে সব সদস্য পদ বাতিল করেন। সকল ক্ষমতা হাতের মুঠোয় আনেন। রাজনৈতিক সমস্ত দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করেন শুধু নিজের দল ছাড়া। এরপর শুরু করেন জনগণের ওপর নানারকম অত্যাচার-অনাচার।

১৯৯০ সালে চরম চাপের মুখে পড়ে মোবুতু বহুদলীয় রাষ্ট্রে পরিণত করতে সম্মত হলেন। কিন্তু ১৯৯২ সালে ক্ষমতা ভাগাভাগি নিয়ে চুক্তি স্বাক্ষরিত হওয়ার কারণে নির্বাচন আর হলো না। এর মধ্যেই রুয়ান্ডা জায়েরের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়ে।


www.pathagar.com

১৯৯৭ সালের প্রথম সেনা অভ্যুত্থানে লরেন্ট দেশিবি কাবিলা, মোবুতুকে ক্ষমতাচ্যুত করেন। তখন এর নাম হয় ডেমক্রেটিক রিপাবলিক অব কঙ্গো।

অল্প কিছুদিন পরেই কাবিলার পেছনে যারা ছিলেন তারা এবার তার বিরুদ্ধাচরণ করলো। এতে করে দ্বিতীয় কঙ্গোর যুদ্ধ শুরু হলো। এই যুদ্ধ চলে ২০০৩ সাল পর্যন্ত। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর এতো রক্তক্ষরণ আর কোথাও দেখা যায়নি। এই যুদ্ধে প্রায় ৪ মিলিয়ন মানুষ মারা যায়। বর্তমানে কঙ্গো দাঁড়িয়ে আছে এক কঠিন পরীক্ষার মুখে পড়ে থাকা গণতন্ত্রের সামনে। সাম্প্রতিককালের নির্বাচনে সেখানে যথেষ্ট সহিংসতার ঘটনা দেখা গেছে। কঙ্গোর বর্তমান অবস্থা অন্যান্য সকল কলোনিশাসিত দেশের মতোই।

পশ্চিমা বিশ্বের শক্তির একটি দেশ বেলজিয়াম, সব সময় কঙ্গোর গণতান্ত্রিক অবস্থার কোনো মূল্যায়ন করেনি। স্বার্থ থাকলে বেলজিয়াম কঙ্গোতে সেনাবাহিনী নামিয়েছে। স্বার্থ না থাকলে ঘুরেও তাকায়নি। ঠিক সেভাবে কঙ্গো যখন স্বাধীন হয়, তখন বেলজিয়াম কোনো মতে চায়নি এখানে গণতান্ত্রিক পরিবেশ ফিরে আসুক বা গণতন্ত্রের উত্তরণ ঘটুক। হঠাৎ করে কঙ্গোতে সেনা অভ্যুত্থান ঘটে। সে অভ্যুত্থানে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাত ছিল। সামরিক জান্তা এসে গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাত করে। কঙ্গোর খনিজ সম্পদ, তার পরিশ্রমী জনগণ পশ্চিমা বিশ্বের বড় প্রয়োজন ছিল। তাই তারা সামরিক জান্তাকে সাহায্য করে। কিন্তু এর পেছনে আরো একটি ঘৃণ্য উদ্দেশ্য ছিল, তা হলো কম্যুনিস্টদের সমূলে ধ্বংস করা। সাথে সাথে কঙ্গোর জনগণকে ধীরে ধীরে পোষ মানানো।


www.pathagar.com

# পারস্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রসমূহ

পারস্য উপসাগরীয় দেশগুলো খুব লক্ষ্য করার মতো, কেননা এ অঞ্চলে পশ্চিমাদের উপস্থিতি দিনে দিনে দারুণভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে। বিশেষ করে মার্কিনী সৈন্যদের পদচারণায় এ অঞ্চল মুখরিত। ফলে পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক কিছু প্রভাব এবং চিন্তা-ভাবনার ছাপ এখানে দেখা যায়।

## কুয়েত

কুয়েতের পার্লামেন্ট সদস্য হওয়ার জন্য আছে উন্মুক্ত নির্বাচন। কেননা কুয়েতের পার্লামেন্ট বেশ শক্তিশালী এবং আধুনিক ও অপেক্ষাকৃত উদারনীতির। পার্লামেন্টে ৫০ জন সদস্য থাকেন এবং আরো ১৫ জন আসেন সরাসরি কেবিনেট থেকে– যাদেরকে প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করেন। প্রধানমন্ত্রীকে নিয়োগ দেন স্বয়ং সে দেশের আমির। এই পার্লামেন্টের আছে স্বাধীন ক্ষমতা। যারা প্রধানমন্ত্রী বা আমিরের দেয়া যে কোনো প্রস্তাবকেই নাকচ করে দিতে পারেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, ১৯৯৯ সালে আমিরের আনিত প্রস্তাব। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন নির্বাচনে নারীর অংশগ্রহণকে – জাতীয় নির্বাচনে নারীরও ভোটাধিকার থাকবে কিন্তু আমিরের দেয়া সে প্রস্তাবকে পার্লামেন্ট নাকচ করে দেয়। অবশ্য উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলোর পার্লামেন্টে আমিরের আনিত যে কোনো প্রস্তাবকে নাকচ করে দেয়াটা একটা প্রচলিত বিষয় এবং পার্লামেন্ট সদস্যদের চেয়ে আমিরেরা অনেক উদার। শাসক সাবাহ্ পরিবার শাসন ক্ষমতায় অত্যন্ত শক্তিশালী অবস্থায় আছে।

গণতন্ত্র নির্যাতিত এবং নিপীড়িত হওয়ার পারস্য উপসাগরীয় আর একটি রাষ্ট্র হচ্ছে বাহরাইন। বাহরাইন এক সময় ছিল বৃটিশদের রক্ষণাবেক্ষণে থাকা রাষ্ট্র। ঐ সময় বৃটিশরা সেখানে তাদের স্বার্থসিদ্ধির জন্য কিছু প্রতিষ্ঠান তৈরি করে, যেমন– মেয়েদের জন্য শিক্ষালয় এবং মুক্তা শিল্প। যাই হোক সে সময় বামপন্থী শ্রমিক দল বেশ জোরেশোরে মাথা চাড়া দিয়ে ওঠে এবং ১৯৫০ সাল জুড়ে চললো তাদের রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য আন্দোলন। সে আন্দোলনে তাদের নেতাকে আটক করে নির্বাসিত করা হয়। বাহরাইন স্বাধীনতা অর্জন করলে পরে নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা তৈরি করা হয়। কিন্তু বিধি বাম, নতুন শাসনতন্ত্র নিয়ে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সাথে আমিরের মতভেদ দেখা দেয়। সাথে সাথে আমির সদস্যদের পদ বাতিল ঘোষণা করে পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেন। অথচ এই শাসন ব্যবস্থাকে ২০০২ সালে রাষ্ট্রের শাসক



www.pathagar.com

পরিবার মনোনীত করেন। এর মধ্যে অবশ্য তাদের স্বার্থ ছিল। শাসন ব্যবস্থার রদবদল অনুযায়ী পার্লামেন্টে দুইটি হাউজ থাকবে। নির্বাচিত লোয়ার হাউজ এবং নিয়োগ দেয়া আপার হাউজ। দুই হাউজ সমান আকৃতির। তফাৎ শুধু এই যে, লোয়ার হাউজ পরিচালিত হবে পূর্বের সেই শাসনতন্ত্র অনুযায়ী।

২০০৫ সালে যখন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য এক ব্যাপক পরিবর্তন আসলো– তখন বাদশাহ হামিদ বিন ঈশা আল খালিফা এবং তার পরিবার শাসক হিসেবে শাসনভার লাভ করেন এবং যারা আজ পর্যন্ত বাহরাইনকে শাসন করছেন। সেদিনের সেই নির্বাচন ছিল সাজানো, নিপীড়ন, নির্যাতন আর প্রহসনের।

## কাতার

কাতার পারস্য উপসাগরীয় আর একটি রাষ্ট্র, যারা গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সাংঘাতিক রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে।

১৯১৬ সালে কাতার বৃটিশদের হাতে চলে যায়। তারা কলোনি না বানালেও সমস্ত নিরাপত্তার ভার ছিল তাদের ওপরে। এর পূর্বে কাতার ছিল বাদশাহ শাসিত একটি ক্ষুদ্র রাষ্ট্র।

১৯৭১ সালে কাতার পূর্ণ স্বাধীনতা লাভ করে। স্বাধীনতার পরপরই বাদশাহীতন্ত্র নির্মূল করে হামাদ বিন খালিফা আল থানি সামরিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক অনেক পরিবর্তন আনেন এবং নিজে আমির হন।

১৯৯৯ সালে আমির সাধারণ নির্বাচনের জন্য ঘোষণা দেন। শুধু তাই নয়– সেই নির্বাচনে মহিলাদের ভোট প্রদানের অধিকার নিশ্চিত করেন।

২০০৫ সালে তিনি একটি নতুন এক কক্ষ বিশিষ্ট শাসনতন্ত্রের অনুমতি দিলেন– যেখানে দুই-তৃতীয়াংশ থাকবে নির্বাচিত প্রতিনিধি। এমনকি এইসব সদস্যগণের ভোটের মাধ্যমে মন্ত্রী নিযুক্তিকরণ, বাতিল করার এবং বাজেট ঘোষণায় মতামত প্রদান করার ক্ষমতা পর্যন্ত থাকবে। এইসব মতামত শেষ পর্যন্ত বইয়ের পাতাতেই পড়ে থাকলো। এরপর আর কোনোদিন নির্বাচন হলো না। সেই বাদশাহী চালে আমিরতন্ত্র রয়ে গেল– যেখানে সরকার ছাড়া অধিকাংশ জনগণের মতামতের মূল্য শূন্যের কোঠায়।

## ইয়েমেন

১৯৯০ সাল থেকে প্রেসিডেন্ট আলী আব্দুল্লাহ সালেহ ইউনাইটেড ইয়েমেনকে শাসন করে আসছেন। একটি সেনা অভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে ১৯৭৮ সালে তিনি প্রথমে উত্তর ইয়েমেনের ক্ষমতায় আসেন। তারপর ইয়েমেন একত্রিত হয়।


www.pathagar.com

১৯৯৯ সালে প্রথম নির্বাচনের সময় তিনি ছিলেন প্রাদেশিক শাসনকর্তা। ২০০৬ সালে তিনি পুনরায় নির্বাচিত হন এবং ক্ষমতা গ্রহণ করেন। আশা করা যায় ২০১৩ সাল নাগাদ তিনি নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না- তবে ততদিনে ক্ষমতায় বসার জন্য তার পুত্র আহমাদের বয়স ক্ষমতায় বসার মতো হবে এবং আশা করা যায় সে-ই হবে পরবর্তীকালের শাসনকর্তা। নির্বাচনে অংশ নেয়ার মতো অনেক দল আছ- কিন্তু ক্ষমতায় যাওয়ার মতো তাদের কোনো পথ নেই।

১৯৯৯ সালে প্রধান বিরোধী দল থেকে একজন প্রার্থীকে মনোনয়ন দেয়া হয়, কিন্তু তাকে অযোগ্য ঘোষণা করা হয়। যে কেউ যদি কোনোরকম সংস্কার বা বিরোধিতা আনতে চান, তাহলে তা হতে হবে প্রেসিডেন্ট সালেহ'র মনের মতো- অন্যথায় অযোগ্য বলে ঘোষণা করা হয়।

## সৌদীআরব

সৌদী আরবে একেবারে কঠোরভাবে বাদশাহীতন্ত্র চলে। যেখানে বাদশাহ'র হাতে সমস্ত ক্ষমতা থাকে। সাম্প্রতিককালে সেখানে কিছুটা হলেও গণতন্ত্রের বাতাস লাগছে।

১৯৯২ সালে জনগণের অনুরোধে বাদশাহ ফাহাদ কিছু মৌলিক আইন প্রণয়ন করেন এবং জনগণের অনুরোধ রক্ষার্থে তাদের কিছু দাবি মেনে নেন এবং সুরা কাউন্সিল প্রতিষ্ঠা করেন। কিন্তু এই কাউন্সিল ছিল একেবারে বাদশাহ'র হাতে এবং বাদশাহ নিজে তাদের নিযুক্ত করেন। এখানেও একটু কারচুপি আছে সদস্যগণ অবশ্য বাদশাহ পরিবারের হতে হবে। কোনো রাজনৈতিক আলাপই মজলিশে সুরা ছাড়া প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু প্রশংসা করার মতো বিষয় হলো যে, ঐতিহাসিকভাবে শিয়া মুসলমানদের সাথে তাদের চরম বিরোধ থাকলেও মজলিসে সুরায় ২ জন শিয়া প্রতিনিধি থাকেন।

২০০৫ সালে বাদশাহ আব্দুল্লাহ আরো একধাপ এগিয়ে গেলেন। তিনি মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন পরিচালনার জন্য নির্বাচনের মাধ্যমে সদস্য নিয়োগের ব্যবস্থা করেন যা এর পূর্বে ছিল না। এই নির্বাচনে নারী সদস্য ইচ্ছা করলে অংশ নিতে পারবেন তবে অবশ্যই তাকে মুসলমান হতে হবে।

পশ্চিমা বিশ্বের আগ্রাসন গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নিমিত্তে নয়- তাদের আগ্রাসন গণতন্ত্রের কথা বলে যে কোনো দেশে সে যে তন্ত্রই থাকুক না কেন, তাতে তাদের কোনো যায়-আসে না, তাদের স্বার্থসিদ্ধি হলেই হলো। তবে এই মনোভাবটা তাদের বড় কঠোর হয় যদি দেশটি মুসলিম দেশ হয় –তখন। ইতিহাস ঘাটলে আমরা দেখতে পাবো কলোনি করে রেখে বিভিন্ন দেশের প্রতি


www.pathagar.com

তাদের কি আচরণ। তাদের কলোনিভুক্ত সে সব দেশে যতবার গণতন্ত্র আসতে চেয়েছে ততবার কি পরিমাণ নিপীড়ন, নির্যাতন এবং অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়েছে তাদের। জাতীয়তাবাদী কোনো চেতনাকে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতেই দেয়নি। পশ্চিমাদের তন্ত্র একটিই তা হলো যে কোনো মূল্যে অর্থনীতিকে ঠিক রাখা। উপরে প্রদত্ত উপসাগরীয় রাষ্ট্রগুলো সেই উদ্দেশ্যের শিকার।

## গুয়াতেমালা

অতি অল্প সময়ে বেড়ে ওঠো গণতান্ত্রিক উত্তরণে বাধার প্রাচীর হয়ে দাঁড়ানো এবং তার বিরুদ্ধে যাবতীয় ছল-চাতুরীর আশ্রয় নিয়ে তাকে নস্যাৎ করার এক দীর্ঘ ইতিহাস মনে হয় লাতিন আমেরিকার গুয়াতেমালার চেয়ে পৃথিবীর আর কোনো দেশের নেই।

১৯৩০ সাল জুড়ে গুয়াতেমালা শাসন করেছেন এক নির্যাতিত নেতা জর্জ উবিকো কাস্তুকিজা।

১৯৪৪ সালে এক গণ অভ্যুত্থানের পর গুয়াতেমালাতে চরম প্রতিদ্বন্দ্বীতাপূর্ণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সে নির্বাচনে জয় লাভ করে দেশের প্রেসিডেন্ট হন জুয়ান জোসে আরিভালো। ক্ষমতায় আসার পর তিনি বেশ কিছু ভূমি সম্পর্কিত আইনের সংস্কার করেন। শ্রমিকদের নানারকম আইন পাল্টে তাদের ট্রেড ইউনয়নের ক্ষমতা বাড়িয়ে দেন। এতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি ব্যবসায়িক দিক থেকে বেশ ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে পড়ে। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি ছিল গুয়াতেমালার সর্ববৃহৎ শিল্প প্রতিষ্ঠান। এই প্রতিষ্ঠানে প্রায় ৪০ হাজার শ্রমিক কাজ করতো। এই কোম্পানি একইভাবে গুয়াতেমালার রেলপথ, বিদ্যুৎ, টেলিগ্রাফ এবং দেশের একমাত্র জাহাজবন্দর নিয়ন্ত্রণ করতো। শ্রমিকদের কাছে এই কোম্পানী ছিল ভয়ংকর। বাধ্যতামূলক অতিরিক্ত সময় শ্রম এবং ট্যাক্স গ্রহণে এরা ছিল অত্যন্ত হিংস্র। তারা উচ্চহারে যে ট্যাক্স গ্রহণ করতো, তা তারা সরকারকে দিতো না –তারা এটা লাভ হিসেবে ধরে কোম্পানির নামে জমা রাখতো।

আরিভালোর শাসনামলে কিছু আইনের দৃষ্টান্তমূলক পরিবর্তন আনলেন। শ্রমিকদের বেতন, বোনাস এবং অধিকার নিশ্চিত করা হলো, বেতন বাড়ানোসহ কর্মদিবসের নির্দিষ্ট সময় বেঁধে দেওয়া হলো। নতুন আইন প্রবর্তন হওয়ার সাথে সাথে শ্রমিকেরা শক্তিশালী ইউনিয়ন বানালেন এবং অচিরেই ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানিতে ধর্মঘটের আহ্বান জানিয়ে কোম্পানিকে বন্ধ গোষণা করলো। নেতৃস্থানীয় শ্রমিকেরা সোজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্টেট ডিপার্টমেন্টে এ বিষয়টি



www.pathagar.com

জানালো। ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানি গোপনে ডানপন্থী নেতা কার্লোস ক্যাস্টিলো আরমাসের কাছে সাহায্যের জন্য হাত বাড়ায়। সাহায্যের সামগ্রী হিসেবে পায় প্রচুর অর্থ এবং অস্ত্র। এর পাশাপাশি চলতে থাকলো প্রেসিডেন্ট আরিভালোর বিরুদ্ধে গোপনে মিথ্যা রচনা করা।

প্রেসিডেন্ট হ্যারী ট্রুম্যান বসে থাকলেন না। তিনি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির অনুরোধে মার্কিনী অভিযান চালানোর জন্য নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট আরিভালোকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। কিন্তু সিআইএস এবং স্টেট ডিপার্টমেন্ট দেখলো যে, যেহেতু কমিউনিজম সফল এবং মাথাচাড়া দিয়ে উঠেছে অন্যদিকে সোভিয়েত ইউনিয়নও পারমাণবিক শক্তি অর্জন করে ফেলেছে এবং প্রেসিডেন্ট আরিভালো বামধারার নেতা– সুতরাং যে কোনো সময়ে আরিভালো কমিউনিজমের দিকে ঝুঁকে পড়তে পারে।

আর যদি ঝুঁকে পড়ের তাহলে লাতিন আমেরিকা সহসাই ঝুঁকবে সে দিকে এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রাজনীতি লাতিন আমেরিকাতে অসম্ভব হয়ে পড়বে। তাদরে ধারণাই ঠিক, যদি কোনোভাবে কমিউনিজম বা সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা একবার লাতিন আমেরিকার দু'একটি দেশে প্রতিষ্ঠা পেতো তাহলে ভাবাই যায় না যে, সারা বিশ্বে মার্কিন নীতির কি অবস্থা হতো। তারা কি নমনীয় হতেন? না আরো বেশি আক্রমণাত্মক হতো? নমনীয় হলে জেঁকে বসতো কমুনিজম বা সমাজতন্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা আর আক্রমণাত্মক হলে অস্থিরতা নেমে আসতো বিশ্ব রাজনীতিতে।

১৯৫০ সালে অনুষ্ঠত হলো গুয়াতেমালার রাজনীতির সবচেয়ে সফল অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন– সে নির্বাচনে প্রেসিডেন্ট হিসাবে নির্বাচিত হলেন জেকোবো আরবেনজ গুজমান। কিন্তু গণতন্ত্র চর্চার এই নিরীক্ষার নির্চাচনী ফলাফল অল্পকাল স্থায়ী হয়। প্রেসিডেন্ট আরবেনজ প্রেসিডেন্ট হওয়ার পর ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির জোর করে কেড়ে নেয়া সাধারণ কৃষকদের আবাদি জমি ফিরিয়ে দিলেন। এতে করে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র মনে মনে গণতন্ত্রের নামে অন্য এক কূট চাল চেলে আরবেনজকে সরানোর নীল নকশা তৈরি করে ফেললো। মার্কিনী দালাল, জোতদার, নকল ভূস্বামী সর্বপরি ইউনাইটেড ফ্রুট কোম্পানির কর্তাব্যক্তিরা প্রচার করতে থাকলো যে, প্রেসিডেন্ট বেনজ কমুনিস্ট এবং তার সাথে সোভিয়েত সরকারের রয়েছে গভীর গোপন এক সম্পর্ক। তার কার্যকলাপ এর প্রমাণ দেয়। প্রচার-প্রচারণা এমন অবস্থা করলো যে দেশের সামাজিক অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক পরিস্থিতি দেখে মাত্র তিন বছরের মাথায় তাকে নির্বাচন দিতে হলো। এই তিন বছরের মধ্যে ইউএস সেন্ট্রাল ইন্টেলিজেন্স



www.pathagar.com

এজেন্সি নিকারাগুয়ার একনায়ক সামরিক জান্তা আনাসটাসিও সোনোজা জিবেইলি এবং ডোমিনিকার একনায়ক সামরিক জান্তা রাফায়েল ট্রুইজিল্লো মোলিনা'র সাথে এক গোপন আঁতাত করে আরবেনজকে ক্ষমতা থেকে সরানোর জন্য। তারা রাজি হলেন কেননা আরবেজন ক্ষমতায় এলেই তাদের ক্ষমতায় থাকা মুশকিল হয়ে পড়বে।

যেমন ভাবা তেমন কাজ এবং তার ফলাফল। নির্বাচন হলো এবং সেই নির্বাচনে আরবেজন পরাজিত হলেন, ক্ষমতায় এলেন ডানপন্থী কার্লোস ক্যাস্টিলো আরমাস।

ক্যাস্টিলো এসেই তার একনায়ক শাসন চালু করলেন।

১৯৫৫ সালের অনুষ্ঠেয় নির্বাচন বাতিল ঘোষণা করলেন। তবুও মার্কিনীদের কি নির্মম গণতন্ত্রের পক্ষে কথা বলা। ঐ সময় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ভাইস প্রেসিডেন্ট গুয়াতেমালা সফর করলেন। তিনি গুয়াতেমালার গণতন্ত্র দেখে মুগ্ধ হলেন এবং উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। তবে একটা কাজ হয়েছিল, গুয়াতেমালার সরকার যতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের লেজুড়বৃত্তি করুক না কেন- গুয়াতেমালার জনগণ কিন্তু ধীরে ধীরে মার্কিনীদের ওপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো এবং তার ফলাফল ১৯৫৫ সালে আরমাস হত্যাকাণ্ড। ক্ষমতায় এলো মার্কিন নীতি সমর্থিত ডানপন্থী অনুগত তথাকথিত নেতা মিগুয়েল ওয়াইজি গেরান্ত কুয়েন্তাস। তিনি প্রেসিডেন্ট হলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে মার্কিণ যুক্তরাষ্ট্র তাকে সর্বাত্মক সাহায্যের প্রতিশ্রুতি দিলো। অর্থাৎ থেমে গেলো গুয়াতেমালার গণতন্ত্রের চর্চা।

## লিবিয়া

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে লিবিয়া হচ্ছে উত্তর উপনিবেশ একটি অগণতান্ত্রিক দেশ। তারা ধর্মপ্রাণ মুসলমান। ১৯১১ সাল থেকে ইতালি শাসিত একটি উপনিবেশ ছিল।

১৯২০ সালে এসে লিবিয়ানরা স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ শুরু করে। এতে বহু লোক প্রাণ দেয়। ইতালীয় সেনাদের বর্বরতা আর পৈশাচিক সব ঘটনার কথা আজো বিশ্ববাসী ভোলেনি। জাতীয়তাবাদী গণতন্ত্রমনা সে সব যোদ্ধাদের সাথে যুদ্ধ চলতে থাকে। অতঃপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হলে অক্ষশক্তির দেশগুলোর আহ্বানে জাতিসংঘের সহায়তায় লিবিয়া স্বাধীন হয়। অথচ গনতন্ত্রের বাতাস তখনো বইতে শুরু করেনি বলে ক্ষমতালোভী একনায়কের খপ্পরে পড়ে লিবিয়া। সেই শক্তি ১৯৫৯ থেকে ১৯৬৯ সাল পর্যন্ত শাসন-শোষণ এবং নির্যাতন চালায়। উপায়ান্তর না দেখে এবার আসে মিলিটারি জান্ত।


www.pathagar.com

১৯৬৯ সালে তারা লিবিয়া প্রজাতন্ত্রের ঘোষণা দেয়। ক্ষমতায় আসেন সেই সেনা অভ্যুত্থানের নেতা মুয়াম্মার গাদ্দাফি। অবিসংবাদিত অপর এক নেতা হিসেবে নিজেকে উপস্থাপিত করেন। তখন থেকে আজ পর্যন্ত বহাল তবিয়তে টিকেও আছেন। উপনিবেশ-উত্তর এ দেশের জনগণ দীর্ঘদিন বিদেশি শাসনের অধীনে থাকার কারণে তারা গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কথা যেন ভুলেই গেছে। অবশ্য গণতন্ত্রের চর্চার জন্য কিংবা ওই শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করার জন্য গাদ্দাফির কোনো ধরনের প্রচেষ্টা নেই। রীতিমতো সামরিক জান্তা। তিনি ব্যতীত দ্বিতীয় কোনো দল বা নেতাকে লিবিয়ার জনগণ ভাবতেই পারে না তার একনায়ক শাসন-শোষণের কারণে। তবে তার এ যুগের অবসান একদিন হবেই, যদি তিনি জনগণের ক্ষমতা ফিরিয়ে না দেন এবং গণতন্ত্রের পথে না যান। যতই তিনি ইসলামের নাম ভাঙিয়ে চলুন না কেন। তার আজকের এই চলাটা একদিন কাল হয়ে দাঁড়াবে।

## তিউনিশিয়া

উত্তর আফ্রিকার মুসলিম দেশগুলোর মধ্যে তিউনিশিয়া তৃতীয় উত্তর উপনিবেশপুষ্ট দেশ। ফ্রান্সের অধীনস্থ তৎকালীন তিউনিশিয়ায় ফরাসি সৈন্যদের নিপীড়ন-নির্যাতনের কথা আজ বিস্মৃত প্রায়। তবে সে দেশের আকাশ-বাতাস-মাটি এমনকি রাজপ্রাসাদের আনাচে-কানাচে কান পাতলে তার ক্রন্দন ধ্বনি কানে আসে।

এরপর ১৮৯০ সালে আচমকা একদল তিউনিশ গণতন্ত্রমনা যুবক স্বাধীনতা চেয়ে বসলো। শুরু হলো আন্দোলন-সংগ্রাম। চললো ১৯২০ সাল পর্যন্ত।

১৯২০ সালে এসে তিউনেশিয়ানরা গড়ে তুললো 'দৌস্তার পার্টি'। আরবি ভাষায় যার অর্থ হচ্ছে গণতান্ত্রিক দল। অথচ তার বিপরীতে ঘটলো আরো বিপদ। ফরাসি সেনারা তাদের নেতাকর্মীদের জেলে ঢোকালো। হঠাৎ করে যেন কোনো বাতাস গায়ে লাগার কারণে তৎকালীন তথাকথিত বাদশাহও হালকা গণতন্ত্রমনা সরকারের দাবি করে বসলেন। ফল হলো উল্টো। ফরাসি সেনারা রাতারাতি সাঁজোয়া বহর আর ট্যাংক নিয়ে ঘিরে ফেললো তার রাজপ্রাসাদ। এবং তাকে তার ক্ষমতা থেকে তারা নামিয়ে দিলো।

এরপর ১৯৩৮ সালে আবার নতুন করে 'দৌস্তার পার্টি' মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। দীর্ঘদিন চললো আবার এই দলের নানা উৎপাত। পরে উপায়ান্তর না দেখে ১৯৫১ সালে ফরাসি জান্তারা প্রো-ন্যাশনালিস্ট গভর্নমেন্ট গঠনের অনুমতি দেয়। কিন্তু যখনই তারা নির্বাচনের দাবি করলো, তখনই বেছে বেছে দলের সেরা সেরা নেতাকর্মীদের গ্রেফতার করা হয়।



www.pathagar.com

শেষমেষ ১৯৪৬ সালে উপায়ান্তর না দেখে ফরাসিরা তিউনিশিয়ার স্বাধীনতা ঘোষণা করে। এই দেশটির জনগণের তখন গণতন্ত্র, গণতান্ত্রিক সুশীল সমাজ, গণতান্ত্রিক সরকার– এসব সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান ছিল না। তারা যেন ভুলতেই পারছিল না ঔপনিবেশিক শাসকদের স্মৃতি। তাই মাত্র অর্ধ শতাব্দী পার হতে না হতেই বিপন্ন হলো গণতন্ত্র। এককথায় বলা যায় তারা মুক্ত নয়। পরাধীনতার বেড়াবালে বন্দি এক জাতি।

## মরক্কো

আফ্রিকায় মরক্কোবাসীরা সম্ভবত সবচেয়ে বেশি নিপীড়িত এবং নির্যাতিত জাতি। এখানে স্প্যানিশ এবং ফরাসি শক্তির উপনিবেশ ছিল দীর্ঘকাল। তাই তারা মনে হয় গণতন্ত্রের পথে পা বাড়াচ্ছে না। পা বাড়ালেই নিপীড়ন-নির্যাতন। তবু সাম্প্রতিককালে বেশ কয়েকবার গণতন্ত্রের পথে পা বাড়ানোর জন্য আন্দোলন গড়ে ওঠে এবং সেসব আন্দোলনকে কৌশলে বা নিপীড়ন-নির্যাতনের মাধ্যমে দমন করা হয়। এতে মদদ জোগান স্বয়ং সে দেশের রাজা। আন্দোলন দানা বেঁধে উঠলে রাজা জনগণের সামনে গণতন্ত্রের নয়, দেশের অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা ঘোষণা দিলেন এবং আরো জানালেন যে, এই মুহূর্তে মরক্কোর গণতান্ত্রিক পদ্ধতি বা রাজনৈতিক উন্নয়নের চেয়ে অর্থনৈতিক মুক্তিটাই বড় কথা। তাই আসুন আমরা অর্থনীতির উন্নতি ঘটাই এবং এই মতে রাজি একদল নেতা নিয়ে সংসদ গড়ে সেখানে তিনি বিপদগ্রস্ত অর্থনীতির কথা বললেন। পার্লামেন্ট বললো রাজনীতির কথা। তারপর সব শেষ। এরপর পার্লামেন্টসহ রাষ্ট্রপ্রধান এবং নেতাদের সব ক্ষমতা কেড়ে নেয়া হয় রাজার মদদেই। এরপর সাজানো নাটকে এক নির্বাচন সম্প্রতি ২০০৭ সালে অনুষ্ঠিত হয়। অবশ্য রাজা বহালতবিয়তে রাষ্ট্রের সব ক্ষমতা হাতে রেখে আজো বসে আছেন। অর্থাৎ মরক্কোতেও গণতন্ত্রের কবর রচনা করা হয়েছে। ইসলামী জীবনধারায় অত্যন্ত জনগণকে বন্দি বলা চলে।

## মিশর

মিশর যদিও উত্তর আফ্রিকার একটি দেশ, তবু এর চালচলন ও গতিবিধি একদম অন্যরকম। মিশরীয়রা প্রাচীন আমল থেকেই তাদের নিজস্ব সত্তাকে ধরে রাখতে জানে। আরব বিশ্বের সবচেয়ে বৃহৎ এ দেশের শিক্ষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি জগদ্বিখ্যাত। মিশর ইরানের মতোই উপনিবেশ শাসনের অত্যাচার-অনাচার সহ্য করা এক অভিজ্ঞ জাতি। ১৮৬৬ সালের শেষ থেকে মিশরে মোটামুটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার বাতাস বইতে থাকে। এতে যুক্তরাজ্য সাহায্য করতে


www.pathagar.com

থাকে। অবশ্য এ সাহায্য সত্যিকার অর্থে জনগণের অংশগ্রহণে অর্জিত জনগণের কল্যাণের জন্য অর্জন গণতন্ত্র ছিল না। এখানে গণতন্ত্রের নামে রাজা ফারুক নিপীড়ন-নির্যতন চালাতেন। রাজা ফারুক ছিলেন ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য হাসিল করার জন্য মিশরের মসনদে বসানো স্বার্থপর, লোভী এক দুষ্ট ক্রীড়নক। অর্থাৎ ব্রিটিশদের গণতন্ত্র আনয়নের উৎসাহের বিরুদ্ধে তারাই ছিল প্রধান শত্রু এবং তাদের প্রতিনিধি ছিলেন রাজা ফারুক। ঠিক যেভাবে মার্কিনীদের ক্রীড়নক প্রতিনিধি ছিলেন রেজা শাহ্ পাহলভি ইরানে। গণতন্ত্রের নামে ইসলামকে সামনে রেখে এরা নির্যাতন-জুলুম চালিয়েছেন বছরের পর বছর।

রাজা ফারুকের পতনের পর মিশরে ঠিক বিধিসম্মতভাবে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে কায়েম করে তাদের সবচেয়ে জনপ্রিয় এবং জনগণের রায়ে ক্ষমতাসীন ওয়াফদ পার্টি যার নেতা ছিলেন অবিসংবাদিত পুরুষ, সাআদ জগলুল পাশা এবং তার পরে আসেন মুস্তাফা-আন-নাহাস পাশা। এখানে উল্লেখ্য, মিশরের তৎকালীন গণতন্ত্রের চর্চা এবং শাসন ব্যবস্থাঃ এতই সুসংগঠিত ছিল যে, দেশের দ্রুত উন্নয়নের ফলে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সমগ্র বিশ্বে এক ধরনের প্রভাব বিস্তার করতে সমর্থ হয়েছিল।

কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন দমলো না। কেননা ধনে, মানে, সম্পদে সমৃদ্ধ আফ্রিকাকে কে হাতছাড়া করবে? তাদের মমদে চলা পরাজিত কিছু মিশরীয় স্বার্থপর একনায়ক প্রতিনিধি নানা ছলছুতোয় ওয়াফদ পার্টিকে জ্বালাতন করতে লাগলো। তাতে মদদ জোগাতো রাজার এবং পরাজিত একনায়ক শাসনকর্তাদের লোকজন।

এখানে একটি কথা উল্লেখ না করলে চলে না যে, মুসলমান অধ্যুষিত আফ্রিকান এই দেশটির ইতিহাসের সঙ্গে মধ্যপ্রাচ্য, আরব বিশ্ব এবং মুসলিম বিশ্বের কোনো দেশের সঙ্গেই কোনো মিল আগেও ছিল না, আজো নেই। যদিও তারা আরব বিশ্বের সংস্কৃতির ধারক ও বাহক। শুধু তাই নয়, গণতন্ত্র চর্চায় নিবেদিতপ্রাণ এই দেশ এবং তার জনগণ। এটা সর্বজনবিদিত যে, আরব ও মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্রসহ যে কোনো রাজনৈতিক তৎপরতার জন্য মধ্যপ্রাচ্যের মুসলমান দেশগুলোতে মিশরীয় নেতাদের অনেক অবদান আছে। সেই অবদানের প্রবক্তা ওয়াফদ পার্টি। গণতন্ত্রের কথা বলার দেশ গ্রেট ব্রিটেন ওয়াফদ পার্টির এই দ্রুত উঠে আসাটা ভালো চোখে দেখলো না। তাই ওই দল গণতন্ত্র এবং দেশের উন্নতিটা ঠিক সেভাবে করতে পাররেলা না। এবং বলা যায় এটা ছিল মিশরে গণতন্ত্র চর্চার প্রাথমিক সময়ের এক দীর্ঘ কালো ইতিহাসের কলঙ্কময় অধ্যায়।


www.pathagar.com

যখন আরব বিশ্ব মিশরকে দেখে আড়মোড়া ভেঙে উঠবে ঠিক তখনই ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ওয়াশিংটন তেলেবেগুনে জ্বলে উঠতে লাগলো। শুরু হলো তাদের প্রতিনিধিদের আজ প্যারিস, কাল লন্ডন, পরদিন ওয়াশিংটন গোপন মিটিংয়ে বসে ষড়যন্ত্র আঁটার।

ব্রিটিশরা চিরকাল এক ধুরন্ধর কুটিল জাতি। তারা নতুন ফন্দি আঁটলো। সেই ফন্দির সার্থক ফসল জগদ্বিখ্যাত সুয়েজ খাল। সারা বিশ্বের ব্যবসা-বাণিজ্য এবং পরিবহন সুবিধায় এই খালটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তাই মিশর সরকার নিরপেক্ষ থেকে বিষয়টি পরখ করতে থাকলো, দেখা যাক বিশ্ব জনমত কোন দিকে যায়। বিশ্ব জনমত ফ্রান্স এবং ব্রিটেনের পাল্লাকেই ভারী করলো। ফলে ফ্রান্স ও ব্রিটেনের হাতে অর্ধেকের বেশি অংশ রেখে মাত্র ৪৪ শতাংশ শেয়ার ছেড়ে দিলো মিশরকে।

১৮৭৫ সালে মিশর অর্থনৈতিক দৈন্যে পড়ে সেই ৪৪ শতাংশও বেচতে বাধ্য হয় এবং তার মালিক হয় ফ্রান্স ও ব্রিটেন। ওই সময় মিশরের ক্ষমতায় ছিলেন খাদিভি ইসমাইল। অদূরদর্শী ইসমাইল ফ্রান্স ও ব্রিটেনকে অর্থনৈতিক সাহায্য-সহযোগিতা এবং দেশে বিরাজমান আইন-শৃঙ্খলার অবনতি ঠেকানোর জন্য সরকারি বিভিন্ন মন্ত্রণালয়ে তাদের কর্তৃত্বের অধিকার দেন। চতুর ফ্রান্স ও ব্রিটেন সরকার সুকৌশলে তারা ব্যবসা-বাণিজ্য ও নিরাপত্তা এবং প্রতিরক্ষার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মন্ত্রণালয় ধীরে ধীরে গ্রাস করে ফেললো।

সুয়েজ খালকে সামান্য কিছু ভেবে মিশর সরকার যে ভুল করেছিল তার উল্টো পিঠে ছিল ফ্রান্স ও ব্রিটেনের এক বিশাল ও গভীর গোপন ষড়যন্ত্র। যে ষড়যন্ত্রের উপলক্ষ্য ছিল তৎকালীন ভারত– ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মাথার মুকুট বলে যার জগৎজোড়া খ্যাতি ছিল। ভারত উপমহাদেশ তখন ধন, সম্পদ, প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এক বিশাল রত্নভাণ্ডার। সেখানকার রাজনীতি, অর্থনীতি, নিরাপত্তা, প্রতিরক্ষাকে দখলে রাখতে হলে প্রয়োজন ভারতে যাতায়াতের সোজা পথ। সুয়েজ খাল সেই পথের অতি উত্তম সংযোগ খাল। সুতরাং এর রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, প্রতিরক্ষার দায়িত্ব ব্রিটেনের দখলে থাকার দরকার। তাই মিশরের গণতন্ত্রকে বিপন্ন করার সঙ্গে সঙ্গে সুয়েজ খালের শতভাগ কর্তৃত্ব ব্রিটেনের হাতে চলে গেল। মুখথুবড়ে পড়লো মিশরের গণতন্ত্র চর্চা। সুয়েজ খালকে নিরাপত্তাদানের নামে শুরু হলো ব্রিটেনের একাধিপত্য মালিকানা।

১৮৭৯ সালের দিকে কর্নেল আহমদ উরাবি নামের এক অত্যন্ত জনপ্রিয় সেনানায়ক কিছু ভূস্বামী সঙ্গে নিয়ে ব্রিটিশ শাসকদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করলেন। এতে তেতে উঠলো ফ্রান্স ও ব্রিটেনের জান্তা শাসকরা।


www.pathagar.com

চরমভাবে বিগড়ে যাওয়া ফ্রান্স ও ব্রিটেন জোর করে খাদিভিকে ক্ষমতাচ্যুত করে তার জায়গায় ক্ষমতায় বসালো তার ছেলে খাদিভি তওফিককে। কিন্তু তওফিক সাধারণ মানুষের কাছে জনপ্রিয় হতে পারলেন না। এমনকি দেশ পরিচালনায় ব্যর্থ হলেন। অবশেষে কোনো উপায়ান্তর না দেখে তার শাসনকার্য পরিচালনার জন্য মুস্তাফা রিয়াদ নামে একজনকে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিলেন। রিয়াদ অতিসত্ত্বর পার্লামেন্ট ভেঙে দিলেন।

এভাবে মিশরের রাজনীতিতে ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রণের নানা অজুহাত চলতে থাকে নতুন শতাব্দী পর্যন্ত।

১৯১৩ সালে একটি অনির্বাচিত সংসদ নির্বাচিত সংসদকে বিতাড়িত করে। এরপর যখন প্রথম বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয় তখন জার্মানশাসিত অটোমান শক্তি ব্রিটেনের মদদে মিশরকে ব্রিটেনের অধীন একটি উপনিবেশ হিসেবে ঘোষণা করে এবং পরবর্তী সময়ে একাধিক পুতুল সরকার তারা ক্ষমতায় বসায় এবং বিতাড়িত করে।

১৯১৮ সালে বলা যায় হঠাৎ করেই সাআদ জগলুল বলে একজন আইনজ্ঞ ব্রিটেনকে মিশরকে স্বাধীনতা তথা গণতন্ত্র এবং ইসলামিক জীবনযাপনকে ফিরিয়ে দেয়ার জন্য আহ্বান জানালেন। কিন্তু তার সে আহ্বানে ব্রিটিশরা সাড়া দিলো না। ফলে তিনি জাতীয়তাবাদী চিন্তা-চেতনায় গর্বিত ওয়াফদ নামে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করলেন। অল্পদিনের মধ্যে তিনি বিশ্ব জনমত গড়ে তুললেন। কিন্তু ফল হলো উল্টো। মহাপরাক্রমশালী ব্রিটিশ সরকার জগলুলকে নির্বাসিত করলো। অতঃপর চালালো চরম নির্যাতন। কিন্তু এবার যেন ব্রিটিশ শাসকগোষ্ঠী আর পেরে উঠছে না। মিশরীয় জাতীয়তাবাদী এই দল দিনে দিনে নানা আইন ভাঙচুর করে রাস্তায় নেমে এলো। মিশরের মাটিতে শুরু হলো গণতন্ত্র অর্জনের এক মহাবিপ্লব। এবার জনগণের এমন আন্দোলনের স্বরূপ দেখে ব্রিটিশ সরকার সিদ্ধান্ত নিলো যে, মিশরের স্বাধীনতা এবার তারা ঘোষণা করে দেবে। তবু সুচতুর ব্রিটিশ শাসকরা চারটি বিষয় হাতে রাখতে চাইলো। যেমন– সুয়োজ খালের কর্তৃত্ব, মিশরের নিরাপত্তা প্রদান, সরকার কেমন হবে এবং কি করছে বা করবে বা না করবে তার জবাব দেয়া এবং যাতায়াত ব্যবস্থায় কর্তৃত্ব করা। জনগণ তা মেনে নিল না। তারা গণতন্ত্র চায়। তারা চায় গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানোর জন্য অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন।

অতঃপর ব্রিটিশদের নিয়োগপ্রাপ্ত নতুন রাজা ফাহদ মিশরকে সংসদীয় রাজতন্ত্রের দেশ বলে ঘোষণা করলেন এবং সংসদ ভেঙে দেয়ার মতো মস্তবড় ক্ষমতাটি হাতে রেখে তিনি ১৯২৪ সালে নির্বাচন দিয়ে দিলেন। তবে সঙ্গে সঙ্গে এটাও বললেন যে, মিশর হবে একটি ধর্মনিরপেক্ষ, গণতান্ত্রিক সংসদ


www.pathagar.com

পরিচালিত, একটি জাতীয়তাবাদী চেতনার দেশ। মিশরীয়দের সেই নির্বাচনের ফল পৃথিবীতে আজো বিস্ময়কর।

১৯২৪ সালের সেই নির্বাচনে পপুলিস্ট ওয়াফদ পার্টির নেতা জগলুল ২১৪ আসনের মধ্যে মোট ১৯৫ আসন জিতে নিলেন। কিন্তু অত্যন্ত রহস্যের ব্যাপার, এই সময় ব্রিটিশ গভর্নর জেনারেল খুন হলেন। এ জন্য অহেতুক এক খোঁড়া কারণ দেখিয়ে ব্রিটিশ সরকার রাজা ফাহদকে সংসদ ভেঙে দিতে বললেন। অব্যবহতি পরে আবার নির্বাচন হলো। তাতে আবার ওয়াফদ পার্টি জয়লাভ করলো নিরঙ্কুশভাবে। যদিও সে নির্বাচন বানচাল করার জন্য রাজা নিযুক্ত প্রতিনিধির মাধ্যমে ব্রিটিশ সরকার অনেক ধরনের চেষ্টা চালায়। এমন চেষ্টা আরো বেশ কযেকবার তারা চালালো; কিন্তু ওয়াফদ পার্টির জয়কে তারা ছিনিয়ে নিতে পারলো না।

১৯২৮ সালে আবার ব্রিটিশ সরকার ওয়াফদ পার্টিকে সরানোর জন্য মহানির্বাচনের আয়োজন করলো। তাতে কোনো লাভ হলো না। ওই ওয়াফদ পার্টিই আবার জয়লাভ করলো। মাত্র তিন মাস যেতে না যেতেই আবার ব্রিটিশ সরকারের অনুরোধে রাজা সংসদ ভেঙে দিলেন।

১৯৩০ ও ১৯৩৬ পরপর দুবারের নির্বাচনেই ওয়াফদ পার্টি বিপুলভাবে জয়লাভ করলো। ১৯৩৭ সালে রাজার সঙ্গে এক গোপন ষড়যন্ত্র করে ব্রিটিশ সরকার এমন এক নিয়ন্ত্রনাধীন কঠোর নির্বাচন করলো যাতে চরম প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও এবার ওয়াফদ পার্টি পরাজয় বরণ করলো। এর ফলে দিন দিন জনসমর্থন হারাতে লাগলো সেই পুতুল সরকার। এমনকি সরকারি কোনো কাজও তারা ঠিক মতো করতে পারতো না। অতঃপর সাত বছর পর আবার নির্বাচনে ওয়াফদ পার্টি জয়লাভ করলো। কিন্তু মিশরের জনগণের চিরকালের শত্রু, স্বার্থপর, ব্রিটিশ সরকারের দালাল রাজবংশের তৎকালীন রাজা ফারুককে সে সংসদ ভেঙে দিলেন। এটা ছিল বিশ্বাসীর শাসনে নির্বাচন নিয়ে ঘটে যাওয়া সর্বকালের সেরা প্রহসনের নাম। সেখানে বিশ্ববাসীসহ মিশরীয়রা অসহায় দর্শক মাত্র।

১৯৮১ সালে আনোয়ার সাদাত নিহত হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারক ক্ষমতায় আসেন। তিনি এসেই ১৯৬৭ সাল থেকে বলবৎকৃত জরুরি আইন তুলে নেন। এবং মনে হলো নতুন প্রেসিডেন্ট বোধহয় একটু পরিবর্তনশীল ভাবধারার। তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতাসহ রাজনৈতিক সব বন্দি নেতাকর্মীকে মুক্ত করে দিলেন। এমনকি তার বিরোধীদলীয় অসংখ্য নেতাকর্মীকে তিনি তার দলে জায়গা দিলেন। কিন্তু এই উন্নত ও প্রগতিশীল



www.pathagar.com

ধ্যানধারণা অল্পদিনের মধ্যেই বাধাপ্রাপ্ত হলো। মুসলিম ব্রাদারহুড নামধারী এক উগ্র মুসলমানদের মৌলবাদীগোষ্ঠী মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। সঙ্গে সঙ্গে তিনি সংবাদপত্রের স্বাধীনতা কেড়ে নিলেন এবং বিরোধী নেতাদের গ্রেফতার করলেন।

২০০০ সালের নির্বাচনে মুবারক ভোট কারচুপির যত রকম পন্থা আছে সব পন্থা অবলম্বন করে ক্ষমতায় আসে তার দল এনডিপি। ২০০৫ সালেও মুবারক আবার নির্বাচিত হন। একেবারে সাম্প্রতিককালে মুবারক জরুরি আইন তুলে নেন।

তারপরও দুঃখজনক হলেও অত্যন্ত সত্য যে, মিশরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের এত দীর্ঘ নিপীড়ন-নির্যাতন আর দুঃখের ইতিহাস পৃথিবীর কোনো জাতির মধ্যে নেই।

## ইরাক

আধুনিক বিশ্ব রাজনীতিতে ইরাক নিয়ে পশ্চিমা বিশ্ব তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র যতই ধ্বংসযজ্ঞ চালিয়ে এ দেশকে বিরানভূমি করুক না কেন, রাজনীতির ফলাফলে তারা একেবারে পরাজিত। শুধু তাই নয়, তাদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে পুতুল সরকার তারা ইরাকে বসিয়েছে, সে সরকারও না-পেরেছে সেখানে তাদের মনের মতো গণতন্ত্র আনতে, না-পেরেছে ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কায়েম করতে। তারপরও সারাবিশ্বে ইরাক একটি শিয়া অধ্যুষিত মুসলিম দেশ বলেই পরিচিত। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের কাছ থেকে ইরাককে ব্রিটেন পুরস্কার হিসেবে পায়। কিন্তু সেখানে ভারতীয়দের সামাজিক আধিপত্য দেখে ব্রিটিশ সরকার সেখানে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থাসহ শাসক নিযুক্ত করলো। কোনো লাভ হলো না তাতে। তারা ব্যর্থ হলেন। এ কি অন্য কোনো জাতি? খোদ ইরাক, জগদ্বিখ্যাত এক যোদ্ধা জাতি। তার প্রমাণ তাদের প্রাচীন ইতিহাস। উপায়ান্তর না দেখে ১৯২২ সালে ব্রিটেন রাজা হাসমেতিকে সেখানকার শাসক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। সুবিধাটা হলো এই যে, তিনি সুন্নি ছিলেন। কিন্তু ইরাক ছিল রীতিমতো শিয়াদের দেশ। ফলে স্থানীয় জনগণ হাসমেতিসহ তার পরিবারকে বিদেশি ভেবে মেনে নিতে পারলো না। কেননা এটা সত্য যে, রাজা হাসমেতি ভিনদেশি ছিলেন। তারা আরব বিশ্বের মানুষ, ইরাকের নন। এই ইতিহাসের জের ধরে এই ২০০৩ সালেও ব্রিটিশ ও মার্কিন বাহিনী শিয়া-সুন্নিদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধিয়ে দিয়ে সেখানে প্রবেশের পথ সুগম করে। এখানে একটি কথা না বললেই নয়, ইরাকে শিয়া-সুন্নির এই বিভাজন এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাত ৭০০ বছরের পুরনো ঘটনা।


www.pathagar.com

১৯২৫ সালে এসে ব্রিটিশ সরকার আবার নতুন ধরনের এক কূটচাল চাললো। তারা একতরফা তেল ক্রয়ের এক চুক্তি করলো। সেই চুক্তি অনুযায়ী ব্রিটিশ সরকার তুরস্কের মাধ্যমে ইরাক থেকে তেল ক্রয় শুরু করলো। যার অর্ধেক তুরস্ক সরকারের এবং বাকি অর্ধেকের মালিক ইঙ্গো-মার্কিন আসিয়ান তেল কোম্পানি। তখন নামকাওয়াস্তে দেশে পার্লামেন্ট ছির, সেই পার্লামেন্টের শাসক ব্রিটেন কর্তৃক নিযুক্ত একজন রাজা এবং যে রাজাকে পরিচালনা করতো ব্রিটিশ শক্তি। হঠাৎ করেই পরিকল্পিত নির্বাচনে নির্বাচিত পার্লামেন্টকে রাজা ভেঙে দিয়ে নতুন নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানালেন। এই রক্তাক্ত অধ্যায়ের নির্বাচনে সহস্যাধিক মানুষ অংশ নিয়েছিলেন। ইরাকিদের বিজয় দেখে অর্থাৎ মধ্যপ্রাচ্যের তেলসমৃদ্ধ আর একটি দেশে গণতন্ত্র আসবে– এ যেন ব্রিটিশদের আর সইলো না। তারা ন্যায্য অধিকার দিলো না। অজুহাত দেখালো, ইরাকের সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক অবস্থা এতটাই খারাপ যে, এই নৈরাজ্যকর পরিস্থিতিতে দেশের শাসন ব্যবস্থা মোটেই ছেড়ে দেয়া যায় না। অজুহাত দেখিয়ে ক্ষমতা ছেড়ে না দেয়ার ফল হলো উল্টো। ইরাকের জনগণ এবার রাস্তায় নেমে এলো গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার জন্য। অসংখ্য মানুষের মৃত্যু সেনা অভ্যুত্থানের পর যখন ইরাক মোটামুটি শান্ত, তখন ক্ষমতায় সাদ্দাম হোসেন এবং তার দল 'বাথ পার্টি'। ব্রিটিশ শাসন পরাস্ত হলো। ফিরে গেল ব্যারাকে। কিন্তু আগের মতো ফণা ধরেই রাখলো ইরাকের ওপর। কিন্তু মন্দ ভাগ্যের জাতি ইরাকি জনগণ।

১৯৭৯ সালের প্রথমদিকে অফিসিয়ালি তিনি নিজেকে ইরাকের প্রেসিডেন্ট হিসেবে জাহির করলেন। এবার ইরাকের গণতন্ত্র খোদ একজন ভয়ঙ্কর ইরাকির হাতেই চিরকালের মতো ধ্বংস হলো।

আবার শুরু হলো ব্রিটেন এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাদ্দামের পাশে ভেড়ার জন্য নতুন পথ। এর মধ্যে মার্কিনীদের অর্থ, সমরাস্ত্র এবং রাজনৈতিক সমর্থনে ১৯৯০ এবং ২০০৩-এর ইরাকের যুদ্ধ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। বিশেষ করে ১৯৮০ থেকে ১৯৮৮ পর্যন্ত ইরানের বিরুদ্ধে ইরাকের যুদ্ধ বিশ্বব্যাপী সবার জানা।

একনায়ক এবং দাম্ভিক লৌহমানব সাদ্দাম তখন মার্কিনীদের বন্ধু। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বন্ধুত্বের ছলনায় ক্ষতি করার জন্য সুযোগ খুঁজতে লাগলো। সাদ্দাম এই সুযোগে মার্কিনী অর্থে ইরাককে গড়ে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে তার ব্যক্তিস্বার্থ সিদ্ধির জন্য সীমান্ত প্রদেশ কুর্দি এবং শিয়াদের ওপর চরম নির্যাতন চালালেন। পশ্চাতে ছিল ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনীর ইন্ধন। কিন্তু বিশ্ববাসীকে সেই ব্রিটিশ-


www.pathagar.com

মার্কিনীরাই সাদ্দাম যে একনায়ক এবং লৌহমানব তা প্রমাণ করার জন্য গোপনে সাদ্দামের বিরুদ্ধে অপপ্রচার চালাতে লাগলো। সাদ্দাম তখন রীতিমতো ফ্রাঙ্কেনস্টাইন।

ব্রিটেন ও মার্কিন শাসকরা হঠাৎ করেই সাদ্দাম হোসেনের ওপর নাখোশ হলো না। আগে থেকেই গোপন নাখোশের ব্যাপার এবার প্রকাশ্যে দেখা দিলো। গণতন্ত্র তো উঠেই গেল। মার্কিন ও ব্রিটেনের শাসকদের শুরু হলো সাদ্দামকে হত্যা বা ক্ষমতাচ্যুত করার এক নতুন পাঁয়তারা। ২৪ বছর পর তারা সার্থক হলো। এলো ইরাকের শাসনতন্ত্রে নতুন পুতুল সরকার। সাদ্দাম মৃত্যুবরণ করলেন। ইরাক সেই অগণতান্ত্রিক ব্রিটেন-মার্কিন বাহিনীর পদানত এক দেশ হিসেবে থেকে গেল। বিপন্ন গণতন্ত্র। মূল্যহীন আজ ইসলামী মূল্যবোধ।

## আফগানিস্তান

বিংশ শতাব্দীর শুরু এবং শেষের দিকে আফগানিস্তান হয়ে উঠেছিল এক নরককুণ্ড। একদিকে গণতন্ত্রের নামে ধ্বজাধারী পশ্চিমা বিশ্বের স্বার্থের কালো থাবা অন্যদিকে সমাজতন্ত্রের মতবাদ ছড়ানো প্রবল পরাক্রমশালী সোভিয়েত ইউনিয়ন– এদের দুজনের বিরুদ্ধে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে তখন পশ্চিমা বিশ্বের একমাত্র শত্রু ইসলামী চরমপন্থী দলগুলো। বস্তুত এ কারণেই আফগানিস্তানের মাটিতে দু-দুটো যুদ্ধ সংঘটিত হয়। আফগানিস্তানের বালুময় তপ্ত মাটি রক্তে ভিজে যায়। তখন যুদ্ধ ছিল সোভিয়েত বাহিনীর বিরুদ্ধে ইসলামিক চরমপন্থী দলগুলোর। এই যুদ্ধকে তারা এক ধরনের জিহাদ বলে ঘোষণা করলো। সুযোগ বুঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তখন সমরাস্ত্র এবং অর্থ– সবকিছু দিয়ে তাদের সাহায্য করলো। সোভিয়েত ইউনিয়ন এই যুদ্ধকে সভ্য সমাজের বিরুদ্ধে এক মারাত্মক হুমকি বলে অভিহিত করলো এবং সেই সুযোগে নিজেদের উদ্দেশ্য সাধনের জন্য মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থার সঙ্গে হাতে হাত মিলিয়ে পাকিস্তান সোভিযেত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের রাজনীতিতে মাথা ঘামাতে শুরু করলো। একবিংশ শতাব্দীর শুরুতেই ইসলামী চরমপন্থী মুজাহিদিনরাও উদ্বুদ্ধ হলো যে– হ্যাঁ, তারাও পৃথিবীর অন্য এক সুপার পাওয়ারের সঙ্গে যুদ্ধ করছে এবং তাদের পাশে আছে পাকিস্তান এবং অন্য সুপার পাওয়ার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র।

এর মধ্যেই ১৯৭৯ সালের বড়দিনের রাতে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তানকে আক্রমণ করে। কিন্তু প্রেসিডেন্ট মোহাম্মদ নজিবুল্লাহর অযোগ্যতা ও অজনপ্রিয়তার ফলে আফগানিস্তানের সাধারণ জনগণ দলে দলে


www.pathagar.com

বিভক্ত হয়ে পড়লো এবং যুদ্ধ শুরু করলো। আফগান যোদ্ধারা ঝাঁপিয়ে পড়লো তাদের অস্তিত্ব, বৈশিষ্ট্য এবং ধর্ম রক্ষার জন্য। তারা এক ইঞ্চি মাটি কোনো ভিনদেশি শক্তির পদতলে যেতে দেবে না– এই ছিল তাদের প্রধান পণ।

তবুও তারা এক হতে পারলো না। কেননা একেক ইসলামী চরমপন্থী দলের ইসলামী বোধ একেক রকম। ফলে তারা বিভিন্ন দলে বিভক্ত থাকার কারণে সোভিয়েত বাহিনীর কিছুটা সুবিধা হলেও মার্কিনীরা যতই সমর্থন করুন না কেন তারা তাদের মেনে নিতে পারলো না। ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মদদে পশ্চিমা বিশ্ব আফগান যোদ্ধাদের সম্পর্কে আজেবাজে কথা বলতে লাগলো। গড়ে উঠলো বীর মুজাহিদিনদের বিপক্ষে পশ্চিমা জনমত।

ধীরে ধীরে মুজাহিদিনরা সংগঠিত হলো এবং সারাবিশ্বে চরমপন্থী বলে বিবেচিত হয়। এই সংগঠিত দলের নাম হলো ইসলামিক দল, হেজব-ই-ইসলামী গুলবুদ্দিন। এই দলটি গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার নামের এক আধ্যাত্মিক নেতার দ্বারা পরিচালিত হতো। অল্পদিনের মধ্যেই তার বর্বরোচিত পৈশাচিক কর্মকাণ্ডের কথা ফাঁস হয়ে গেল। তিনি কিন্তু ইসলামের নানাবিধ বিষয়ের ওপর জানাশোনা অগাধ জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন।

তার বক্তৃতা ক্ষমতা ছিল অসাধারণ। শুধু তাই নয়, তিনি ধীরে ধীরে ধর্মান্ধ যোদ্ধাদের বিরুদ্ধে এক ত্রাস রূপে দাঁড়িয়ে গেলেন। সোভিয়েত যুদ্ধবন্দিদের বিরুদ্ধে চললো বর্বরোচিত লোমহর্ষক ঘটনা। তাকে সারাবিশ্ব উগ্র মৌলবাদী রূপে অভিহিত করে। কেননা তিনি পশ্চিমাদের ঘোরবিরোধী ছিলেন। তবু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পাকিস্তান তাকে সোনার ছেলে বলে অভিহিত করে হেকমতিয়ার বাহিনীর প্রশিক্ষণ, আশ্রয় এবং অর্থের ব্যবস্থা করে দেয়। অল্পকালের মধ্যে আধুনিক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হলে গোপনে তালেবান এবং আল-কায়েদা গ্রুপের সঙ্গে গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ারের এক গোপন আঁতাত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিমা বিশ্ব তাদের শক্তির ভাব বুঝতে পেরে এ তিন প্রধান দলকে মানবজাতির হুমকি দল বলে অভিহিত করলো।

এর ঠিক পরের স্তরেই ছিল বুরহান উদ্দীন রাব্বানীর জামায়াত-ই-ইসলামীর দল। এই দল ছিল সামরিক সজ্জায় সজ্জিত। যদিও বাইরে থেকে দেখে মনে হতো এটি একটি মৌলবাদীদের দল, তাহলে ভুল হবে। এদের মধ্যে তুরস্ক ও উজবেকদের নানা ধরনের বিষয় মিশ্রিত ছিল। চরমভাবে মার্কিনী বা পশ্চিমাদের বিরোধী মনোভাবাপন্ন এই দলের পশ্চিমাদের অনেক ভালো গুণ তাদের মধ্যে ছিল। এরপর তৃতীয় ইসলামী মৌলবাদী দল ছিল ইউনিয়ন ফর দ্য লিবারেশন অব আফগানিস্তান, ইত্তেহাদ-ই-ইসলামী। এই দলের প্রধান


www.pathagar.com

ছিলেন আব্দুল রসুল সায়াফ। ১৯৮২ সালে এই গ্রূপের জন্ম হয়। গতানুগতিক ধারার ইসলামী দল বলে সৌদি আরব এবং পারস্য উপসাগরের দেশগুলো তাদের সমর্থন জানালো। এ ছাড়া আরো একটি মুজাহিদিন দল ছিল, যারা হেজব-ই-ইসলামী খালিয়াস নামে পরিচিত ছিল। এই দলের প্রধান ছিলেন মৌলভি মোহাম্মদ ইউনুস খালিয়াস। যারা মধ্যযুগের ইসলামী জীবনধারাকে অনুধারণ করতো। সত্য কথা বলতে কি, এই দলই সমরসজ্জায় সজ্জিত ছিল এবং সরাসরি সোভিয়েত বাহিনীর সামনাসামনি যুদ্ধ করতো।

## কমোরস

বর্তমান বিশ্বের একেবারে অপরিচিত বলতে গেলে একটি ছোট্ট দ্বীপ। অথচ এই দেশটি পশ্চিমাদের গণতন্ত্র বিরোধী, সামরিক জান্তা প্রতিপালনের একটি উত্তম উদাহরণ। নয়নাভিরাম দৃশ্যের এই দ্বীপে খনিজ তেল এবং সামুদ্রিক মৎস্য, বৃক্ষ ও পাথরে ভরপুর।

১৮৮৬ সালে দ্বীপটি ফরাসীদের পদানত হয়। সেখানে তারা কলোনী তৈরি করে। তারপর প্রায় একশো বছর নিপীড়ন নির্যাতন। ছোট্ট সেই দ্বীপের মানুষ লোক দেখানো স্বাধীনতা পায় ১৯৭৫ সালে এবং তখন দেশটি সমাজতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার দিকে ঝুঁকে পড়ে। ধর্ম নিরপেক্ষতা, শোষণহীন শ্রেণীহীন সমাজ ব্যবস্থা গড়ে ওঠার সময়েই হোঁচট খায়। পুনরায় ফরাসি সৈন্যদের সমর্থনে অভ্যুত্থান ঘটে। ফরাসি সৈন্যরা গদি দখল করে তাদের মনোনীত ব্যক্তিকে ক্ষমতায় বসিয়ে একদলীয় শাসন ব্যবস্থা চালু করে। বর্তমান প্রজন্ম সেই শাসন ব্যবস্থার অধীনে শাসিত হচ্ছে।

## লেবানন

মধ্যপ্রাচ্যে লেবানন একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ দেশ। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় দেশটি ফরাসিদের হাতে চলে আসে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ফরাসি বাহিনী তাদের স্বাধীনতার জন্য মত প্রকাশ করে। কিন্তু তাতে কোনো ফল হয়নি, তারা স্বাধীনতা পেয়ে যায়। তারপর পশ্চিমাদের যে স্বভাব, তা উন্মোচিত হতে থাকে।

১৯৪৩ সালে লেবাননে নির্বাচন হয়। সেই নির্বাচনে নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার প্রধানকে ফরাসিরা গ্রেফতার করে। অতঃপর ১৯৪৬ সালে তাদের ব্যবস্থাপনায় এবং ইচ্ছানুসারে লেবাননকে পুনরায় স্বাধীনতা দেয়া হয়। কিন্তু তখন থেকে লেবাননের শাসন ব্যবস্থা চলতে থাকে পশ্চিমাদের ইচ্ছানুসারে। অর্থাৎ বন্দী অবস্থায় মুক্ত পাখির মতো অবস্থা আর কি! উড়তে পারে চলতে


www.pathagar.com

পারি, খেতে পারে, কিন্তু নির্দিষ্ট গন্ডির ভেতরে। নামকা ওয়াস্তে একজন পুতুল সরকার বসিয়ে শাসন ব্যবস্থা তারা চালাতে লাগলো। ধীরে ধীরে লেবানিজরা যখন বেশ গণতন্ত্রমনা স্বাধীনচেতা স্বয়ং স্বাধীনতার দিকে যেতে থাকে অমনি পশ্চিমারা লেবাননকে নিয়ে ভাবতে শুরু করে। কেননা সম্পূর্ণ স্বাধীনতা এবং গণতন্ত্র কায়েমের জন্য ততদিনে সিরিয়ার সমর্থন শুরু হয়– অন্যদিকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ফরাসিদের মহাশত্রু হিজবুল্লাহ বাহিনীর তৎপরতা শুরু হয়ে যায়। স্বাধীনতাকামী লেবানিজদের পিছনে সিরিয়া এবং ইরান সব রকম সাহায্য দান অব্যাহত রাখে। শেষ পর্যন্ত মার্কিন এবং ফরাসিদের নানা ধরনের চক্রান্তে পড়ে যায় লেবাননের গণতন্ত্র এবং এক সময় তা প্রায় ধ্বংস হয়ে যায়।



www.pathagar.com

# তালেবান ও আল-কায়েদা না ঘরকা না ঘাটকা

এভাবে এরা যেসব ইসলামী যুদ্ধরত দল ছিল তারা মত ও পথে এক ছিল না। অত্যন্ত সামান্য বিষয়ে তাদের ছিল মতপার্থক্য। এর কারণ ধর্মীয় কোনো মতপার্থক্য নয়। এর কারণ ছিল আন্তর্জাতিক সম্পর্ক। মুজাহিদীন গ্রুপগুলোর কারো সম্পর্ক ছিল মার্কিন বা পশ্চিমা মুলুকের সঙ্গে, আর কারো সম্পর্ক ছিল পাকিস্তানের একনায়ক সেনা জান্তা জেনারেল জিয়াউল হকের সঙ্গে। জেনারেল জিয়া ছিলেন পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামীর একজন ঘোর সমর্থক। ফলে জামায়াতের ইসলামীর মত ও পথের সমর্থনকারী মুজাহিদীন গ্রুপের তিনি বন্ধু ও সমর্থনদানকারী সরকারপ্রধান। এখানে উল্লেখ না করে পারা যায় না যে, জেনারেল জিয়ার গুপ্তচর বাহিনী ইসলামিক চরমপন্থী দলগুলোর সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে কাজ করতো। তাদের স্বপ্ন ছিল ইসলামিক জিহাদে অংশগ্রহণকারী তাদের পছন্দের যে কোনো একটি দলকে শাসন ব্যবস্থায় এনে কাবুলের সঙ্গে ভারতের যেমন একটি ঐতিহ্যবাহী সম্পর্ক আছে ঠিক তেমন একটি সম্পর্ক তৈরি করে রাজনৈতিক ফায়দা হাসিল করা।

হঠাৎ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন যেই আফগানিস্তান থেকে সেনা প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত নিল তখন সুযোগ বুঝে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিজয় ঘোষণা করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এ কৌশলগত ঘোষিত বিজয়কে কিন্তু হোয়াইট হাউস থেকে সমর্থন করা হলো না। অভিজ্ঞ সিনেটর মহল থেকে জানানো হলো, সোভিয়েত বাহিনী কিন্তু ইচ্ছে করেই অত্যন্ত ভয়াবহ সব বহনযোগ্য আধুনিক সমরাস্ত্র আফগানিস্তানের প্রত্যন্ত অঞ্চলে ফেলে রেখে গেছে। এগুলো এখন বিভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে-ছিটিয়ে থাকা ছোট ছোট ইসলামী চরমপন্থীদের হাতে। এসব অস্ত্র এখন তারা ইচ্ছেমতো ব্যবহার করবে। সুতরাং খুব সাবধান। বিশেষ করে ওসামা বিন লাদনের দল আল-কায়েদা। এ ভবিষ্যদ্বাণী প্রচার করার অল্প দিনের মধ্যেই এ কথা প্রমাণিত হলো আল-কায়েদা কর্তৃক আফ্রিকা এলাকায় ইসরায়েলি এক বাণিজ্যিক জেট-এর ওপর হামলার মাধ্যমে। তখন আফগানিস্তান হলো মার্কিনীদের মদদে জোগানো টাকা ও অত্যাধুনিক মার্কিনী অস্ত্র এবং সোভিয়েত বাহিনীর ফেলে যাওয়া অত্যাধুনিক সব যুদ্ধ বিমান এবং হেলিকপ্টারে সাজানো যুদ্ধক্ষেত্র ও মৃত্যুপুরী। যেখানে প্রতিদিন অন্তর্কলহে মারা যাচ্ছে শত শত মানুষ। ব্যবহৃত হচ্ছে সে সব অস্ত্র।



www.pathagar.com

১৯৯৬ সাল পর্যন্ত এমন অবস্থা। তারপর পতন হলো নাজিবুল্লাহ শক্তির। ইসলামিক মুজাহিদীন যোদ্ধাদের মধ্যে তখন পাকিস্তান সমর্থিত তালেবান যোদ্ধারা প্রবল পরাক্রমশালী। তারা পাখতুন সম্প্রদায়ের এবং মসজিদভিত্তিক দল। তারা সব ইসলামিক উপদলকে যুদ্ধ বন্ধের আহ্বান জানালো। যুদ্ধ বন্ধ হলো। তারা আফগানিস্তানের পাখতুন থেকে পাকিস্তানের বেলুচিস্তান প্রদেশের সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত দখল করে নিয়েছিল। দেশে একটি সরকার প্রতিষ্ঠার জন্য তারা তৎকালীন মার্কিন সরকারের নিযুক্ত আফগানিস্তানে অবস্থানরত দূতের সঙ্গে এক চুক্তি স্বাক্ষর করে। এবং এতে তালেবানরা ১৯৯৬ সালে সই-স্বাক্ষর করে শান্ত হলো। এর মধ্যে পাকিস্তানে এক মস্তবড় রাজনৈতিক উত্থান-পতন ঘটলে তালেবান যোদ্ধারা অসহায় হয়ে পড়ে। উপায়ান্তর না দেখে ওই সময় অর্থাৎ ১৯৯৮ সালে সরাসরি আল-কায়েদা নেতা ওসামা বিন লাদেনকে আমন্ত্রণ জানায়। ওসামা বিন লাদেন এমন একটি সুযোগের অপেক্ষায়ই ছিলেন। তিনি যথাশিঘ্রই এলেন এবং পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে আফগানিস্তানের মাটি থেকে সরাসরি যুদ্ধ ঘোষণা করেন। এ যুদ্ধের পক্ষে পরোক্ষভাবে পাকিস্তান মুসলিম লিগের নেতা নওয়াজ শরিফের সমর্থন ছিল। কেননা পাকিস্তানে সরকার প্রধান হিসেবে টিকে থাকার মূলে তালেবান নেতা মোল্লা ওমরের ছিল নওয়াজ শরিফের পক্ষে এক বিরাট সমর্থন। ওই সময় আমি ছিলাম পাকিস্তানের বিরোধী দলীয় নেত্রী। আমি আহ্বান জানিয়েছিলাম যদি এ যুদ্ধে পাকিস্তান কোনো প্রকারে তালেবান সরকারকে সমর্থন জানায় তাহলে বিশ্বের মুসলমানরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আমার কোনো কথায় কর্ণপাত করা হলো না। নওয়াজ শরিফ সরকার রাজনীতির গভীরতার কথা বলে পার্লামেন্টে আমাকে হেনস্থা করলেন।

অথচ তার অল্পদিন পরই যখন ৯/১১-এর ঘটনা ঘটলো তখন আমার ধারণা সত্য বলে প্রমাণিত হলো। ৯/১১-এর ঘটনার পর মার্কিন বাহিনীর সাঁড়াশি অভিযানের কাছে পরাস্ত হয়ে তালেবান বাহিনী আশ্রয় নেয় পাকিস্তানের সীমান্ত এলাকার বিভিন্ন অরণ্যে এবং পাহাড়ের গায়ে।

তালেবানদের সম্পর্কে বিশ্ববাসী খুব ভালোভাবেই জানেন। তারা পুরুষদের দাড়ি রাখতে এবং মেয়েদের ঘরে থাকতে বাধ্য করতো। সমাজে শাসন ব্যবস্থার নামে মধ্যযুগীয় বর্বরতা চালানো হতো। অন্য যে কোনো ধর্মের ধর্ম ও সংস্কৃতি এমনকি সভ্যতার নিদর্শনমূলক স্থানগুলোও তারা ধ্বংস করলো। ফলে তারা পৃথিবীর কোনো দেশ থেকে কোনো ধরনের সাহায্য-সহযোগিতা পেলো না। বিশেষ করে অর্থনৈতিক সাহায্য বন্ধ হয়ে গেল।

আগেই বলেছি আল-কায়েদা কর্তৃক আফ্রিকার ২টি দেশে ২টি মার্কিন দূতাবাসের ওপর বোমা হামলা জাতিসংঘের টনক নাড়িয়ে দেয়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পেয়ে যায় মস্তবড় সুযোগ। এর পরই ৯/১১-এর হামলার ঘটনা ঘটে।


www.pathagar.com

এবার আফগানিস্তানে শুরু হলো গণতন্ত্র নিয়ে খেলা। তখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অত্যন্ত খুশি। কেননা তারা তালেবান মৌলবাদীদের সঙ্গে আল-কায়েদাসহ তাদের নেতাকেও ধ্বংস করেছে- এ ছিল তাদের মতামত। এ দাবিতে আফগানিস্তানে তারা নির্বাচন দিলো এবং আফগানিস্তানের সংবিধান রচনা করলো। অথচ তখনো বিভিন্ন ইসলামিক সংগঠন পাকিস্তানের ভূখণ্ডে অবস্থান করে, বিভিন্ন দলে-উপদলে বিভক্ত হয়ে মার্কিন এবং ন্যাটো বাহিনীর সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত। যা-ই হোক, সুষ্ঠুমতো নির্বাচন সম্পন্ন হওয়ার পর আফগানিস্তানের সংবিধান রচনা করা হলো, কিন্তু পাকিস্তানের সামরিক সরকারের ছায়াতলে এসে তালেবান যোদ্ধারা পাকিস্তানে এক স্বর্গ সুখের স্থান পেয়ে গেল। পাকিস্তানের ওয়াজিরিস্তান থেকে পাকিস্তান সরকার সেনা প্রত্যাহার করার সঙ্গে সঙ্গে আফগানিস্তান আবার অশান্ত হয়ে উঠলো। অবশ্য পাকিস্তান তখন ঐক্য ও একতার দেশ।

একটি মজার বিষয় হলো তালেবান যোদ্ধাদের কাছে মার্কিনীদের অর্থ এবং অস্ত্র যত প্রিয় ছিল তার চেয়ে অনেক বেশি ঘৃণিত ছিল মার্কিন সরকার এবং জনগণ। তাই ১৯৯০-এর দশকে আফগানিস্তান থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সেনা তুলে নেয়ার সঙ্গে সঙ্গে ইসলামিক মৌলবাদী দলগুলোর শক্তি বেড়ে যায় এবং আফগানিস্তানের ওপর থেকে মার্কিন বাহিনীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা অনেক হ্রাস পায়। এখানে একটি বিষয় পরিষ্কার নয় যে, মার্কিন সেনা প্রত্যাহারের সঙ্গে সঙ্গে পাকিস্তানী গোয়েন্দা সংস্থা তালেবান বা আল-কায়েদার পেছন থেকে কেন খুব ধীরে চলে এলো।

এটা সর্বজনবিদিত যে, পাকিস্তানের সামরিক জান্তাদের সঙ্গে চিরকালই জামায়াতে ইসলামী দলের সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর এবং তারা এ দলের প্রবর্তক মওলানা মওদুদীর বাধ্য সন্তান। সেই বাধ্যতার পুরস্কারস্বরূপ সেনাবাহিনীর সদস্যদের কেউ দাড়ি রাখলে তাকে আলাদা পুরস্কার প্রদান করা হতো। কেননা এটি ধর্ম রক্ষার একটি বাহ্যিক বাধ্যতার প্রকাশস্বরূপ। সঙ্গে সঙ্গে আর একটি জিনিস তারা প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হলো যে, যেহেতু সোভিয়েত বাহিনী পরাজিত, সুতরাং সে পরাজয় তালেবান বা আল-কায়েদা বাহিনীর কাছে নয়; সে পরাজয় পাকিস্তান গোয়েন্দা এবং সেনাবাহিনীর কাছে। তাদের এ বিশ্বাসকে বদ্ধমূল করতে সাহায্য করেছিল আধুনিক তথ্যপ্রবাহে নিযুক্ত স্যাটেলাইট টেলিভিশন, সংবাদপত্র এবং বেতার যন্ত্র। এর পেছনে অবশ্য রাজনৈতিক ও কূটনৈতিক বেশ কিছু উদ্দেশ্যও ছিল। এ ভিত্তিহীন বাজে বিশ্বাস পরবর্তী সময়ে পাকিস্তানের রাজনীতিতে এক বিস্ময়কর অপপরিবর্তন আনে। অবসরপ্রাপ্ত সেনা


www.pathagar.com

কর্মকর্তারা পাকিস্তানের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য তারা নিজেরা ন্যাশনাল অ্যাকাউন্টেবিলিটি ব্যুরো বা ন্যাব নামে একটি ফোরাম বানালো- যারা পাকিস্তানের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সমরনীতির দিকনির্দেশনা দেবে এমন সব। কিন্তু বিধি বাম। নানা ধরনের অভিযান চালিয়ে সরকারি বা বিরোধী দল, আমলা, মন্ত্রী, সেনাবাহিনীর উচ্চপদস্থ কর্মচারীদের মধ্য থেকেই নানা ধরনের অপরাধ খুঁজে পাওয়া গেল, যা মুশাররফ সরকার আসার আগের যে কোনো নির্বাচিত সরকারের চেয়ে অনেক বেশি। এবং এর প্রমাণ পাওয়া যায় ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল ব্যুরো ২০০৬ সালের রিপোর্টে।

ফিরে আসি ১৯৯৬-তে। ১৯৯৬ সালে গণতান্ত্রিক সরকারের সঙ্গে সঙ্গে এক অদৃশ্য ইশারায় পাকিস্তানে আবার চরমপন্থীরা মাথাচাড়া দিয়ে উঠলো। এর প্রকৃষ্ট উদাহরণ ২০০৭ সালে ইসলামাবাদে লাল মসজিদে বোমা হামলা। এ হামলায় শতাধিক নিরীহ মানুষ নিহত হয় এবং এর কিছুদিন পর পাকিস্তান কোর্ট মৌলবাদী মিলিশিয়া বাহিনীর পক্ষে রায় দিয়ে জানায় যে, লাল মসজিদ মিলিশিয়াদের হস্তে অর্পণ করা হোক। শুধু তাই নয়, পরে এটিকে শিশুদের জন্য লাইব্রেরি হিসেবে ব্যবহার করা হবে এমন কথাও বলা হয়। এক কথায় আমি বলতে পারি, তালেবান বা আল-কায়েদা বা পৃথিবীর অন্য যে কোনো ইসলামিক দলগুলো না ঘরকা না ঘাটকা। এরা গণতন্ত্র বা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা কোনোটার পক্ষেই নেই। কেননা এরা দুটোর কোনোটাই বোঝে না। বিশ্বব্যাপী বোমা হামলা করে শান্তি বিনষ্ট করছে আর মুসলমানদের মান-সম্মান নষ্ট করছে।


www.pathagar.com

# বাংলাদেশ হবে মুসলিম বিশ্বে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ

এত কিছু হওয়ার পরও মুসলিম বিশ্বের অনেক দেশেই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা কিংবা উন্নতির সফল ইতিহাস রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ আমি আমার জন্মভূমি পাকিস্তানের কথা বলতে পারি। আমার জন্মভূমি পাকিস্তানের সরকারিভাবে নামকরণ করা হয়েছিল ইসলামিক রিপাবলিক অব পাকিস্তান। এখানকার সাধারণ মানুষকে ধর্মপ্রাণ বা ধর্মভীরু যাই বলি না কেন, সেই সংজ্ঞায় ভূষিত বলে তারা শ্রদ্ধা এবং সম্মানের সঙ্গে ধর্ম পালন করে নিজেদের উদ্যোগে, তাই বলে রাষ্ট্রতন্ত্রে ইসলাম বা গণতন্ত্র তার কোনোটিই নির্দিষ্টভাবে নেই। বরং বলা চলে পাকিস্তানের জনগণ একই সঙ্গে গণতন্ত্র চর্চার যে বিপদ তার রূপ আর একনায়ক শাসকদের ভয়াবহ রূপ তাও তারা দেখেছে। মনে হয় পৃথিবীর আর কোনো দেশের জনগণ এমনটি দেখেনি। কেননা পৃথিবীর আর কোনো দেশে আমলাতান্ত্রিক মুশাররফ কিংবা অতীতের জেনারেল জিয়ার মতো উগ্র মৌলবাদী চিন্তা-চেতনার ভয়ঙ্কর একনায়ক শাসক জন্মায়নি।

পাকিস্তানীরা ধর্মপ্রাণ বা ধর্মভীরু তাই বলে ধর্ম নিয়ে ব্যবসায় তারা পছন্দ করে না। ফলে মধ্যপন্থী পশ্চিমা বিশ্বকে তুষ্টকারী ইসলামের ধ্বজাধারী যে দল পাকিস্তান মুসলিম লীগ, তারা ইসলামকে সামনে রেখে ভণ্ডামি করার জন্য ক্ষমতায় থাকতে পারেনি। ক্ষমতায় গিয়ে ভণ্ডামি, বর্বরতা, নিপীড়ন, নির্যাতন চালানোর দিক থেকে গত ৮ বছর শাসন-দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে জেনারেল মুশাররফ রীতিমতো জেনারেল জিয়াকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন। মুশাররফের সেনা অভ্যুত্থান পরবর্তীকালে নির্বাচিত সরকার, গণতন্ত্র চর্চার কেন্দ্র, রাজনৈতিক দল, এনজিও, স্বাধীন তথ্য প্রচার কেন্দ্রকে তাদের ব্যবহারের মতো করে গড়ে তোলেন। ফলে এক ধরনের মেকি গণতন্ত্র পাকিস্তানের মাটিতে জন্ম নেয়। যার ফলে তাদের মতের বাইরে যাওয়া গণতন্ত্রের মানসপুত্রদের ভাগ্যে ছিল নিশ্চিত মৃত্যু বা অসহ্য নির্যাতন। শুধু তাই নয়, নতুন নতুন আন্দোলনের সঙ্গে মাঝে মাঝে সম্মুখ যুদ্ধও হয়েছে; কিন্তু গণতন্ত্রের কোনো উন্নতি হয়নি। গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য কোন কাজ তিনি করেননি। বরং কিছুদিন পর পাকিস্তানের জনগণের কাছে তাঁর উদ্দেশ্য পরিষ্কার হয়ে গেল। তখন শুরু হলো গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং সে আন্দোলনের রূপ দেখে আমি সংকল্প করলাম যে, পাকিস্তানে যে করেই হোক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করবোই, তাতে আমার জীবন যায় যাক।



www.pathagar.com

এবার বাংলাদেশের কথা বলি। মুসলিম বিশ্বে বাংলাদেশের গণতন্ত্র উত্তরণ এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যে আন্দোলন তা তাবৎ বিশ্বের কাছে অবাক করার মতো। সম্প্রতি সামরিক শাসন চলছে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কিছু মানুষকে সামনে রেখে। অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এ দেশের সাবেক দুজন প্রধানমন্ত্রীই কারাগারে অন্তরীণ। এখানে আইনের শাসনের এক মহৎ উদাহরণ সৃষ্টি হলেও গণতন্ত্রায়নে দেশটি পিছিয়ে গেছে। বাংলাদেশের নির্বাচন এবং নির্বাচিত প্রতিনিধির মাধ্যমে গঠিত সরকারের জন্য আন্দোলন চলছে গত দুই দশক। নির্বাচন হচ্ছে, নির্বাচনে নির্বাচিত সরকার আসছে, কিন্তু গণতন্ত্র এবং গণতান্ত্রিক সরকার সেখানে দাঁড়াতে পারছে না। এটা অবশ্য গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আংশিক সাফল্য বলে ধরে নেয়া যায়। গণতান্ত্রিক আন্দোলন এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা সেখানে পাবেই। বাংলাদেশ হবে মুসলিম বিশ্বের গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার এক শ্রেষ্ঠ উদাহরণ। তবে বহুদলীয় গণতন্ত্র চর্চা এবং গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে হলে বৃহত্তম দল দুটোর নেত্রীদ্বয়কে কারাগারের বাইরে থাকতে হবে। নেতা-নেত্রী কারাগারে থাকলে বা নির্বাসনে থাকলে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা পাবে না। এই আলোচনায় একটু পিছিয়ে না গেলে হয় না। আমি বলবো, ১৯৪৭ সালে দেশ ভাগের পর তৎকালীন দুই পাকিস্তান– পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমানে স্বাধীন বাংলাদেশ), যা ভারতের পূর্ব সীমান্তে অবস্থিত এবং পশ্চিম পাকিস্তান (বর্তমানে পাকিস্তান), যা ভারতের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত। এই দেশ ভাগের কূট পলিসিই এই দুই দেশের গণতন্ত্র চর্চার প্রধান বাধা। সে বাধার সামনে মাথা তুলে দাঁড়ায় ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি এবং শিল্প-সাহিত্য চর্চার মতামত।

সবদিক ভেবে ১৯৫৬ সালে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের মধ্যকার অটুট বন্ধন এবং গণতান্ত্রিক সরকারকে আরো শক্তিশালী করার জন্য অ্যাসেম্বলি কল করা হলো। ভৌগোলিকভাবে দুই পাকিস্তান দূরে থাকলেও তাদের মতবাদ বা শাসন ব্যবস্থা তো একই, সুতরাং দুই পাকিস্তানের জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় সমানভাবে যেন অধিকার প্রতিষ্ঠা করা যায় সেদিকে জোর দেয়া হয়। এর জন্য দরকার পার্লামেন্টে সমান সংখ্যক আসন। সেই মতো ব্যবস্থা নেয়া হলো। কিন্তু পুনরায় বাগড়া মারলো সেই সামরিক জান্তা।

১৯৫৮ সালে হঠাৎ করে জেনারেল আয়ুব খান বাধা হয়ে দাঁড়ালেন। তখন পূর্ব পাকিস্তানে চলছে স্বায়ত্তশাসনের জন্য স্বাধিকারের আন্দোলন। তারা পাকিস্তানের সঙ্গে থাকতে চায়। কিন্তু বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক, প্রতিরক্ষা এবং অভিন্ন মুদ্রা তারা রাখতে চায়। তখন পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের যেসব নেতারা সমান অধিকারের কথা বলে একটি সুন্দর দেশ রচনা করতে চেয়েছিলেন,


www.pathagar.com

তারাই সময়ের নানা উত্থান-পতনের কারণে পিছিয়ে গেলেন। আয়ুব খান এই সুযোগ অ্যাসেম্বলি ভেঙে দিলেন। অর্থাৎ নতুন দেশের শিশু গণতন্ত্রকে মাথায় লাঠি মেরে তার গতিকে থামিয়ে দেয়া হলো। দেশে সামরিক শাসন জারি করলেন অর্থাৎ গণতন্ত্রের একটি কংক্রিটে গাঁথা কবরের ভিত প্রস্তুত করা হলো। কেননা সামরিক আইন জারি করার সঙ্গে সঙ্গে নিষিদ্ধ হলো রাজনৈতিক দল এবং তাদের যে কোনো ধরনের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড, মিছিল-মিটিং তো স্বপ্নের ব্যাপার। সঙ্গে সঙ্গে দুই পাকিস্তানে সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডও বন্ধ করে দেয়া হলো। এর পরিণতিতে একদিকে শান্ত পশ্চিম পাকিস্তান, অন্যদিকে অশান্ত পূর্ব পাকিস্তান। জেনারেল আয়ুব খান হিমশিম খেয়ে যাচ্ছিলেন অশান্ত পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার জন্য স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মরিয়া হয়ে উঠেছে। এক সময়ে আয়ুব খানের সামরিক মেজাজের কারণে এবং গণতন্ত্রকে না মেনে নেয়ার জন্য পূর্ব পাকিস্তানের এই ছোট্ট সমস্যা এক মহা সমস্যায় পরিণত হলো।

সমস্যার তিনি কোনো সমাধানে আসতে পারলেন না। ফলে ১৯৬৯ সালে চালাকি করে দুই পাকিস্তানের জটিল অবস্থা দেখে ১৯৬৯ সালে জেনারেল ইয়াহিয়া খান, তার আরেকজন প্রিয় সৈন্য একনায়ক জান্তার হাতে দায়িত্ব দিয়ে সরে দাঁড়ালেন। ইয়াহিয়া খান সাহেব লোক দেখানো গণতন্ত্রের নামে ১৯৭০ সালে নির্বাচন দিয়ে বসলেন। তিনি বুঝতে পারেননি যে, পূর্ব পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসনের দাবিতে মরিয়া জনগণের মনের অবস্থা কী এবং তার পরিণতি কী হতে পারে। বুঝতে পারেননি বলে মওলানা ভাসানী সেই নির্বাচন বর্জন করলেও শেখ মুজিবের দল আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। অন্যদিকে আমার পিতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পশ্চিম পাকিস্তানে জনপ্রিয় নেতা এবং পশ্চিম পাকিস্তানে জয়লাভকারী সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়ী দলের প্রতিনিধি। শুধু তাই নয়, শেখ মুজিবুর রহমান যেমন পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পাননি– আমার পিতা পাকিস্তান পিপলস পার্টির পক্ষ থেকে কোনো আসন পূর্ব পাকিস্তান থেকে পাননি। গণতন্ত্র সুরক্ষা ইয়াহিয়া খান ক্ষমতায় থাকা এবং পূর্ব পাকিস্তানের জনগণকে সত্য কথা বলতে কি স্বায়ত্তশাসনের দাবি থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সর্বোপরি দুই পাকিস্তানকে এক রাখার জন্য শুরু হলো আলোচনার পর আলোচনা। তাতে কোনো লাভ হলো না।

শেখ মুজিব তখন সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতা। সেহেতু তিনি ক্ষমতায় যাওয়ার দাবিদার, যদিও তিনি পশ্চিম পাকিস্তানে কোনো আসন পাননি। পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের মনে চরম অসন্তোষ এবং অবিরাম ব্যর্থ আলোচনার ভাব


www.pathagar.com

দেখে ধূর্ত ইয়াহিয়া খান ঘোষণা করলেন ১২০ দিনের মধ্যে যদি কোনো সিদ্ধান্তের কথা তাকে জানানো না হয়, তাহলে অ্যাসেম্বলি ভেঙে দেয়া হবে। এই ঘোষণা শোনার পর পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ অসন্তোষে ফেটে পড়লো। তখন তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান নেতা-কর্মী নিয়ে জনগণের মতের ওপর ভিত্তি করে মিলিশিয়া বাহিনী গঠন করলেন, যারা পরবর্তীকালে মুক্তিবাহিনী হিসেবে পরিচিত এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্পূর্ণ স্বাধীন একটি পৃথক রাষ্ট্র বানানোর জন্য স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। শুধু তাই নয়, ধীরে ধীরে তারা অসহযোগ আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলো। মিলিশিয়া বাহিনী পুলিশি দায়িত্ব পালন করার সঙ্গে সঙ্গে সেনাবাহিনীর কর্মকাণ্ডেও ধীরে ধীরে বাধা দিতে লাগলো। এ সময় ইয়াহিয়া খানকে সঙ্গে নিয়ে আমার পিতা জুলফিকার আলী ভুট্টো একটি সমঝোতায় পৌঁছানোর লক্ষ্যে বাস্তব পদক্ষেপ গ্রহণের জন্য মধ্যস্থতাকারী হিসেবে এগিয়ে আসেন। কিন্তু না, তখন জনগণ নিয়ে শেখ মুজিবুর রহমান যে কোন পথে পা বাড়ালেন, সে সময় তা তিনি নিজেও জানতেন না।


www.pathagar.com

# সব মিলিয়ে বাংলাদেশ এক অসাধারণ দেশ

আমার পিতা জুলফিকার আলী ভুটো তখন ঢাকায়। এক রাতে আচমকা কাউকে না জানিয়ে জেনারেল ইয়াহিয়া খান ঢাকায় মিলিটারি নামালেন এবং অ্যাসেম্বলি ভেঙে গিলেন। পাল্টা জবাবে শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ হরতালের ডাক দিলেন। সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তান হয়ে উঠলো অশান্ত। এ সময় মিলিটারি হামলার প্রতিবাদ মেজর জিয়াউর রহমান নামে একজন সেনা অফিসার স্বাধীনতার পক্ষে যুদ্ধ ঘোষণাা করেন। একটি শক্তিশালী অখণ্ড রাষ্ট্র পাকিস্তান, তাকে ভাঙতে পারলে ইন্ডিয়া লাভবান হয় সবদিক দিযে, সুযোগ বুঝে ইন্ডিয়া সরকার আওয়ামী লীগের নেতাদের সে দেশে দিযে সরকার গঠন করার জন্য সুযোগ করে দেয়।

আওয়ামী লীগের নেতারা তাই করলেন, পালিয়ে গিয়ে ইন্ডিয়ার মাটিতে বসে সরকার গঠন করলেন। সত্য কথা বলতে কী ইন্ডিয়ার ভীতির রাষ্ট্র পাকিস্তানের এহেন গোলযোগ এবং এক সময় অবশ্যই ভেঙে যাবে এই ভাবনা ভেবে খুব খুশি হলো। পূর্ব-পাকিস্তানের ভেতরে যুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। লাখ লাখ বাঙালি উদ্বাস্তু হয়ে ইন্ডিয়ায় আশ্রয় নিল। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর থেকেই পাকিস্তানের সঙ্গে ইন্ডিয়ার সম্পর্ক ভালো ছিল না। এই ভালো না থাকার ফল ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ।

হঠাৎ ডিসেম্বরের শুরুতেই ইন্ডিয়া পাকিস্তানকে আক্রমণ করে বসলো। এমনিতেই পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ভেতরে তখন অসন্তোষ, অর্থনৈতিক টানাপড়েন এবং অস্ত্রশস্ত্রের অপর্যাপ্ততা বিরাজ করছে– উপরন্ত দেশের জগগণ বেশিরভাগই সংগ্রামে লিপ্ত– অন্যদিকে ইন্ডিয়ান সেনারা সরকারি সাহায্য-সহযোগিতা, জনগণের সমর্থন, ভারী অস্ত্রে সজ্জিত, সর্বোপরি প্রতিশোধের আগুন তাদের মনের মধ্যে জ্বলছে। তাই তারা মরিয়া হয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো। ফলে সুসজ্জিত নিয়মিত পরিকল্পিত বাহিনীর কাছে পাকিস্তান সে যুদ্ধে পরাজিত হয় এবং ১৯৭১ সালের ১৬ ডিসেম্বর তারিখে পাকিস্তান বাহিনীন ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে আত্মসমর্পন করে।

## অতঃপর বাংলাদেশ অধ্যায়

দেশ স্বাধীন হলে পরে নতুন দেশের নাম হলো বাংলাদেশ এবং বাংলাদেশিদের নতুন প্রধানমন্ত্রী হলেন তাদের নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। তখন বাংলাদেশে চলছে চরম অর্থনৈতিক দুরবস্থা। এ সময় চরম এক দুর্ঘটনার


www.pathagar.com

মধ্য দিয়ে এ সরকারের পরিসমাপ্তি ঘটে। অর্থাৎ গণতন্ত্র বাংলাদেশেও পরিসমাপ্তি ঘটলো। ১৯৭৫ সালে শেখ মুজিবুর রহমান কয়েকজন সেনা অফিসারের হাতে নিহত হন। অন্য কিছুই নয়, শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর একদলীয় শাসন কায়েম করার জন্যই মূলত নিহত হলেন। উপায়ান্তর না দেখে পুনরায় বিধ্বস্ত সেই দেশের হাল ধরলেন জেনারেল জিয়াউর রহমান। তিনি অফিসিয়ালে ১৯৭৭ সালে রেফারেন্ডাম দিয়ে দেশের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ক্ষমতায় বসেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের ব্যাপার জিয়াউর রহমানও এক সেনা অভ্যুত্থানে মারা যান। পুনরায় নির্বাচন হয় এবং নির্বাচনে নতুন সরকার আসে। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন জেনারেল হুসেইন মুহম্মদ এরশাদ। বাংলাদেশের মাটিতে পরবর্তীত ১০ বছরের জন্য গণতন্ত্র নিপাত যায়। চলে বিরামহীন আন্দোলন। অতঃপর ১৯৯০ সালে এরশাদ সরকারের পতন ঘটে।

পরবর্তী ১৬ বছর যাবৎ বাংলাদেশের সরকারপ্রধান হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে পালাক্রমে আসেন প্রথমে ১৯৯১ সালে খালেদা জিয়া, তিনি সেনা অভ্যুত্থানে নিহত প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের বিধবা পত্নী এবং ১৯৯৭ সালে আসেন শেখ হাসিনা, যিনি শেখ মুজিবুর রহমানের কন্যা।

পালাক্রমে এই দুই নেত্রী প্রধানমন্ত্রী হলেও ক্ষমতা হারানোর সঙ্গে সঙ্গে দুজন দুজনের বিরুদ্ধে নানা ধরনের দুর্নীতি এবং ক্ষমতার অপব্যবহারের মতো মারাত্মক সব অপরাধে দোষী সাব্যস্ত করেন। এমন এক দুরাবস্থার মধ্যে দ্বিতীয়বারের মতো বেগম জিয়া ক্ষমতা হারানোর পর পুনরায় সেনাবাহিনী ক্ষমতা দখল করে এবং তারা গণতন্ত্রকে স্থায়ী রূপ দেয়ার জন্য দুই নেত্রীকে কারাগারে পাঠায়। অন্যান্য নেতা-ত্রী এবং সাবেক আমলা, মন্ত্রী, এমপিদেরও গ্রেফতার করে। এবং একটি তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য দেশ চালাচ্ছেন এবং দেশের বিভিন্ন শাসন স্তরের বিভিন্ন পুরনো নিয়ম-কানুনের সংস্কার কাজ চালাচ্ছেন। উদ্দেশ্য একটি সুষ্ঠু ও অবাধ নিরপেক্ষ নির্বাচনের মাধ্যমে একটি সুন্দর গণতান্ত্রিক সরকার গঠন করা। এ কারণে বাংলাদেশের দলগুলোর মধ্যে এবং সরকারি শাসন ব্যবস্থার নানা সংস্কার কাজ।

এখন বাংলাদেশ সম্পর্কে কটি কথা না বললেই নয়। বাংলাদেশ একটি জনবহুল দেশ। শুধু তাই নয়, পৃথিবীতে যতগুলো দেশ আছে তার মধ্যে বাংলাদেশ একটি অন্যরকম দেশ। এর প্রাকৃতিক সম্পদ, নতুন দেশের মানুষ সবমিলিয়ে এক অসাধারণ দেশ। অনেক চড়াই-উৎরাই পেরিয়ে এখনো চলছে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য চেষ্টা। এ দেশটাতে গণতন্ত্রের জয় একদিন হবেই।



www.pathagar.com

## বিষয় : পাকিস্তান-আমার পাকিস্তান

আমি যখন এই লেখা লিখছি, তখন পাকিস্তানের রাজনীতিতে চলছে এক ভয়াবহ উত্থান-পতন। পাকিস্তান রাষ্ট্রের ৬০ বছরকাল ইতিহাসে, ২০০৭ সালের ৩ নভেম্বরকে সবচেয়ে অন্ধকারাচ্ছন্ন এক ভয়াবহ কালো দিবস বলে আখ্যায়িত করা যায়। বর্তমানে পাকিস্তান হচ্ছে একনায়ক সামরিক জান্তা শাসিত নির্যাতন আর নিপীড়নের দেশ। ঐদিন জেনারেল পারভেজ মুশাররফ খুব কায়দা করে এক রক্তপাতহীন সেনা অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন। ক্ষমতায় এসেই সামরিক জান্তাদের যা স্বভাব তাই করলেন। নির্বিচারে দেশের শত শত সৎ বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, মানবাধিকার কর্মী, আইনজীবী, বিচারক প্রমুখদের বিনা অপরাধে গ্রেফতার করলেন। সাথে সাথে পার্লামেন্ট এবং সংবিধানকে বাতিল ঘোষণা করলেন। এমনকি যে সব সংবাদপত্র এবং টেলিভিশন চ্যানেল তার ঐসব অবৈধ কর্মকাণ্ড সম্পর্কে সমালোচনা করেছিল– তাদের সব কার্যক্রম বন্ধ করে দিলেন। তাতেও তিনি থেমে থাকলেন না, আমার পাকিস্তানের জনগণের ওপর নির্বিবাদে ব্যাটন চার্জ, লাঠি চার্জ, টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ, এমনকি এলোপাথাড়ি ফাঁকা গুলি চালানোর পর্যন্ত পুলিশ এবং সেনাবাহিনীকে জরুরি বলে আদেশ করলেন। তাই এটা ছিল পাকিস্তানের জন্য কালো দিবস, গণতন্ত্রের জন্য অশুভ দিন এবং একটি ঐতিহাসিক কৃষ্ণ দিবস অন্তত পাকিস্তানের জন্য। যে দেশটি এখন মুসলিম বিশ্বে অত্যন্ত জনপ্রিয় যার গণতন্ত্রের চর্চার কারণে সমগ্র মুসলিম বিশ্বে একটি গর্ব আছে, সারা বিশ্বে গণতন্ত্র চর্চার জন্য যে দেশটি এখন অত্যন্ত সম্মানিত। বিশেষ করে তার বিদ্বান সুশীল সমাজ এবং সামাজিকতা বিশ্ব মানব সভায় অত্যন্ত মর্যাদাপূর্ণ। পাকিস্তান এই পর্যায়ে যে কিভাবে পৌঁছেছিল, সেটাই আমি এখন ব্যাখ্যা করবো। যে ইতিহাস অত্যন্ত গৌরবময় এবং স্বর্ণজ্জ্বোল।

প্রথমেই বলে নিই– পাকিস্তানের সেই গৌরবময় স্বর্ণজ্জ্বোল ইতিহস সম্পর্কে জানতে হলে পাকিস্তানের বিভিন্ন প্রদেশ, তাদের ভাষা, জীবনযাত্রা, চরিত্রের মহত্ত্ব বৈশিষ্ট্য, সামাজিকতা এবং সংস্কৃতি ও ধর্ম সম্পর্কে জানতে হবে। না জানলে বোঝা যাবে না।

পাকিস্তানের রয়েছে ছোট-বড় চারটি প্রদেশ। এগুলো হচ্ছে– পাঞ্জাব, সিন্ধ, বেলুচিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল। এছাড়াও আছে– কেন্দ্র শাসিত চারটি অঞ্চল। যেমন– রাজধানী ইসলামাবাদ সংযুক্ত অঞ্চল, পাকিস্তান নিয়ন্ত্রিত আজাদ কাশ্মীর, উত্তরাঞ্চলসমূহ এবং কেন্দ্র শাসিত উপজাতীয় বা ট্রাইবাল



www.pathagar.com

অঞ্চল (ফাতা)। ফাতা হচ্ছে আফগানিস্তান এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের মধ্যে অবস্থিত প্রদেশ। জেনারেল মুশাররফ ক্ষমতায় এসেই ফাতা প্রদেশটিকে অচল বানিয়ে ফেললেন। স্থানীয় ট্রাইবাল বা উপজাতীয় নেতাদের হাত করে চরমপন্থী ইসলামিক মৌলবাদীরা এই অঞ্চলকে সন্ত্রাসবাদের স্বর্গ হিসেবে গড়ে তোলে। এজন্য উত্তরাঞ্চল সব সময়ে সংঘর্ষে এবং হত্যা-খুন নিয়ে অশান্ত থাকতো। আজাদ কাশ্মীর একটি স্বায়ত্ব শাসিত প্রদেশ। এর চূড়ান্ত অধিকারের ফয়সালা নির্ভর করছে সম্পূর্ণভাবে জাতিসংঘের উপর। পাকিস্তান প্রথম থেকেই ভারত নিয়ন্ত্রিত জম্মু কাশ্মীরেসহ পুরো কাশ্মীর প্রদেশকেই তার অংশ বলে দাবি করে আসছে।

## পাঞ্জাব

জনসংখ্যার হিসাবে পাঞ্জাব পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ, যেখানে পাকিস্তানের মোট জনগণের অর্ধেকের চেয়ে বেশি লোক বসবাস করে। (প্রায় ৯ কোটি)। পাঞ্জাবীরাই হচ্ছে পাকিস্তানের মূল বাসিন্দা, বাকিরা বিভিন্ন দেশ থেকে এসে দীর্ঘকাল বসবাস করে এখন পাকিস্তানী। পাঞ্জাবে তিন ধরনের ভাষা চলে- পাঞ্জাবী, উর্দু এবং শিরাইকি। পাঞ্জাব শব্দের অর্থ হচ্ছে পঞ্চ নদীর মিলন ভূমি। পঞ্চ নদীর মিলন ভূমি বলে অন্যান্য প্রদেশের চেয়ে পাঞ্জাবের মাটি সবচেয়ে বেশি উর্বর। পাঞ্জাব শিল্প এবং কৃষি উৎপাদনে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। উৎপাদিত শস্যের মধ্যে আছে গম, ধান, ভুট্টা, বজরা, ছোলা, মটর, তুলা এবং ইক্ষু। শিল্প উৎপাদনের মধ্যে আছে কাপড়, কার্পেট, খনি পদার্থ এবং মূল্যবান বিশ্ববাজার মাতানো নানাবিধ কুটির শিল্প।

## সিন্ধু

সিন্ধু অঞ্চলে সিন্ধিরাই মূল অধিবাসী। তবে বহিরাগত মানুষও আছে- যারা দীর্ঘকাল বসবাস করে এই এলাকায় বর্তমানে স্থায়ী বাসিন্দা। সিন্ধু অঞ্চলের মানুষের মুখের ভাষা সিন্ধি।

১৯৪৭ সালের দেশ বিভাগের পর প্রচুর ভারতীয় মুসলমান উর্দুভাষী মানুষ সিন্ধ অঞ্চলে এসে ওঠে। তারা মুহাজির নামে খ্যাত। করাচি পাকিস্তানের সবচেয়ে মূল্যবান এবং গুরুত্বপূর্ণ প্রাদেশিক রাজধানী শহর। বাণিজ্য, শিল্প এবং জাহাজ বন্দর হিসেবে এই শহরের গুরুত্ব অন্যান্য শহরের চেয়ে অনেক বেশি।

'হিন্দু' নদীর নাম অনুসারে সিন্ধু অঞ্চলের নামকরণ। এছাড়া সিন্ধ অঞ্চল চাষাবাদের জন্য অত্যন্ত নামকরা। এছাড়া শিল্প সমৃদ্ধ সিন্ধু অঞ্চল টেক্সটাইর, খাদ্য শস্য, কেমিকেলসমূহ, ধাতব দ্রব্য এবং ইনফরমেশন টেকনোলজির বিবিধ দ্রব্য নির্মাণে অত্যন্ত সমৃদ্ধ শহর।



www.pathagar.com

## বেলুচিস্তান

বেলুচিস্তান পাকিস্তানের বৃহত্তম এলাকা সমৃদ্ধ প্রদেশ। এর জনসংখ্যা প্রায় ৮০ লাখ। এরা বেশির ভাগই কৃষিজীবী।

বেলুচিস্তানে একটি জনগৎসেরা খনিজ শিল্প আছে– তা হচ্ছে প্রাকৃতিক গ্যাস। এ নিয়ে অবশ্য বেলুচরা অত্যন্ত অহংকারও করে। কারণ এটি বিশ্বের বৃহত্তম গ্যাস ফিল্ড। মাঝে মধ্যে বেলুচিস্তানে সহিংসতা দেখা দেয়। তা হচ্ছে তাদের স্বাধীনতা নিয়ে। তাদের কিছু অংশ লোক স্বাধীনতা চায়। তারা বেলুচিস্তানকে আলাদা রাষ্ট্র হিসাবে দেখতে চায়। আমার সরকারের আমলে, অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরকার মেকরান উপকূলে একাধিক বন্দর নগরী নির্মাণ শুরু করি– গওয়াদার অঞ্চলও অবশ্য এর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিল। আমার মহতী পিতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো এখানে একাধিক জাহাজ বন্দর নির্মাণের স্বপ্ন দেখতেন– কেননা এখানে গড়ে ওঠা জাহাজ বন্দর মধ্য এশিয়ার প্রধান বাণিজ্য বন্দর হিসাবে গড়ে উঠবে– এ আমি হলফ করে বলতে পারি। কিন্তু ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চর্চায় বেলুচিস্তান এখন এক ভয়াবহ প্রদেশ হিসেবে পরিচিত।

১৯৭৯ সালে তৎকালীন সোভিয়েট ইউনিয়নের আগ্রাসী ভূমিকার জন্য আফগানিস্তানের পাখতুন প্রদেশের প্রচুর মানুষ এখানে এসে জমা হয়। পরে অস্ত্র হাতে যুদ্ধে যায়। সোভিয়েত বাহিনী ফিরে গেলেও তারা দেশে ফিরে যায়নি। তাদের হাতে অস্ত্র ছিল, সুযোগ বুঝে উগ্র ইসলামী জঙ্গী চরমপন্থী মৌলবাদীদের দলগুলো সন্ত্রাসী কার্যক্রমের পথ দেখায়। তারা মেতে ওঠে। স্থানীয় সিন্ধু অঞ্চলের লোকজন সহজ-সরল ধার্মিক অতিথিপরায়ণ এবং নিরীহ। পাশেই আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল বলে তারা সহিংসতায় পাখতুন যোদ্ধাদের সাথে পেরে ওঠে না। বেলুচিস্তান আমাদের পাকিস্তান পিপলস পার্টির ভোটের দূর্গ, সেটাকে ভেঙে গুঁড়িয়ে দেয়া ছিল তাদের লক্ষ্য। কেননা অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন হলে পাকিস্তান পিপলস পার্টি বেলুচিস্তান থেকে চিরকাল পাস করে আসবে –এ নিশ্চিত করে বলা যায়।

ভূখণ্ড অনুযায়ী উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চল সবচেয়ে ছোট। কিন্তু উগ্রপন্থীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত এবং ভয়াবহ। যেখানে ধর্মীয়ভাবে ভুল বুঝাবুঝির কারণে সংঘাত লেগেই থাকে। এসব সংঘাত সৃষ্টি করে চরমপন্থী ফাতা গ্রুপের সদস্যরা। এসব গ্রুপের বেশিরভাগ নেতাই হচ্ছে আফগানিস্তান থেকে আসা পাখতুন সম্প্রদায়ের।

পাকিস্তানের আধুনিক ইতিহাস অবিভক্ত ভারতের সাথে মিশ্রিত। সে দেশের মুসলমান শাসক, যারা পরবর্তীতে মুঘল শাসক নামে পরিচিত– তাদের



www.pathagar.com

উত্থান আমাদের এই পাকিস্তান থেকেই। মুঘল শাসকরাই সত্যিকার অর্থে আজকের এই সংযুক্ত ভারত রাষ্ট্রটির সংগঠনকর্তা। বাবুর, যিনি মুঘল সাম্রাজ্যের প্রবর্তক, তিনি ছিলেন বিশ্বখ্যাত অত্যাচারী বীরপুরুষ চেঙ্গিস খানের পরবর্তী বংশপুরুষ। তিনি ষোড়শ শতাব্দীতে কাবুলের মধ্য দিয়ে দক্ষিণ এশিয়ায় এসেছিলেন ফারগান অঞ্চল থেকে। তিনি প্রথমে আফগানিস্তান করায়ত্ত করেন।

১৫২৬ খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের মধ্য দিয়ে দিল্লী পৌঁছান এবং দখল করেন। পরে ১৫৩০ খ্রিস্টাব্দে বাবুরের পুত্র হুমায়ুন হস্তগত করেন। তার আমল ছিল পুরোটাই যুদ্ধ এবং দ্বন্দ্ব-সংঘাতময়। ১৫৫৫ খ্রিস্টাব্দে তার মৃত্যুর অব্যবহিত পূর্বে তিনি পুনরায় রাজধানী দখল করেন।

১৫৫৬ খ্রিস্টাব্দে তার পুত্র আকবর সিংহাসনে বসেন। মুঘল শাসকদের মধ্যে তিনি ছিলেন সবচেয়ে বিখ্যাত এবং প্রতাপশালী সম্রাট। সংযুক্ত ভারতের স্রষ্টা তিনি। গোটা ভারতবর্ষকে সংযুক্ত করা এবং আধুনিক করার কৃতিত্ব তারই।

তার শাসন ব্যবস্থা ছিল একেবারে আধুনিক গণতন্ত্রের ধারায়। এই বিশাল ভূখণ্ডের দরিদ্র, অশিক্ষিত সাধারণ জনগণের মধ্যে ধর্মীয় দ্বন্দ্ব-সংঘাত ছিল প্রকট। তিনি তার বুদ্ধিমত্তার দ্বারা ইসলাম, হিন্দুত্ব এবং বৌদ্ধবাদকে এক সরলরেখায় এনে এক ধরনের ধর্মে পরিণত করেন– যা ভারতবাসীর জন্য ছিল মানানসই এবং মঙ্গলজনক। তিনি এই বিশাল জনসমষ্টি এক শক্তির বদৌলতে শাসন করতেন না– তিনি শাসন করতেন তার প্রজ্ঞা এবং মিশ্র সংস্কৃতির আচার-অনুষ্ঠান দ্বারা।

মজার ব্যাপার হচ্ছে বিশাল ভারতবর্ষ হিন্দু অধ্যুষিত হলেও, শাসন করতেন সংখ্যালঘু মুসলিম মুঘল শাসকেরা। এর মূলে ছিল গণতান্ত্রিক মানসিকতার ভাবধারায় মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী মানুষের মূল্য দিয়ে শাসন কার্য চালানো। তিনি একাধিক বিবাহ করেন। সে সব বিবাহের পাত্রীরা ছিল ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান ক্ষমতাশালী হিন্দু পরিবারের, যেন সংযুক্ত ভারতবর্ষ কখনো ধর্ম বা জাতীয়তার ভিত্তিতে ভেঙে টুকরো টুকরো না হয়।

সম্রাট আকবরের আমলে তার সমগ্র জীবনকালে, মুঘল সাম্রাজ্য পৃথিবীর ইতিহাসে বিভিন্ন বিষয়ের উপর প্রভাব বিস্তার করে এবং প্রভূত অবদান রাখে। মুঘল সম্রাটগণ বিশেষ করে নারীর স্বাধীনতা, অধিকার এবং জ্ঞান-বিজ্ঞান চর্চা অর্থাৎ শিক্ষালাভে বিশ্বাসী ছিলেন। এর প্রমাণ মেলে তাদের পরিবারের নারীদের জীবন পাঠ করলেই। তারা কাব্য, রাজনীতি এবং ইতিহাস পাঠ ও চর্চায় লিপ্ত ছিলেন। রাজসভার অনেক সমস্যা সমাধানে সম্রাট, সভাসদগণের সাথে সাথে


www.pathagar.com

সম্রাটদের পত্নী বা কন্যাদের অনেক সময় তারা মতামত গ্রহণ করতেন, এ তথ্য পাওয়া যায় সভাসদ সম্রাজ্ঞী এবং সম্রাটদের কন্যাগণের লিখিত আত্মজীবনী থেকে।

মুঘল রমণীগণ অত্যন্ত ব্যক্তিত্বসম্পন্ন এবং বুদ্ধিমতী ছিলেন। সংসারে বা রাজকার্যে তাদের মতামতের একটা মূল্য ছিল। সত্য কথা বলতে কি, ইতিহাস বলে, সম্রাট জাহাঙ্গীরের আমলে সম্রাজ্ঞী নূরজাহানই মুঘল সাম্রাজ্য চালাতেন। নূরজাহানের পিতা ইরান থেকে পালিয়ে দিল্লী চলে আসেন। এ পালিয়ে আসার সময় পথের মধ্যে আফগানিস্তানের কান্দাহার শহরে নূরজাহানের জন্ম হয়- যিনি পরবর্তীকালে লৌহমানবী হয়ে ভারতবর্ষকে শাসন করতেন।

ইতিহাসের নির্মম পরিহাস, কয়েক শতাব্দী পর আফগানিস্তানের সেই কান্দাহার শহরে গড়ে ওঠে জগৎবিখ্যাত সন্ত্রাসী একচক্ষু বিশিষ্ট নিষ্ঠুর মানুষ মোল্লা ওমরের তালিবান বাহিনীর সদর দপ্তর। যেখানে একদিন জন্ম নিয়েছিলেন জগৎবিখ্যাত এক মুসলিম মুঘল শাসিকা নূরজাহান।

মুঘল সম্রাট শাহজাহান ছিলেন সম্রাট আকবরের নাতী। তিনি নির্মাণ করেন 'তাজমহল'- যা বিশ্বের সাত আশ্চর্য নির্মাণের একটি। এই বিস্ময়কর শ্বেতপাথরের স্মৃতিসৌধ তিনি নির্মাণ করেন তার প্রিয় পত্নী মমতাজ-এর স্মৃতির উদ্দেশ্যে, তার প্রেমের নিদর্শনস্বরূপ। এই স্মৃতিসৌধে দেখার মতো অনেক কিছুই রয়েছে- তবে একজন স্বামী তার স্ত্রীকে কতখানি ভালোবাসতে পারে তারই প্রমাণ বহন করে বিস্ময়কর সাত আশ্বর্যের একটি নির্মাণ স্মৃতির তাজমহল। এর নির্মাণের ফলে মুঘল সাম্রাজ্যের অর্থনীতিতে আসে চরম বিপর্যয়। শুধু তাই নয় সম্রাট শাহজাহান পাকিস্তানের লাহোরে নির্মাণ করেন নয়নাভিরাম এক বিশাল উদ্যান- যে উদ্যানটি তার পুত্র সম্রাট আওরঙ্গজেব নষ্ট করেন।

সর্বশেষ সম্রাট আওরঙ্গজেব আলমগীর (১৬১৮-১৭০৭) ছিলেন গোঁড়া উগ্রপন্থী মৌলবাদী। তাঁর গোঁড়া মনমানসিকতা এবং উগ্র হিন্দু বিদ্বেষের কারণে মুঘল সাম্রাজ্যের পতন ঘটে। সম্রাট আওরঙ্গজেব সিংহাসনে আরোহণের সাথে সাথে হিন্দুদের ওপর নানাবিধ কঠোর আইন চালু করলেন। হিন্দু অধ্যুষিত ভারতবর্ষে মুসলমান মুঘলরা অত্যন্ত সাহসী যোদ্ধা, অর্থবান এবং জ্ঞানী ছিলেন- নিম্নশ্রেণীর হিন্দুরা ছিল ভীতু, নিরক্ষর, দরিদ্র এবং যুদ্ধবিদ্যায় অপটু। ফলে মনে চাইলেও হিন্দুরা মাথা তুলতে পারতো না। কিন্তু সম্রাট আওরঙ্গজেবের আমলের শেষের দিকে যখন মুঘল সাম্রাজ্যের শাসন ব্যবস্থা নড়বড়ে তখন বহু বছর ধরে চেয়ে থাকা মুঘল শাসকদের নিয়োজিত স্থানীয় মারাঠী শাসকেরা হঠাৎই বিদ্রোহ করে বসলো। সুযোগ বুঝে ইরান এবং আফগানিস্তানে নিয়োজিত শাসকেরাও


www.pathagar.com

তাদের সাথে যোগ দিলেন। আওরঙ্গজেব তখন ইসলাম নিয়ে এতে বেশি ডুবে ছিলেন যে, তাদের প্রতিহত করার মতো সৈন্য, অর্থ এবং আপন কেউ তার পাশে ছিল না। ইতোমধ্যে ব্রিটিশ শক্তি ভারতবর্ষে ততদিনে প্রবেশ করেছে। তখন চলছে সপ্তদশ শতাব্দীর সূচনাকাল।

১৬১৭ খ্রীস্টাব্দে সম্রাট আওরঙ্গজেব বৃটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানিকে ব্যবসায় করার অনুমতি দিয়ে দিলেন। এই অনুমতি মুঘল সাম্রাজ্যের জন্য কাল হয়ে দাঁড়ালো। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তা ব্যক্তিরা ব্যবসায় করতে এসে তারা সম্রাটের অর্থনৈতিক এবং সামরিক শক্তির দুর্বলতার কথা জানতে পারে। এমনিতেই দেশে তখন অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং ধর্মীয় কোন্দল-সংঘাত চলছে। ইংরেজরা আর বসে থাকলো না। তারা সুযোগ বুঝে তাদের অর্থ এবং বুদ্ধি খাটিয়ে সম্রাটকে গোপনভাবে স্থানে স্থানে হেনস্থা করতে থাকে। দিল্লীর সম্রাট থেকে শুরু করে স্থানীয় শাসকেরা, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি কর্তৃক সংঘটিত হত্যা, লুট, সংঘাত প্রতিহত করার জন্য তারা ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কাছেই সাহায্য চাইলো। তারা অবশ্য জানতেন না যে, ঐসব হত্যা, লুট বা সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির অর্থে পালিত স্থানীয় লোকজনের দ্বারাই হচ্ছে। ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি সাহায্যের হাত বাড়ালো কিন্তু ব্যবসায়ের জন্য বেশি সুযোগ চেয়ে বসলো। অসহায় হয়ে মুঘল অধিপতি সেই অধিকার দিলেন। এই সময় খুব কৌশলে ধীরে ধীরে ইংরেজরা আমাদের এই উপমহাদেশের শাসক হতে থাকলো। যার মধ্যে আজকের আধুনিক ভারতসহ পাকিস্তান এবং বাংলাদেশ ছিল। উনবিংশ শতাব্দীতে মুঘল সাম্রাজ্য প্রায় কেন্দ্রীভূত হয়ে পড়ে। এর ফলে ১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের বিরুদ্ধে এক বিপ্লব ঘটলো এবং সেই বিপ্লবে অসংখ্য ইংরেজ সৈন্য নিহত হয়। ইংরেজরা নীরব বসে থাকলো না। তারা আরো মরিয়া হয়ে উঠলো। তারা মুঘল সাম্রাজ্যের শেষ সম্রাট বাহাদুর শাহ জাফরকে দিল্লীর সিংহাসন থেকে বিতাড়িত করে এবং বাহাদুর শাহ জাফর নির্বাসিত জীবনে নিঃস্ব এবং একাকিত্ব বরণ করে অসহায় অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন। ভাগ্যের কি নির্মম পরিহাস যে সম্রাট মস্তবড় মুঘল সাম্রাজ্য চালাতেন মৃত্যুর পরে তাকে কবরস্থ করার জন্য একটু জায়গা পাননি এই ভারতের মাটিতে। শেষ মুঘল সম্রাটকে বিতাড়নের সাথে সাথে ভারতবর্ষ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির হাতের মধ্যে চলে যায় অনায়াসেই এবং অল্পদিন পরেই তা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অধীনে চলে যায়। আর তখনই সেই প্রবাদ বাক্য– ব্রিটিশ সম্রাজ্যে সূর্য কখনো অস্ত যায় না, তা সত্যে রূপান্তরিত হয়। সত্যি সত্যি তখন সমগ্র বিশ্ব ছিল বৃটিশ শাসনাধীন।


www.pathagar.com

১৮৩৪ সালে ইংরেজরা সিন্ধ অঞ্চল জয় করে নেয়। তাদের ব্যবসা-বাণিজ্যের সুবিধার জন্য ভারত মহাসাগর সংলগ্ন করাচি জাহাজ বন্দর ঐ সময় তারা দখল করে। এরপর তারা দ্রুত এগিয়ে যেতে থাকে এবং এক সময় বেলুচিস্তান দখল করে। প্রায় ২৮ বছর পর ভারতীয়দের উদ্যোগে স্বাধীনতা যুদ্ধের নিমিত্তে ১৮৮৫ সালে গঠিত ভারতের জাতীয় কংগ্রেস। এটিই হলো এই উপমহাদেশের প্রথম রাজনৈতিক দল এবং এরা শুধু তাদের মুক্তির জন্য সংগ্রাম শুরু করে। পরে উপায়ান্তর না পেয়ে, ১৯০৬ খ্রীস্টাব্দে এই উপমহাদেশের মুসলমানরা তাদের মুক্তি লাভের জন্য গঠন করেন সর্বভারতীয় মুসলিম লীগ। তারা এই উপমহাদেশের মুসলমানদের ধর্ম, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক অধিকারের কথা বলতে লাগলো। মুহম্মদ আলী জিন্নাহ যিনি পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা এক মহৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসে যোগ দেন। যখন মুসলিম লীগ সৃষ্টি হয় তখন তিনি আবার মুসলিম লীগেও ছিলেন। অর্থাৎ একই সাথে তিনি দু'টো দলেরই সদস্য ছিলেন। অল্পদিন পরেই তিনি কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে আসেন এবং মুসলিম লীগের এক অবিসংবাদিত নেতায় পরিণত হন।

১৯১৬ খ্রীস্টাব্দে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ লক্ষ্ণৌ প্যাক্টে স্বাক্ষর করে। এই প্যাক্টে মুসলিম লীগ, ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পক্ষে স্বাক্ষর দেয় দুই দেশের স্বাধীনতা অর্জনের জন্য। কেননা তখন ভারতীয় উপমহাদেশের সাধারণ জনগণ ইংরেজ শাসন থেকে মুক্তি পেতে চায়। এর প্রতিদানে মুসলমানদের জন্য কিছু নির্দিষ্ট সিট পার্লামেন্টে বরাদ্দ দিতে হবে, যেন মুসলিম অধ্যুষিত জায়গাগুলো মুসলমানরা শাসন করতে পারে। কেননা পুরো ভারতবর্ষে মুসসলমানদের চেয়ে হিন্দুরা জনসংখ্যার ভিত্তিতে অনেক বেশি।

কিন্তু ১৯৩০ খ্রীস্টাব্দে এলাহাবাদে মুসলিম রাজনৈতিক চেতনায় এক নাটকীয় মোড় নেয়। পাকিস্তানের কবি-দার্শনিক এবং মহান নেতা ইকবাল মুসলমানদের জন্য স্বায়ত্বশাসিত এক পৃথক রাষ্ট্রের দাবি করে বসলেন।

এই সময় আমার দাদাজী স্যার শাহ্ নওয়াজ ভুট্টো পাকিস্তানের সিন্ধ অঞ্চলে সিন্ধ ইউনাইটেড নামে ১৯২০ খ্রীস্টাব্দে একটি রাজনৈতিক দল গঠন করেন।

তিনি সিন্ধ-এর প্রথম সংবাদপত্র 'দি জমিদার' প্রকাশ করেন। সেই সময় যারা সরকারি ট্যাক্স দিতেন, সাধারণত তারাই স্থানীয় সরকার নির্বাচনে ভোট দিতে পারতেন। এদের মধ্যে সাধারণত আইনজীবী এবং জমিদারই বেশি থাকতেন।

ইতিহাসের আলোকে বলা যায়– সিন্ধ সব সময়েই একটি স্বাধীন রাষ্ট্র ছিল। একসময় মুলতান ছিল এর রাজধানী। বর্তমানে মুলতান পাঞ্জাবের একটি



www.pathagar.com

গুরুত্বপূর্ণ শহর। সিন্ধ-এর ভূখণ্ড বেশ বিস্তৃত আকারে। এর উত্তর অঞ্চল সুদূর আফগানিস্তানের সীমান্ত অঞ্চল পর্যন্ত বিস্তৃত। এক সময় ইংরেজরা সিন্ধুকে ভারতের সাথে যুক্ত করেছিল। এখানে তিনটি প্রধান রাষ্ট্র ছিল- সিন্ধ, হিন্দ (ইন্ডিয়া-ভারত) এবং বাংলা, এই তিনটি রাষ্ট্র গড়ে ওঠে যথাক্রমে তিনটি নদীর তীরে। সেগুলো হচ্ছে- ইন্দাস (এটি সিন্দু নামে পরিচিত), গঙ্গা এবং ব্রহ্মপুত্র।

সিন্ধ শব্দের উৎপত্তির এক বিশাল ইতিহাস আছে। তা হলো- ১৮৪৩ খ্রীস্টাব্দে ইংরেজদের সাথে সিন্ধীদের ভয়াবহ এক যুদ্ধ হয়। তাতে সিন্ধীরা পরাজিত হয়। এই যুদ্ধে ইংরেজদের পক্ষে সেনাপতি ছিলেন জেনারেল স্যার চার্লস নেপিয়ার। জয়লাভ করার সাথে সাথে তিনি লন্ডনে একটি তারবার্তা পাঠান ল্যাটিন শব্দের মাধ্যমে। শব্দটি হচ্ছে- 'পিকেভী' -অনুবাদ করলে এর অর্থ দাঁড়ায়, "আমি স্বাক্ষর করিয়াছি।ঃ ইংরেজি এই শানইড শব্দ থেকে মানুষের মুখে তামাসার ছলে পরিবর্তিত হয়ে দাঁড়ায় 'সিন্ধ'। এবার ইংরেজরা পৃথক মুসলিম অধ্যুষিত এবং শাসিত সিন্ধ অঞ্চলকে হিন্দু অধ্যুষিত বোম্বের সাথে জুড়ে দিল। তারা বললো, সিন্ধের লবণাক্ত পানি আর শক্ত শিলার ন্যায় কঠিন মাটির দেশ, তারা জমির ন্যায্য খাজনা দিতে পারবে না। তবু আমার দাদাজী দীর্ঘদিন সংগ্রাম চালালেন। কেননা তিনি লারকানা উন্নয়ন বোর্ডের তখনই মেয়র ছিলেন।

এই সময় সিন্ধকে বাঁচানোর জন্য আমার দাদাজী শুক্কুর বাঁধ নির্মাণের জন্য নির্মাণ কাজ শুরু করলেন। যেন সিন্ধের রুক্ষ সমতল ভূমি বারো মাস পানি পেয়ে উর্বর হয় এবং ফসল ফরতে পারে। আমার দাদাজীর স্বপ্ন সফল হয়। অল্প কয়েক বছরের মধ্যেই সিন্ধ শস্য ভাণ্ডারে পরিণত হয়। তখন তিনি সিন্ধকে পূর্বের ন্যায় পৃথক মুসলমানদের আবাস হিসেবে ফেরত পায়।

আমার দাদাজী এবং মুহম্মদ আলী জিন্নাহ সিন্ধের রাজধানী করাচিতে একই মাদ্রাসায় পড়াশুনা করতেন। এটি ছিল তখনকার দিনের পাকিস্তানের সেরা আধুনিক শিক্ষালয়। এই সিন্ধ মাদ্রাসা নির্মাণ করেন আমার স্বামী আসিফ আলী জারদারীর নানাজী হাজী আফেন্দী আমার দাদাজী এবং জিন্নাহ সাহেব বোম্বের মালাবার পাহাড়ে একে অন্যের খুব কাছাকাছি থাকতেন। শুধু তাই নয় জিন্নাহ সাহেব পাকিস্তানে গেলে সব সময় আমার দাদাজীর বাড়ি লারকানাতে থাকতেন।

সিন্ধকে পৃথক করার পর আমার দাদাজী ভারতের রাজনীতিতে এক কূট চাল চেলেছিলেন- যার শেষ পরিণতি পাকিস্তান সৃষ্টির আন্দোলন।

১৯৩৫ খ্রীস্টাব্দে সিন্ধের স্থানীয় সরকার চাইলো নিজেরাই আমরা নিজেদের শাসন করবো। এই মতামতে তারা এ্যাসেম্বী কল করলেন। ইংরেজ শাসকগণ



www.pathagar.com

প্রথম দিকে না করে– কিন্তু যখন দেখলো, তাদের এই দাবি না মেনে নিলে বিপদ হবে নিশ্চিত, তখন তারা অনুমতি দেয়। এর পাঁচ বছর পর ১৯৪০ সালে মুসলমানদের জন্য মুসলিম অধ্যুসিত অবিভক্ত ভারতে পাকিস্তান হবে পৃথক রাষ্ট্র।

এই মতামতের পক্ষে রায় দিয়ে পাকিস্তানের পাঞ্জাব প্রদেশের রাজনীতিতে তখন পাকিস্তানের স্বাধীনতার ডাক দেয়া হয়। এটাই লাহোর রেভুলেশন নামে পরিচিত। এ সময় শুধুমাত্র মুসলিম লীগই নয়– ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসও স্বাধীনতার ডাক দেয়। অর্থাৎ দুই দলের রাজনীতির মূল লক্ষ্য ছিল এক এবং তা হলো– স্বাধীনতা অর্জন করা। (স্বাধীন হলো এবং এরা দুধটো হলো দক্ষিণ এশিয়ার প্রধান দুই প্রতিদ্বন্দ্বী রাষ্ট্র)

স্বাধীনতার ডাক দেয়ার শত বছর পর অর্থাৎ ১৯৪৭ সালে লর্ড লুইস মাউন্ট ব্যাটেন যিনি ভারতবর্ষের ইংরেজ শাসনের শেষ ভাইসরয় ছিলেন, তিনি তার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। এবং তা হলো মস্তবড় ভারত দুই ভাগে বিভক্ত হবে– হিন্দু অধ্যুষিত ভূখণ্ডের নাম হবে ভারতবর্ষ আর মুসলিম অধ্যুষিত ভূখণ্ডের নাম হবে পাকিস্তান।

১৯৪৭ সালের ৩ জুন তিনি তার পরিকল্পনার কথা ঘোষণা করলেন। সেই পরিকল্পনা হলো স্বাধীনতা দেয়া হবে ১৯৪৭ সালের জুন মাসে। কিন্তু ভারতের স্বাধনিতার আদেশ বৃটিশ হাউজ অফ কমনস থেকে অনুমোদন পায় ১৯৪৭ সালের ১৮ জুলাই তারিখে।

কিন্তু চতুর মাউন্টব্যাটেন তার কূট চাল চালবার জন্য এই দিনটিকে পিছিয়ে নিয়ে গেলেন ১৯৪৭ সালের অগাস্ট মাসে এবং চটজলদি ভারত ছাড়ার জন্য এই দুই দেশের নেতাদের সীমানা বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত হয়ে উঠলেন এবং তার কূট চালের বাস্তব রূপ দেয়ার জন্য তিনি আনলেন সিরিল র‍্যাডক্লিফ নামের এক ভূমি পরিমাপবিদকে– যিনি এর পূর্বে কখনো ভারত বা পাকিস্তানে আসেননি। মাউন্টব্যাটেন তাকে মাত্র এক মাস সময় দিয়েছিলেন এই দুই দেশের ভূখণ্ডের মাপজোক ঠিক করে দেবার জন্য। সেই ভূখণ্ড ভাগ ছিল প্রহসনের– তাদের উদ্দেশ্য ছিল সীমান্ত বিরোধ যেন ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে আজীবন লেগে থাকে এবং তাদের সে উদ্দেশ্য সফল হয়েছে। ভারত-পাকিস্তান সর্বদা মুখিয়ে থাকে কাশ্মীর এবং সন্ত্রাসী হামলার মতো জঘন্য বিষয় নিয়ে।

সেই ভাগাভাগি প্রধান রাজনৈতিক দল দু'টোই মেনে নিল। সেই মতো হিন্দু অধ্যুষিত দেশটি হলো ভারত এবং মুসলিম অধ্যুষিত দেশটি হলো পাকিস্তান। কিন্তু পর্বতপ্রমাণ সমস্যা বাধিয়ে রেখে তারা বিদায় হলেন। সেই পর্বতপ্রমাণ সমস্যা সম্বলিত অভিজাত এলাকাগুলো হচ্ছে জুনাগড়, হায়দ্রাবাদ,


www.pathagar.com

কাশ্মীর এবং জম্মু। জুনাগড় এবং হায়দরাবাদ হিন্দু অধ্যুষিত ভারতে হলেও সেখানকার স্থানীয় সরকার ও জনগণ মুসলমান। স্বাভাবিকভাবেই পাকিস্তানের ওপর ভালোবাসটা তাদের বেশি। ফলে সামান্য কোনো ঘটনা ঘটলেই ভারতীয় সৈন্যরা সেখানে ছুটে আসে।

আবার মুসলিম অধ্যুষিত কাশ্মীরে শাসক হচ্ছে হিন্দু। কাশ্মীরীরা মেনে নিতে পারলো না ফলে হিন্দু-মুসলমানদের মত এবং নিজ নিজ অংশ অনুযায়ী এখন কাশ্মীর নিয়ন্ত্রণ করছে পাকিস্তান তার অধিকৃত অংশ আজাদ কাশ্মীর এবং ভারত অধিকৃত অংশ জম্মু ও কাশ্মীর।

বহু জল্পনা-কল্পনার পর নীল নকশার এই দেশ ভাগ পরবর্তীতে যুদ্ধ, সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, সন্দেহ, প্রতিহিংসা, বিশৃংখলা ইত্যাদি বাড়িয়ে দিল। দুই দেশের মাঝে এই বিভাগ রেখা প্রায় দুই কোটি মানুষকে আলাদা করে ফেলে। একটি পরিসংখ্যানে পাওয়া যায় দেশ ভাগের ঠিক এক সপ্তাহের মধ্যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় মারা যায় প্রায় ২ লাখ লোক।

কাশ্মীরে সৃষ্ট যুদ্ধের বিষয় নিয়ে ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘের প্রথম অধিবেশনেই কথা ওঠে এবং সেখানে ভারত চরমভাবে অভিযোগ করে যে পাকিস্তান কাশ্মীর দখল করার জন্য নানা রকমের চেষ্টা চালাচ্ছে। পাকিস্তান তার উত্তরে বললো, কাশ্মীর কাদের অধিকার যাবে তার সিদ্ধান্ত নেবে কাশ্মীরের জনগণ। কেননা ভারত সেই সূত্রে জুনাগড় এবং হায়দরাবাদ হিন্দু অধ্যুষিত জায়গা বলে তাদের ইচ্ছা মতোই নিয়ে নিয়েছে। এ কথায় ভারত সরকার চরমভাবে ক্ষিপ্ত হলো এবং পুরো মাত্রায় একটি যুদ্ধ করলো। পাকিস্তান তখন আজাদ কাশ্মীর অর্থাৎ তার অংশকে ঠিক রাখতে সমর্থ হয়- কিন্তু ভারত তার অংশ জম্মু-কাশ্মীরকে খুব একটা নিরাপদ রাখতে পারে নাই। ১৯৪৮ সালে জাতিসংঘ গণভোটের জন্য প্রস্তাব দেয়। কিন্তু সে প্রস্তাবে তৎকালীন ভারতের প্রধানমন্ত্রী জওহরলাল নেহেরু বললেন, গণভোটের আর এখন কোনো প্রয়োজন নেই।

১৯৪৭-৪৮ সালের ভারত-পাকিস্তানের যুদ্ধ নিয়ে বহু ধরনের রটনা আছে- তবে সত্য হলো সদ্যজাত শিশু দেশ পাকিস্তানের প্রতি ভারতের এমন আচরণ ঠিক ছিল না। স্বাধীনতার সাথে সাথে সব কিছুর ভাগ ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে হয়েছিল, কিন্তু মানব সম্পদ এবং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠু বণ্টন হয়নি। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়, বাংলা এলাকায় ১৩৩ জন সিভিল সার্জন ছিলেন এর মধ্যে মাত্র একজন পাকিস্তান এসেছিলেন চাকরির সুবাদে।

১৯৩১ সালে পাকিস্তানের মোট জনসংখ্যার ১০ ভাগ ছিল ভারতীয় রিফিউজি এবং এরা ছিলেন ভারতের হিন্দু অধ্যুষিত এলাকার অভিজাত


www.pathagar.com

মুসলমান। যখন সেনাবাহিনীর কথা এলো তখনও বৈষম্য দেখা দিল। পাকিস্তান পেলো ৪০টি আর্মড ফোর্সেস রেজিমেন্টের মধ্যে মাত্র ৬টি। ৪০টি আর্টিলারি রেজিমেন্টের মধ্যে মাত্র ৮টি এবং ২১টি ইনফেন্ট্রি ইউনিটের মধ্যে মাত্র ৮টি। এরপর বৈষম্য হলো সেনা সদস্য বিভাজনে। মোট বৃটিশ সেনাদের শতকরা ৩৭ জন পায় ভারত আর ৩০ জন পায় পাকিস্তান। অন্যদিকে ভারত মোট সৈন্যের মধ্যে পায় শতকরা ৪০ জন, নেভী শতকরা ২০ জন, এয়ার ফোর্সের ১০ জন। তাহলে বোঝা যাচ্ছে কত বড় বৈষম্য ছিল।

সৈন্য এবং আমলা ভাগাভাগির পর ভারত এবং পাকিস্তানের প্রাকৃতিক সম্পদ নিয়ে ভাগ শুরু হলো। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো হিন্দুকুশ পর্বতের পানির উৎসস্থল। বৃটিশ সরকার পশ্চিম পাঞ্জাবে এক বিশাল পানি সেচের প্রকল্প বসায় যার কারণে মরুময় রূক্ষ কঠিন শিলার পাঞ্জাব অঞ্চল এক সময়ে উর্বর কৃষি জমিতে পরিণত হয়। উল্লেখ্য যে, দেশ ভাগের পর দেখা গেল পাকিস্তানের পাঁচটি নদী এবং ক্যানালের উৎস ভূমি ভারতের সীমানার মধ্যে ছিল। দেশ ভাগের পর সুযোগ বুঝে ভারত সরকার পাকিস্তানের পাওনা পানিটুকু পর্যন্ত বন্ধ করে দিল। এতে করে লাহোর ও এই শহর সংলগ্ন আশপাশের জায়গাগুলোর সাধারণ জনগণ সামাজিক, অর্থনৈতিক এবং রাজনৈতিক নানা কাজে বাধাগ্রস্ত হতে থাকলো। সমস্যা নিয়ে শুরু হলো পর্যায়ক্রমিক আলোচনার পর আলোচনা– প্রায় ১২ বছর অর্থাৎ ১৯৬০ সাল পর্যন্ত, কিন্তু কোনো ফল হলো না, যে সমস্যা সেই সমস্যায় থেকে গেল।

দেশ ভাগে পাকিস্তান শিল্প-কারখানার দিক থেকেও বৈষম্যের শিকার হয়। তখন শুধুমাত্র পাটশিল্প ছিল পাকিস্তানের অর্থনীতির মূল ভরসা। সেই পাট উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল পূর্ব পাকিস্তান। কিন্তু উৎপাদিত পাটের শিল্পজাত দ্রব্য তৈরির কোনো শিল্প-প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠেনি। বৃটিশ শাসনামলে সমস্ত পাট কল তারা গড়ে তোলে কোলকাতায়। তখন এই দুই দেশের মধ্যে অর্থনৈতিক কোনো সম্পর্ক ছিল না। তাই উৎপাদিত পাটের শিল্পসম্মত কোনো দ্রব্য বানানো অসম্ভব হয়ে পড়ে। ঠিক একইভাবে পশ্চিম পাকিস্তানেও তুলা নিয়ে ছিল একই হয়রানি।

এই উপমহাদেশের ৩৯৪টি তুলার মিলের মধ্যে পাকিস্তানে ছিল মাত্র ১৪টি। এছাড়া এই উপমহাদেশে মোট ৫৭টি ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মাত্র ১টির মালিক ছিলেন মুসলমান। যদিও এই উপমহাদেশের এক চতুর্থাংশ আয়তনের দেশ ছিল পাকিস্তান– তবু তার শিল্পাঞ্চলের ভিত্তি ছিল মাত্র এক-দশমাংশ। রাজস্ব আয় থেকে পাকিস্তান পেয়েছিল মাত্র শতকরা ১৭ ভাগ। অর্থাৎ সদ্যজাত দেশ হিসেবে পাকিস্তান যেমন সর্ববিষয়ে অসহায় শিশু– ভারত


www.pathagar.com

তেমন মোটামুটি সামর্থ্যবান তরুণ, অন্তত গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থাকে চালিয়ে নেয়ার জন্য।

রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডে ছিল আরো সমস্যা। তৎকালীন সব মুসলিম লীগ নেতারাই ছিলেন ভারত থেকে উঠে আসা। তারা ছিলেন হিন্দু অধ্যুষিত ভারতের সংখ্যালঘু মুসলিম এলাকার। তারা কেউ সদ্য স্বাধীন আধুনিক রাষ্ট্র পাকিস্তানের বাসিন্দা ছিলেন না।

সবার উপরে বিরাজমান সমস্যা ছিল ভৌগোলিক সীমানার। ভৌগোলিক সীমানা অনুযায়ী পাকিস্তানের অবস্থানও ছিল অদ্ভুত। বিশাল ভারতের দুই পাশে দুই পাকিস্তান। পূর্ব পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম পাকিস্তান (পাকিস্তান)। মাঝে প্রায় হাজার মাইল সমুদ্র পথ। এখানে একটি বিষয় আরো লক্ষ্যণীয় যে, এই দুই দেশের জনগণের মধ্যে একমাত্র ধর্ম ছাড়া আর কোনো বিষয়েরই মিল ছিল না। যেমন– ভাষা, জাতীয়তা, পোশাক-পরিচ্ছদ এবং খাদ্যাভ্যাস, কোনো কিছুরই মিল ছিল না।

পৃথিবীর অনেক বড় বড় রাজনৈতিক গবেষক বলেন, 'ভারত ও পাকিস্তান একই বৃটিশ শাসনাধীন ছিল, তারা একই সময়ে, মাত্র একদিন আগে-পিছে স্বাধীন হয়েছে, কিন্তু সে দু দেশের মধ্যে ধর্মীয় পার্থক্যের কারণে আজ পাকিস্তানে গণতন্ত্র বিপন্ন এবং ভারতে প্রতিষ্ঠিত। কিন্তু আমি বলবো– সে ধারণা মামুলী এবং নিম্ন মানসিকতার।

দেশের ভাগের পর পাকিস্তান স্বাধীন হলো ঠিকই, কিন্তু এর ভাগ্যে নেমে এলো দু-দুটি আঘাত, যে আঘাতের কারণে আজও পাকিস্তান বিপর্যস্ত। এর প্রথমটা ছিল নেতার মৃত্যু। স্বাধীনতার এক বছর পর পাকিস্তানের স্থপিতর মৃত্যু হয়। তিনি রেখে যেতে পারেননি কোনো উপযুক্ত শাসক বা কোনো নৈতিক দায়-দায়িত্ব বহনকারী নেতা– যার হাত ধরে গণতন্ত্র স্থায়ী রূপ পেত। দ্বিতীয়তঃ ভারতের জাতীয় কংগ্রেস যেমন প্রদেশগুলোতে তৃণমূল পর্যায়ে তাদের স্বায়ত্তশাসনের মাধ্যমে গণতন্ত্রের চর্চা এবং আইনের শাসনকে নিয়ে যেতে পেরেছিল পাকিস্তান তা পারেনি।

পাকিস্তান অবশ্য আরো একটি রাজনৈতিক ফাঁদে পড়ে যায়। যার কারণে অর্থনৈতিকভাবে বিপর্যয়ে পড়ে যায় ফলে গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত হয়। প্রথমত, ১৯৪৮ সালে ভারতের মনোভাব। প্রথম থেকেই ভারত পাকিস্তানের অর্থনীতিকে ধ্বংস করার জন্য, গণতন্ত্র চর্চা ব্যাহত করার জন্য যুদ্ধাংদেহী ভাব প্রদর্শন করে। ফলে শিশু পাকিস্তানকে ভারতের সাথে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়তে হয় ১৯৪৮ সালে। এরপর থেকে পাকিস্তান নিজেকে বাঁচাতে তার বাজেটের বেশিরভাগ অর্থই প্রতিরক্ষা খাতে খরচ করতো। পাকিস্তানের রাজস্ব আয় কম কেননা জনগণ


www.pathagar.com

স্বল্পসংখ্যক– ফলে অর্থনৈতিক বিপর্যয় দেখা দিল। অন্যদিকে ভারতের সৈন্যদের পেছনে ছিল বিশাল জনসংখ্যার বিশাল রাজস্ব প্রদানকারী জনগণ। এছাড়া তারা বাজেটে প্রতিরক্ষা খাতে ব্যয়ও করতো কম। যার জন্য ভারতের অর্থনীতি বা গণতন্ত্র চর্চায় কোনো ব্যাঘাত ঘটেনি। অবিশ্বাস্য হলেও সত্য যে, ১৯৪৭-১৯৫০ সাল পর্যন্ত বাজেটের ৭০ শতাংশ ব্যয় হতো প্রতিরক্ষা খাতে। এর প্রচলন ঘটিয়ে যান পাকিস্তানের প্রথম প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। পরবর্তীকালে সবাই সেই পথ অনুসরণ করেন। তিনি বলতেন– দেশের প্রতিরক্ষা প্রথম ও প্রধান বলে আমাদের বিবেচনা করা উচিৎ। কেননা প্রতিরক্ষার জন্য যদি শক্তিশালী সামরিক বাহিনী না থাকে তাহলে মানায় না। একটি সুন্দর, শক্তিশালী সামরিক বাহিনী অর্থ হচ্ছে সে জাতি সুসভ্য এবং ধনী। তার এই কথাগুলোতে উজ্জীবিত হলেন পরবর্তী প্রধানমন্ত্রীগণ। কিন্তু এই ধারণা ছিল ভুল। তখন সমগ্র পাকিস্তানে দিনে দিনে সামরিক বাহিনীর জনপ্রিয়তা দ্রুত বাড়তে থাকে। গণতন্ত্র চর্চা বাড়ানো বা দেশে নির্বাচন হবে তারপর নির্বাচিত সরকার এসে সিদ্ধান্ত নেবে দেশের ভালো-মন্দ– তা কিন্তু আর হলো না। ফলে সামাজিকতা থেকে শুরু করে রাজনীতি, অর্থনীতি, শাসনকার্য পরিচালনা, শিক্ষা ব্যবস্থা, আইন, ধর্ম– সবকিছুর মধ্যে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপ শুরু হয়ে গেল। উন্নয়ন ব্যাহত হতে থাকে। অর্থাৎ গণতন্ত্র চর্চা চিরকালের মতো বিদায় হয়ে সামরিক বাহিনীর কেন্দ্রিক শাসন ব্যবস্থার দেশ হয়ে উঠলো নতুন পাকিস্তান।

দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো– মুদ্রার ওপিঠ অর্থাৎ ভারতীয়দের সৌভাগ্য। এখানেই দুই দেশের গণতন্ত্র চর্চা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের পার্থক্য। তা হলো দেশ স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের কেন্দ্রীয় নেতাদের সবাই বেঁচেছিলেন দীর্ঘদিন। ভারতের সৌভাগ্য যে, এই দেশটির জনক বিশ্বখ্যাত রাজনীতিবিদ এবং তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পন্ডিত জওহরলাল নেহেরু দেশ স্বাধীন হওয়ার পর অনেকদিন জীবিত ছিলেন যা একটি দেশকে গড়ে তোলার জন্য একজন নেতার পক্ষে যথেষ্ট সময়। অন্তত ভারতের মতো এক বিশাল রাষ্ট্রকে গড়ে তোলার জন্য।

অন্যদিকে পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠাতা কায়েদ-ই-আযম (মহান নেতা) মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ, দুর্ভাগ্যবশত মৃত্যুবরণ করেন স্বাধীনতার মাত্র এক বছর পর ১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে। অথচ তিনি এই স্বাধীন দেশটাকে কিভাবে কোন পথ ধরে এগিয়ে নিয়ে যাবেন তার একটা পরিকল্পনা করে ফেলেছিলেন। যা তৎকালীন পার্লামেন্টে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সম্মতিক্রমে তিনি করেছিলেন। অথচ দুর্ভাগ্য যে জাতীয়তাবাদে উজ্জীবিত জনগণের চোখের মণি অবিসংবাদিত নেতা স্বাধীনতার মাত্র এক বৎসর পরই মারা গেলেন। কেউ বলতে পারবে না


www.pathagar.com

যদি তিনি মারা না যেতেন, যদি তিনি মাত্র এক দশক বেঁচে থাকতেন তাহলে আজকের পাকিস্তান কোথায় যেত, এই আধুনিক সামরিক বাহিনীর পাশাপাশি যদি শক্তিশালী গণতান্ত্রিক সরকার থাকতো। কেউ ভাবতে পারতো না পাকিস্তানের রাজনীতি এবং সামরিক বাহিনীতে ধর্মীয় উন্মাদনার চরমপন্থী বা উগ্র মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের অবস্থা কি হতো! তিনি মোটেও এসব ভালোবাসতেন না। এসবের ঘোর বিরোধী ছিলেন। অথচ তার বিপরীত চিন্তাধারার পথভ্রষ্ট মানুষেরাই পাকিস্তানের ইতিহাসের মোট ৬০ বছর দেশটিতে শাসন ব্যবস্থায় তারা পদচারণা করেছে।

যেভাবেই হোক, ভারত পাকিস্তানের অনেক আগেই গণতন্ত্রের দিকে ঝুঁকে পড়ে। যেটি হচ্ছে ভারতে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা এবং চর্চার শিকড় রোপণ। যে রোপিত বীজের ফসল হচ্ছে ১৯৪৯ সালের গণতন্ত্র চর্চার উত্তরণের প্রথম ধাপ সাধারণ নির্বাচন। অথচ পাকিস্তানের এই পর্যায়ে আসতে সময় লেগেছিল স্বাধীনতার পর প্রায় দশ বছর। এর দু' বছর পরই ঘটে গেল সামরিক অভ্যুত্থান। অর্থাৎ পাকিস্তান এ সময় প্রায় বিশ বছর পিছিয়ে গেল।

ভারত যখন নির্বাচন শেষ করে ১৯৪৯ সালে অবাধ ও নিরপেক্ষ সুন্দর নির্বাচনের মাধ্যমে দেশকে গণতন্ত্রের মাধ্যমে একটি সুন্দর দিকে নিয়ে যাচ্ছে তখন পাকিস্তানের শুধু নির্বাচনে যেতে সময় লাগলো ১৯৭০ সাল পর্যন্ত। ততদিনে ভারতে প্রায় একটি জেনারেশন গণতন্ত্রের আবহে পেরিয়ে এসেছে। মূলকথায় বলা যায়– পাকিস্তানকে ভারতের মতো শুধুমাত্র গণতান্ত্রিক ধারাতে আসার জন্য সময় লেগে ছিল প্রায় এক জেনারেশন।

দেশ ভাগের সময় কিন্তু, পাকিস্তানের নেতারা একত্রে বসে দেশের সংবিধান কেমন হবে তা রচনা করেছিলেন। এমনকি সরকার কেমন করে গঠন করা হবে, তা পর্যন্ত ঠিক করা হয়েছিল। কিন্তু সব কিছু বিপন্ন হলো বা মুখ থুবড়ে পড়লো দুই পাকিস্তানের মাতৃভাষা নিয়ে। যা পাকিস্তানের পরবর্তী ইতিহাসের বাঁক নেয়ার এক প্রধান বিষয়। পশ্চিম অঞ্চলের পাকিস্তানের জনগণ উর্দুভাষী আর পূর্বাঞ্চলের জনগণ বাংলা ভাষী– এজন্য পশ্চিমঅলারা চাইলো উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা আর অন্যদিকে পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ বললো বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা। এই বিষয়কে কেন্দ্র করে ভয়াবহ সব সংঘাত হয়। পরে দু'পক্ষের মধ্যে স্থিতিশীলতা আসে এবং সিদ্ধান্ত নেয়া হয় যে উর্দু এবং বাংলা –দু'টোই হবে নতুন পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।

১৯৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে যখন পাকিস্তানের জনক মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ মারা যান– তখন লিয়াকত আলী খান একমাত্র নেতা হয়ে দাঁড়ালেন। তাই তিনিই হলেন তখন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী। কায়েদ-ই-আযম মোহাম্মদ


www.pathagar.com

আলী জিন্নাহ পাকিস্তান স্বাধীনতা লাভের পর তিনি ছিলেন গভর্নর জেনারেল। সংবিধানের আইন অনুযায়ী গভর্নর জেনারেল হবেন দেশের প্রধান এবং প্রধানমন্ত্রী হবে সরকার প্রধান। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর মৃত্যুর পর খাজা নাজিমুদ্দীন হলেন পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল। ১৯৫৬ সালে সংবিধান থেকে গভর্নর জেনারেল পদকে লোপ করে প্রেসিডেন্ট করা হয়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ তাঁর প্রজ্ঞার বলে খাজা নাজিমুদ্দীনকে তাঁর উত্তরসূরী হিসেবে মৃত্যুর অনেক আগেই মনোনীত করে রেখে গিয়েছিলেন। কিন্তু লিয়াকত আলী খানের দুর্বল সরকার পরিচালনার কারণে তিনি ১৯৫১ সালেই নিহত হন।

লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর যে দু'জন প্রধানমন্ত্রী আসেন, যেমন- মুহাম্মদ আলী বোগড়া (১৯৫৩-১৯৫৫) এবং চৌধুরী মুহাম্মদ আলী (১৯৫৫-১৯৫৬), তারা দু'জনেই অত্যন্ত দুর্বল ছিলেন। এরপর পুনরায় গোলাম মোহাম্মদ গভর্নর জেনারেল হয়ে আসেন, কিন্তু ১৯৫৫ সালে মেজর জেনারেল ইস্কান্দার মির্জা ক্ষমতা দখল করেন।

১৯৫৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে নতুন সংবিধান রচনা করা হলো। তারপর সংসদের অধিবেশন ডাকা হলো এবং সেই অধিবেশনে সর্বসম্মতিক্রমে জেনারেল মির্জাকে পাকিস্তানের প্রথম প্রেসিডেন্ট হিসেবে নির্বাচিত করা হয়। কিন্তু প্রথম দুই বৎসরেই রাজনৈতিক সহিংসতা দেখা দেয়। এর মধ্যে মাত্র মাস আগে-পরে দু'জন প্রধানমন্ত্রী বিদায় হন। উপায়ান্তর না দেখে, ১৯৫৮ সালের অক্টোবর মাসে জেনারেল মির্জা সামরিক আইন জারি করলেন। এটাই হলো স্বাধীনতার পর পাকিস্তানের রাজনীতিতে সবচেয়ে বড় বিপর্যয়। জেনারেল মির্জার কেবিনেটে মাত্র ১২ জন সদস্য ছিলেন। তিনি সংবিধানকে সংশোধন করার তাগাদা দিলেন। এই ১২ জনের মধ্যে মাত্র ৪ জন ছিলেন বাঙালি অর্থাৎ পূর্ব পাকিস্তানের। এ সময় হঠাৎ করেই একদিন সেনাপ্রধান জেনারেল আয়ুব খান এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে ক্ষমতায় আসেন এবং মির্জাকে নির্বাসনে পাঠান।

১৯৬০ সালে জেনারেল আয়ুব খান 'বেসিক ডেমক্রেসি' নামে এক মতামত এনে সাধারণ নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানান। কিন্তু তাতে তিনি তেমন সাড়া পেলেন না। কেননা পাকিস্তানবাসী বুঝে ফেলেছিল যে, এইসব নির্বাচিত স্থানীয় প্রতিনিধিদের কোন ক্ষমতা থাকবে না পার্লামেন্টে। এরপর আর কোনা পদক্ষে গ্রহণ করেননি- তবে এক সমস্যাসঙ্কুল রেফারেন্ডামের মাধ্যমে তিনি দেশের প্রেসিডেন্ট হলেন।

১৯৬২ সালে পাকিস্তানের জন্য পুনরায় নতুন সংবিধান রচনা করা হলো। এতে সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ করা হয়। জেনারেল আয়ুব বললেন,


www.pathagar.com

রাজনৈতিক দল অর্থই হচ্ছে এরা অসৎ, অসভ্য, অপরাধী এবং দুর্নীতিবাজ। কিন্তু রাজনৈতিক দলগুলো বসে থাকেনি, তারা দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলে। আন্দোলনের কাছে হার মেনে রাজনৈতিক কর্মকাণ্ড চালিয়ে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। কিন্তু তিনি তাদের বুঝিয়ে-সুঝিয়ে মধ্যবর্তী এক প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে নির্বাচিত হলেন এবং দেশের নামের পূর্বে যে 'ইসলামিক' শব্দটি ছিল তা তিনি উঠিয়ে দিতে বললেন। কিন্তু রাজনৈতিক দলের নেতারা বললেন যে, না এই ইসলামিক শব্দ কাটাকাটির কোনো প্রয়োজন নেই। এতে দেশকে সামাল দিতে পারবেন না। অতঃপর তিনি আবার ১৯৬৩ সালে ইসলামি শব্দটি দেশের নামের পূর্বে বসান।

আয়ুব খান বিশ্বাস করতেন যে, অর্থনীতিই গণতন্ত্রকে পরিপূর্ণ করতে পারে। তাই তিনি দেশের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করার জন্য একটি পরিকল্পনা কমিশন গঠন করলেন এবং সেই কমিশনের তিনি হলেন চেয়ারম্যান।

১৯৬০ সালে আন্তর্জাতিক অর্থনৈতিক উন্নয়ন ফোরাম থেকে জেনারেল আয়ুব খানকে জানানো হলো, গণতান্ত্রিক নেতা, গণতন্ত্রের চর্চা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা ছাড়া অর্থনৈতিক উন্নয়ন বা সমৃদ্ধি– কোনোটাই সম্ভব নয়। অর্থনৈতিক উন্নয়নের জন্য চাই সাধারণ মানুষের শ্রেণীর উন্নয়ন, সে হোক নিম্ন বা মধ্য বা উচ্চবিত্তের মানুষ। তবেই গণতান্ত্রিক উন্নয়ন সম্ভব।

১৯৬৫ সালে ফাতিমা জিন্নাহ, যিনি কায়েদ-ই-আযম আলী জিন্নাহর বোন, তিনি জেনারেল আয়ুবকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য চ্যালেঞ্জ করলেন। তিনি অসংখ্যা সমর্থকসহ সারা পাকিস্তান ঘুরে বেড়ালেন। তিনি জনগণকে বললেন, আয়ুব একজন স্বৈরাচারী এবং সাথে সাথে এও দাবী করলেন যে, যদি জনগণ তাকে ভোট দেয়, তাহলে তিনি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনবেন। যদিও ফাতিমা জিন্নহা নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেননি– তবু তিনি আয়ুব খানকে বুঝিয়ে দিয়েছিলেন যে, আয়ুবের জনসমর্থন বা জনপ্রিয়তা পাকিস্তানে কতটুকু।

আমার বাবা জুলফিকার আলী ভুট্টোর সাথে ফাতিমা জিন্নার ছিল বন্ধুত্ব। তিনি নির্বাচনে হেরে যাওয়ার পর যখন করাচি এলেন তখন আমার বাবা তাকে ডেকে আমাদের বাড়িতে রাজনৈতিক তৎপরতার নানারকম আলাপ-আলোচনা করেন। কেননা অনেক আগে থেকেই জিন্নাহ'র পরিবারের সাথে আমাদের পরিবারের ছিল মধুর সম্পর্ক।

এরপর হঠাৎ করে ফাতিমা জিন্নহা রহস্যজনকভাবে মারা গেলেন। স্তম্ভিত পাকিস্তানবাসী কেউ কেউ বললো, এ মৃত্যু আয়ুব খান ঘটিয়েছে তার ভাড়া করা গুন্ডাদের দ্বারা। ১৯৬৫ সালে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের পর আমার বাবা আয়ুবের


www.pathagar.com

কেবিনেট থেকে পদত্যাগ করেন। আয়ুব খান কিন্তু বেশ সংস্কারবাদীর আধুনিক মন-মানসিকতার স্বৈরাচারী ছিলেন। ১৯৫৮ সালে আমার বাবার যখন ৩০ বছর বয়স, তখন তিনি তাঁর কেবিনেটে যোগ দেন এবং ঐ সময়ে আমার বাবাই ছিলেন দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে কনিষ্ঠতম কেবিনেট মন্ত্রী। তিনি পাশ্চাত্য শিক্ষায় শিক্ষিত ছিলেন এবং সিন্ধ অঞ্চলে আমাদের বাড়ির সন্তান হিসেবে তিনি ছোটবেলা থেকে যে আদব এবং সম্মান পেয়ে বড় হয়েছিলেন তা ভুলবার নয়। কেননা ঐ প্রদেশে আমার দাদাজীর সুনাম-সুখ্যাতি, শুক্কুর বাঁধ নির্মাণের ইতিহাস, সর্বোপরি স্বাধীন সিন্ধ অঞ্চল প্রতিষ্ঠার দাবি পেশ করার তিনি ছিলেন এক অবিসংবাদিত নেতা। আমার দাদাজীই অনেককাল আগে প্রথম মুসলমানদের জন্য মুসলমান শাসিত পৃথক রাষ্ট্রের দাবি উত্থাপন করেন। আয়ুব খানকে নিয়ে লক্ষ্য করার মতো একটি বিষয় ছিল, তা হলো, আর যাই হোক আয়ুব খান স্বৈরাচার বা একনায়ক সামরিক জান্তা– যা-ই হোক না কেন তার এই সংস্কারের নামে সামরিক শাসন চালানোর ফলে গণতন্ত্রের সমূহ ক্ষতি হলেও সাধারণ জনগণ বেশ উপকৃত হয় এবং এর জন্য মোটামুটি জনপ্রিয় হয়েও উঠেছিলেন।

এই সময় জাতীয় বিষয়গুলোর সাথে আন্তর্জাতিক বিষয়গুলো নিয়ে প্রায় সংঘর্ষ বেধে যেতে লাগলো। ভারতের সাথে এই সময় দিনের পর দিন সম্পর্কের অবনতি ঘটতে থাকলো। এলো ১৯৬৪ সাল। দুটো বিষয় নিয়ে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে আগুন লেগে যায়। প্রথমত, এক গুরুত্বপূর্ণ মুসলিম ধর্মের ওপর আঘাত। জানা যায়, ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের শ্রীনগর শহরের এক মসজিদ থেকে মহানবী হযরত মুহম্মদ (সা.)-এর মাথার চুল চুরি হয়ে গেছে। পাকিস্তানীরা ভারত সরকারের ওপর প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করলো। কারণ এর জন্য ভারত নিয়ন্ত্রিত কাশ্মীরের জনগণ, ভারতের সেনা ও পুলিশ বাহিনী এবং ভারত সরকার দায়ী।

১৯৬৪ সালে তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী পণ্ডিত জওহরলাল নেহেরু মারা যান। তিনি মারা গেলে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী লাল বাহাদুর শাস্ত্রী ভারতের প্রধানমন্ত্রী হন। কিন্তু লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জওহরলাল নেহেরুর মতো অত জনপ্রিয়তা বা জনসমর্থন কোনোটাই ছিল না।

যার ফলে পাকিস্তানের জনগণ এবং সরকার শাস্ত্রীকে প্রথম থেকেই বিরূপ চোখে দেখতে থাকে। উল্টোভাবে লাল বাহাদুর শাস্ত্রীও তাই তিনি ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে ভারত-পাকিস্তানের সম্পর্কের মধ্যে তিক্ততা আরো বাড়লো– কেননা শাস্ত্রী অনেকগুলো কঠিন কঠিন পদক্ষেপ নিয়েছিলেন পাকিস্তানের


www.pathagar.com

বিরুদ্ধে। এমনকি শাস্ত্রীর মদদে ভারতীয় সেনা সদস্যগণ এবং উগ্র জনগণের একাংশ জম্মু এবং কাশ্মীরের জাতিসংঘ নির্ধারিত সীমানা চিহ্ন অতিক্রম করে এসে এলাকা দখল করতে থাকে। পাকিস্তান বার বার নিষেধ করা সত্ত্বেও ভারতীয়রা কানে নেয় না। তারা কাশ্মীর ভবিষ্যতে তাদের নিয়ন্ত্রিত রাজ্য হবে এই স্বপ্ন দেখতে থাকে।

এর মধ্যেই কুর্চ সীমান্তের র‍্যান্ন নামক জায়গায় হঠাৎ করে ক্ষুদ্র আকারের যুদ্ধ বেধে গেলো। এবং হঠাৎ বেধে যাওয়া এই ছোট্ট যুদ্ধই অল্পদিনের মধ্যে বিশাল আকার ধারণ করলো। অল্পদিনের মধ্যে আবার বৃটিশ সমর্থনে জাতিসংঘের হস্তক্ষেপে যুদ্ধ বন্ধ হয়। কিন্তু শেষ পর্যন্ত দেখা গেল জয় হয়েছে পাকিস্তানের। এই একই ধরনের অবস্থা হয়েছিল ১৯৬২ সালের চীন-ভারত যুদ্ধে। পাকিস্তানীরা স্বাভাবিকভাবেই ভাবতে লাগলো যে, ভারত দিনের পর দিন দুর্বল হয়ে পড়ছে। এর সাথে পুনরায় ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে মানসিক সংঘর্ষ শুরু হয়। এই সংঘর্ষ যুদ্ধে রূপ নিলো ১৯৬৫ সালের ৬ সেপ্টেম্বরে। সেই সব দুর্বিসহ দিনগুলো ছবির মতো আজও আমার মনে পড়ে পরিষ্কার। বাড়ির মধ্যে ট্রেঞ্চ কেটে, রাস্তা বন্ধ করে দিয়ে যেন বোমা না পড়ে তার ব্যবস্থা নিতাম আমরা। আমরা বোমারু বিমানের শব্দ শুনতে পেতাম। সেগুলো আমাদের মাথার ওপর দিয়ে ঘুরতো। সম্ভবত ১৯৬৫ সালের যুদ্ধ পাকিস্তানীদের জন্য সবচেয়ে সুন্দর সময়, গৌরবের সময়– পাকিস্তানের জনগণ এবং সেনাবাহিনীর জন্য। তারা লাহোরকে বাঁচানোর জন্য বুকে বোমা বেঁধে মাটিতে শুয়ে ভারতীয় ট্যাংক বহরকে ধ্বংস করে দেয়। বিমান বাহিনীর তরুণ পাইলটরা আকাশসীমাকে রক্ষা করতে গিয়ে জীবন দেয়। আনন্দের ব্যাপার এই যে, সমগ্র জাতি তখন এক জায়গায় এসে দাঁড়ালো– নিজ দেশকে রক্ষা করার জন্য।

এর মধ্যেই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় ১৯৬৫ সালের ২২ সেপ্টেম্বর যুদ্ধ বন্ধের জন্য বসলো। ১৯৬৬ সালের জানুয়ারি মাসে তাসখন্দে বসে নিয়মসিদ্ধ যুদ্ধ বন্ধের জন্য বলা হয় এবং ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণ করা হয় ক্ষয়ক্ষতি অনুযায়ী। পাকিস্তান-ভারতের সাধারণ জনগণ তারা পরস্পর পরস্পরের সরকারকে দোষী করতে থাকলো। পাকিস্তান বললো, এতো অল্প সময়ে এতো সহজে ভারতকে ছেড়ে দেয়াটা ঠিক হয়নি। পাকিস্তানীদের জ্বালাময়ী মনোভাব বুঝে আমার বাবা পদত্যাগ করলেন প্রেসিডেন্ট আয়ূব খানের কেবিনেট তেকে। কিন্তু আয়ূব খান দেশের এমন ক্রান্তিকালে পদত্যাগ না করার জন্য আমার বাবাকে অনুরোধ করলেন।


www.pathagar.com

৬ মাস পর।

আমার মা আমার জন্মদিন পালনের জন্য আয়োজন করলেন। সারা ঘর বেলুন, ফেস্টুন, বাতি, পুতুল দিয়ে সাজানো হলো। কেক-পেস্ট্রি আনা হলো। আমি আনন্দের সাথে আমাকে দেয়া জন্মদিনের উপহারগুলো খুলে খুলে দেখছিলাম। ঐ সময় আমার মা আমাকে একটি হাইহিল্ড স্যান্ডেল উপহার দিয়েছিলেন। আমার সে কি আনন্দ। হঠাৎ আমার বাবা ঘরে ঢুকলেন। তিনি বেশ চিন্তিত। আমরা অবাক হলো, বুঝলাম সাংঘাতিক একটা কিছু ঘটেছে।

বাবা আমাদের পাশের ঘরে নিয়ে গেলেন এবং বললেন যে, তিনি আয়ুব সরকারের কেবিনেট থেকে পদত্যাগ করেছেন। জেনারেল আয়ূব খান অবশ্য বাবাকে অনেক অনুরোধ জানিয়েছিলেন পদত্যাগ না করার জন্য। কিন্তু বাবা বলেছিলেন, তাশখন্দ চুক্তির পর প্রায় ছ'মাস পার হয়ে গেছে, আমার দেয়া প্রতিশ্রুতি মতো আমি এখন যেতে চাই।

বাবার এই সিদ্ধান্তই তাকে রাজনীতির উজ্জ্বল আলোতে নিয়ে আসে। তখন আমার বাবার বয়স মাত্র ৩৬ বছর। উল্লেখ্য বাবা আয়ুব খানের কেবিনেট থেকে ফিরে আসার সাথে সাথে আয়ূব খান হঠাৎ করে বেপরোয়া হয়ে উঠলেন।

জেনারেল আয়ূব খানের কেবিনেটে বাবা ছিলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী। পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা অবস্থাতেই তিনি পদত্যাগ করেন। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করেছিলেন যে পাকিস্তানের তৃণমূল পর্যায়ে তিনি গণতান্ত্রিক আন্দোল নিয়ে যাবেন।

পরে দেশে গণতন্ত্র এলে স্বৈরাচার বা একনায়ক সামরিক শাসনকে চিরকালের জন্য বিতাড়িত করবেন। এজন্য ১৯৬৭ সালে তিনি পাকিস্তান পিপলস পার্টি নামে একটি রাজনৈতিক দল পড়লেন– যেখানে তিনি সুশীল সমাজ, শিক্ষিত শ্রেণী, বুদ্ধিজীবী এবং একেবারে তৃণমূল পর্যায়ের নেতাদের রাখলেন। ইতোমধ্যে বাবা ছাত্র এবং যুব সমাজে রীতিমতো চোখের মণি হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মন্ত্রমুগ্ধ বক্তৃতা জাতীয়তাবাদের বলিষ্ঠ চেতনা, সর্বপরি বাক স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি সকল স্তরের মানুষকে নাড়া দিল। শুধু তাই নয়– সমাজের সব শ্রেণীর জনসাধারণ– কি ধনী, কি দরিদ্র, সবাই তাঁর ডাকে সাড়া দিল। এক শ্রেণীহীন স্বচ্ছল অর্থনীতির সুন্দর সুখী ও সমৃদ্ধশালী দেশ গড়ার জন্য।

তিনি যেখানে যেতেন, সেখানে মনোমুগ্ধকর ভাষণ দিতেন এবং সেখানেই মানুষ তাঁর দলে যোগ দিতো।



www.pathagar.com

১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে আয়ূব বিরোধী আন্দোলনে নেতৃত্ব দানকারী দল ছিল পি.পি.পি. অর্থাৎ পাকিস্তান পিপলস পার্টি। আয়ূব খান তখন বিরোধীদেরকে হাতে আনার জন্য সকল বন্দী রাজনৈতিক নেতাদের মুক্তি দিতে চাইলেন। এর মধ্যে প্রধান ছিলেন পূর্ব পাকিস্তানের আকাশচুম্বী জনপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। কিন্তু সেই চেষ্টা আয়ূব খানের হিতে বিপরীত হয়ে গেল এবং জনগণের সেই প্রবল বিরোধিতা এক সময় মস্তবড় এক শক্তিতে পরিণত হলো। লাভ হলো পাকিস্তান পিপলস পার্টির। ধীরে ধীরে এই দল সাধারণ থেকে উচ্চবিত্ত, ধনী-দরিদ্র; হিন্দু-মুসলমান, বাঙালি-পাকিস্তানী সবার প্রিয় দল হয়ে দাঁড়ালো।

এ সময় আয়ুব শাহীর মদদে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়– তখন আমার বাবা লারকানায় অনশন শুরু করেন। অনতিবিলম্বে পাকিস্তানের আইনজীবী, সাংবাদিক, ছাত্রসমাজ, মহিলা, বুদ্ধিজীবী এবং শ্রমিক ও রাজনৈতিক নেতা-কর্মীগণ ছুটে আসেন। তারা বাবার অনশন ভাঙালো এবং দলে দলে পাকিস্তান পিপলস পার্টিতে যোগ দিল।

আয়ূব সরকারের বিরুদ্ধে জনতার এমন বিরুদ্ধাচরণ দেখে আয়ূব খান মাথা ঠিক রাখতে পারলেন না। অন্যান্য আর দশজন জেনারেলের মতো ক্ষমতায় বসে থাকার জন্য দ্বিতীয় বার দেশে সামরিক শাসন জারি করলেন। কিন্তু জনগণের ক্রোধ তখনও বিন্দুমাত্র নষ্ট হয়ে যায়নি। তা বেড়ে যেতে থাকলো। আয়ূব খানও দমলেন না বরং তিনি তাঁর নিজ মনে রচিত কঠোর আইনগুলো একের পর এক জারি করতে থাকলেন। এরপর হঠাৎই ১৯৬৮ সালের ২৫ মার্চ তিনি পদত্যাগ করলেন এবং তারই পদাঙ্ক অনুসরণকারী আর এক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ক্ষমতা বুঝিয়ে দিলেন। জাতীয় এবং প্রাদেশিক সকল অ্যাসেম্বলী লোপ করা হলো। সংবিধান রদবদল হতে থাকলো এবং সকল রাজনৈতিক দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। জেনারেল আয়ূবের ঘোষিত "উন্নয়নের দশকঃ-এর সমাপ্তি ঘটলো এবং পাকিস্তান তখন ধীরে ধীরে ধ্বংসের দিকে পা বাড়াতে থাকলো– কেননা ক্ষমতায় তখন সামরিক শাসন পরিচালনাকারী দ্বিতীয় আর এক জেনারেল ইয়াহিয়া খান।

১৯৬৯ সালের নভেম্বর মাস পর্যন্ত সামরিক শাসন চললো এবং সে বছর শেষের দিকে অর্থাৎ অক্টোবরে সরাসরি নির্বাচন হবে এই প্রতিশ্রুতি দিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। তখন রাজনৈতিক দলগুলো জনসংখ্যার ভিত্তিতে পার্লামেন্টের আসন বণ্টনের কথা বললো।

জেনারেল ইয়াহিয়া দাবি মেনে নিলেন এবং পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানে সেই মতো নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিতে থাকলেন। জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন বণ্টন


www.pathagar.com

অর্থই হচ্ছে পূর্ব পাকিস্তানের পার্লামেন্টে আসন সংখ্যা বেড়ে যাওয়া। ১৯৭০ সালের মার্চে, জেনারেল ইয়াহিয়া এক লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের আদেশ দিলেন। এই লিগ্যাল ফ্রেম ওয়ার্কের অধীনে নতুন যে অ্যাসেম্বলী হবে তা সংবিধান অনুযায়ী একই সাথে একটি অ্যাসেম্বলী একটি পার্লামেন্ট হবে। ১২০ দিনের মধ্যে নতুন সংবিধান চাই- এমন একটি জরুরি আদেশ দিলেন জেনারেল ইয়াহিয়া খান। অনেকেই ভয় পেয়ে গেলেন, কেননা তারা ভাবলেন যে, যদি ১২০ দিনের মধ্যে আমরা একান্ত না করতে পারি, তাহলে ধূর্ত জেনারেল ইয়াহিয়া সুযোগ পেয়ে বলবেন "ব্যর্থ হয়েছোঃ এবং এখন আমাদের সামরিক শাসনেই ফিরে যাওয়া উচিৎ।

আবার যদি এই ১২০ দিনের মধ্যে সংবিধান তৈরি করে দেয়া যায়- তাহলেও সে বলবে সংবিধানের নামে এসব কি লেখা হয়েছে? এ হচ্ছে পাকিস্তানের "ঐক্য ও সংহতিঃর বিরুদ্ধে এক ষড়যন্ত্রের দলিল।

ধূর্ত ইয়াহিয়া খানের এই মতলবের কথা জানিয়ে সামরিক বাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার একজন সংবাদবাহককে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানের রাজধানী ঢাকায় পাঠানো হলো এবং তাতে বলা হয়েছিল যদি পূর্ব পাকিস্তান এবং পাঞ্জাব থেকে কোনো সংবিধান আসে তাহলে তা হবে পাকিস্তান ভাঙার দলিল এবং ইয়াহিয়া খান তা মেনে নেবেন না। অতএব সাবধান।

অথচ বিশ্ব সমাজে আমার বাবার রাজনৈতিক প্রজ্ঞার কারণে বেশ একটা সুন্দর আসন গ্রহণ করার মতো অবস্থান তৈরি করে নিয়েছে। তখন পাকিস্তান আন্তর্জাতিক সামরিক জোট সিনটো এবং সিএটো'র সামরিক সদস্য ভারতের সাথে তৎকালীন সোভিয়েত ইউনিয়নেরও পাকিস্তান ভাঙার এক স্বপ্ন ছিল। কেননা পাকিস্তান ভাঙলে সিন্ধ এবং বেলুচিস্তানের মধ্য দিয়ে ভারত সাগরের উষ্ণ পানির পরশ তারা সহজেই নিতে পারতো।

এ বিষয়গুলো ইয়াহিয়া বুঝতে পেরেছিলেন। এবং এ কারণে তিনি সামরিক শাসনকে টিকিয়ে রাখার জন্য যে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর ডাক দিলেন তার ৩১৩টি সিটের মধ্যে আশাতীতভাবে বাঙালিরা পেয়ে বসলো অন্যদিকে জেনারেল ইয়াহিয়া খান এবং তার নিরাপত্তা বাহিনী আমার বাবার নতুন দলের রাজনৈতিকভাবে জন সমর্থন এবং জনকল্যাণকর কাজগুলোকে অস্বীকার করতে পারলেন না। এ জন্য জেনারেল ইয়াহিয়া নিজেই একদিন বাবার কাছে এলেন। বাবা তাঁকে সাহসের সাথে জানিয়ে দিলেন, লারকানায় তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী কেউ নেই, লারকানা তার সাথে করাচীর পাশে থাকা শহরও তাই অন্যান্য জায়গার কথা তিনি বলতেও পারবেন না আশাও করে না। লারকানা, করাচী থাট্টা এগুলো পাকিস্তানের ঐতিহাসিক গুরুত্বপূর্ণ এবং বিখ্যাত শহর।


www.pathagar.com

থাট্টা প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনেরও শহর। এছাড়া পাকিস্তানের ঐতিহ্যবাহী প্রাচীন অভিজাত খাবার আজও থাট্টায় পাওয়া যায়। যেমন– মিষ্টি পানীয় যা সমগ্র পাকিস্তানে থাট্টার শরবত নামে সুবিখ্যাত এবং পরিচিত। এই শরবত গোলাপের সুগন্ধ মিশ্রিত পাপড়ি দ্বারা তৈরি করা হয়। এতে থাকে বাদাম এবং খাঁটি রূপা ধোয়া পানি। এই শরবতের সুনাম-সুখ্যাতি পাকিস্তানবাসীর মুখে মুখে সেই প্রাচীনকাল থেকেই আছে।

আমার বাবা সেই থাট্টা থেকেও নিজেই নির্বাচনে লড়াই করার কথা বলেছিলেন এবং জয়লাভ করেন। থাট্টা যে আমার বাবার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির ভোট দূর্গ তা মিলিটারী জান্তার জানা ছিল না। যখন বাবা জিতলেন তখন জেনারেল আয়ুব খান বুঝলেন যে কত বড় ভুল কাজ তিনি করেছেন। একজন সেনা স্বৈরশাসকের অধীনে সেই নির্বাচন ছিল অবাধ এবং নিরপেক্ষ।

১৯৭০ সালের ডিসেম্বরে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীর জন্য ৫টি প্রাদেশিক নির্বাচন সম্পন্ন করা হলো। সে নির্বাচনও ছিল মুক্ত এবং স্বতঃস্ফূর্ততায় ভরপুর। কিন্তু পূর্ব পাকিস্তানে ভাসানী সাহেব এই নির্বাচন বর্জন করলেন যেন শেখ মুজিবুর রহমান এবং তাঁর দল আওয়ামী লীগ জয়লাভ করে। এবং তাই হয়েছিল। আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে ১৬২টি আসনের মধ্যে ১৬০টিতে জয়লাভ করে। সেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে শেখ মুজিবের এই জয়ের মধ্য দিয়ে পূর্ব পাকিস্তানবাসী ধীরে ধীরে পশ্চিম পাকিস্তানদের ওপর ক্ষেপে উঠতে থাকে।

অন্যদিকে পাকিস্তান পিপলস পার্টির কর্ণধার আমার বাবা পশ্চিম পাকিস্তানে একচেটিয়া জিতে গেলেন। প্রায় ৮১টি আসন জিতে ছিলেন। এর মধ্যে পাঞ্জাব এবং সিন্ধে ছিল একচেটিয়া জয়। তখন পশ্চিম পাকিস্তানে আমার বাবার পক্ষে শ্লোগান ছিল 'রুটি-কাপড়-ঘর' ঠেকাও। সে সময় অনেক রথী-মহারথী রাজনীতিক আমার বাবার কাছে পরাজিত হন –কারণ জানা-অজানা সকল জনগণ এক যোগে ভোট দিয়েছিলেন ভুট্টোকে। সেই সময় আমার বাবার নাম এতো জনপ্রিয় হয়েছিল যে প্রবাদ রটে ছিল– ভুট্টোর নামে যদি কোনো ল্যাম্পপোস্ট নির্বাচনে দাঁড়ায় তাহলে সে পাস করবে। এই বহুদলীয় নির্বাচন পাকিস্তানকে গণতন্ত্রের পথে অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে যায়। কিন্তু এর দ্যুতি বেশিদিন টিকলো না। হঠাৎ মেঘে বজ্রপাতের মতো আওয়ামী লীগ ৬ দফা দাবি উত্থাপন করে বসলো। যার সাথে সমগ্র পাকিস্তানের নিরাপত্তা রক্ষা করা হুমকি হয়ে দাঁড়ালো– যা বহুপূর্বেই জেনারেল ইয়াহিয়া খান আশংকা করেছিলেন। ধীরে ধীরে পাকিস্তানের একতা, নিরাপত্তা, শক্তি ও সামর্থ্য সব কিছুই যেন ভেঙে যাওয়ার মতো পরিস্থিতিতে চলে এলো।


www.pathagar.com

শেখ মুজিব দাবি করলেন যেহেতু তিনি সংখ্যাগরিষ্ঠ আসনে জয়লাভ করেছেন ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলীতে –সেহেতু তিনি প্রাদেশিক সরকারের প্রধান হতে চান না। তিনি সমগ্র পাকিস্তানের শাসনভার হাতে নিতে চান। কিন্তু তা হয় কিভাবে? সংবিধানে তো তা লিখা ছিল না। তাছাড়া পশ্চিম পাকিস্তানে তিনি কোন আসনই পাননি। শুধু পূর্ব পাকিস্তানের সব আসন জিতলেই তো হবে না। তাহলে বাদবাকী আসনের নেতা কি চাইবেন।

শেখ মুজিব পুনরায় ১৯৭১ সালের ৩ মার্চ প্রাদেশিক সরকারের ক্ষমতাকে অস্বীকার করে সংবিধানকে অমান্য করলেন এবং ৬ দফা দাবি পেশ করলেন। কিন্তু সেই ৬ দফা সমগ্র পাকিস্তানের সেনাবাহিনী, সরকারি কর্মকর্তা, আইনজীবী, সাংবাদিক, সুশীল সমাজের কেউ মেনে নিলেন না। বরং তারা বললেন, ২৩ বৎসর পূর্বে আমরা পাকিস্তানবাসী অনেক জীবনের বিনিময়ে এই দেশকে স্বাধীন করেছি। আওয়ামী লীগের এই দাবি মেনে নেয়া মানে ২৩ বছর পর আবার স্বেচ্ছায় দেশকে ভেঙে ফেলা, তা হবে না। অত সহজে পাকিস্তানকে আমরা ভেঙে যেতে দেবো না।

জেনারেল ইয়াহিয়া খান দেখলেন শেখ মুজিবের মতিগতি ভালো না– তাই তিনি বললেন, গণতন্ত্রের জন্য পাকিস্তানের সময় এখনো আসে নাই। তিনি এবার ছোটাছুটি শুরু করলেন। তিনি জানুয়ারি মাসের মাঝামাঝি ঢাকা গেলেন শেখ মুজিবের সাথে চুক্তি করার জন্য। এরপর ১৭ জানুয়ারি আসলেন লারকানায় আমার বাবার গ্রামের বাড়িতে, আমার বাবার সাথে পরামর্শ করার জন্য। বাবা তখন পাকিস্তানের সংবিধান সংশোধনে ব্যস্ত, যার মধ্যে ৫টি প্রাদেশিক সরকার এবং তার জনগণের সমান অধিকারের কথা বলা ছিল। জেনারেল ইয়াহিয়া বাবাকে অ্যাসেম্বলীতে যোগ দেয়ার জন্য অনুরোধ করলেন। বাবা জানালেন শেখ মুজিব যদি আসেন তাহলে তিনিও যোগ দেবেন। সেই মতো আমার বাবা ২৭ জানুয়ারি ঢাকায় গেলেন। আশা ছিল শেখ মুজিবকে মানিয়ে নেবেন। কিন্তু কোনো ফল হলো না।

শেখ মুজিব কোনো কথাই মানলেন না। তিনি সোজা জানালেন, আমি আমার ৬ দফা থেকে এক চুলও নড়বো না। অমনি ১ মার্চ জেনারেল ইয়াহিয়া খান ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী বন্ধ করে দিলেন।

শেখ মুজিবও বসে থাকলেন না। ৩ মার্চ তিনি দেশব্যাপী হরতাল ডেকে বসলেন। এতে করে পূর্ব পাকিস্তান অচল হয়ে পড়লো। এরপর শুরু হলো প্রায় মাসব্যাপী প্যারা মিলিটারী পুলিশ ইত্যাদির সাথে সাধারণ মানুষের দাঙ্গা-হাঙ্গামা। মার্চের ৬ তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া পুনরায় জানালেন পরবর্তী ২৫ মার্চ বসবে ন্যাশনাল অ্যাসেম্বলী।


www.pathagar.com

শেখ মুজিব মেনে নিলেন না। কেননা তিনি তখন হরতাল করে দেশের ব্যস্ত নেতা। তিনি জানালেন, আমার ৬ দফা না মেনে নিলে আমি অ্যাসেম্বলীতে যোগ দেবো না। তিনি তখন বেশ ক'টি নতুন দাবি পেশ করলেন–

(১) আন্দোলনে গিয়ে যারা নিহত হয়েছে তাদের মৃত্যুর পূর্ণ তদন্ত করতে হবে।

(২) সামরিক আইন তুলে নিতে হবে।

(৩) সেনা সদস্যদের ব্যারাকে ফিরিয়ে নিতে হবে এবং

(৪) অ্যাসেম্বলীতে বসার আগে নির্বাচিত প্রতিনিধির হাতে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে হবে।

এই সময় ১০ মার্চ তারিখে শেখ মুজিবের কাছে আমার বাবা একটি টেলিগ্রাম পাঠান। ততদিনে আওয়ামী লীগ পূর্ব পাকিস্তানে এক অস্থায়ী সরকার গঠন করে ফেলেছে। মার্চের ৫ তারিখে জেনারেল ইয়াহিয়া খান পূর্ণ নিরাপত্তা নিয়ে পুনরায় ঢাকা গেলেন শেখ মুজিবের সাথে আলোচনার জন্য। আমার বাবা গিয়েছিলেন ২১ মার্চে। কিন্তু কোনো মিটিং-ই হয়নি। কেননা তখন মুজিবের কণ্ঠে অন্য কথা। তাহলো একেবারে পূর্ণ স্বাধীনতা। তিনি ততদিনে সশস্ত্র মিলিশিয়া বাহিনী তৈরি করে ফেলেছিলেন। এমনকি পূর্ব পাকিস্তান তখন পুরো তাঁর নিয়ন্ত্রণে এবং বাঙালিরা তখন পাকিস্তানের সাথে যে কোনো কিছু করতে পারে।

অতঃপর তাই করলো পূর্ব পাকিস্তানবাসী। তারা সহিংসতার পথে পা বাড়ালো। মিলিশিয়া বাহিনী, স্থানীয় পুলিশ, ইস্ট পাকিস্তান রাইফেলস, অবাঙালী সরকারি কর্মকর্তাদের নির্বিচারে হত্যা করা শুরু করে দিলো। অবাঙালিদের বাড়ির দেয়ালে ইংরেজি এক্স অক্ষর লিখে তাদের মৃত্যুর পরোয়ান জারি করলো।

শুধু তাই নয় পাঞ্জাবী পরিবারগুলোকেও মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হতে বলা হলো। সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ডে পূর্ব পাকিস্তানের লোকজন জড়িয়ে পড়লো। রাজপথে রক্তের স্রোত বয়ে গেলো। পাকিস্তানের পতাকা নামিয়ে বাংলার পতাকা ওঠানো হলো।

উপায়ান্তর না দেখে পাঞ্জাবী, বিহারীরা পাকসেনাদের সাথে সহযোগী হিসেবে কাজ করেন।

২৫ মার্চ, জেনারেল ইয়াহিয়া খান সেনা সদস্য রাস্তায় নামালেন– আদেশ দিলেন যে, করে হোক পূর্ব পাকিস্তানকে পাকিস্তানের অংশ হিসেবে রাখতে হবে। এই আদেশের ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা বসে থাকলো না। তারা রাগে ফেটে পড়লো। পাক সেনারা বসে না থেকে রাজধানী ঢাকাসহ অন্যান্য শহরে ছাত্র-জনতার ওপর নির্বিচারে গুলি চালায়।


www.pathagar.com

পরবর্তী ঘটনা আরো ভয়াবহ। সাধারণ জনগণ, পুলিশ বাহিনী এবং তাদের তৈরি মিলিশিয়া বাহিনী মিলে বিহারী এবং পাঞ্জাবী নিধনে সারা দেশে অভিযানে নেমে পড়লো। এমনকি রাওয়ালপিণ্ডির অদূরে সেনা দপ্তরে বাঙালি জওয়ানরা বিদ্রোহ করে বসলো।

একজন মামুলী মেজর জিয়াউর রহমান, (যিনি পরবর্তীকালে দেশের প্রেসিডেন্ট হয়েছিলেন এবং তাঁর স্ত্রী বেগম খালেদা জিয়া হয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী) তিনি প্রথম যুদ্ধের জন্য ঘোষণা দেন। তিনি বলেন, আমাদের বাঙালি পুলিশ, ইপিআর এবং সেনা সদস্য যারা যেভাবে আছেন অস্ত্র হাতে দেশের জনগণকে নিয়ে যুদ্ধে নেমে যান। এ হচ্ছে স্বাধীনতা যুদ্ধ।

অন্যদিকে পাক সেনারাও মরিয়া হয়ে ওঠে। তারা নিরীহ সাধারণ জনতাসহ ছাত্র-শিক্ষক হত্যা করে, নারী ধর্ষণ করে এমনকি শিশু হত্যার মতো অমানবিক কাজও করে। এর ফলে প্রায় এক মিলিয়ন জনগণ রিফিউজি হয়ে সীমানা অতিক্রম করে ভারতে প্রবেশ করলো। শেখ মুজিবকে গ্রেফতার করা হলো– এবং পশ্চিম পাকিস্তানে নিয়ে যাওয়া হলো। ইয়াহিয়া তাকে হত্যা না করার জন্য আদেশ দিলেন।

এপ্রিল মাসের মাঝামাঝি সময়ে কোলকাতায় মুক্তিযুদ্ধ পরিচালনাকারী নেতারা বাংলাদেশের প্রবাসী সরকার গঠন করে। এই সরকারের মধ্যে ভারত সরকারের অনেক ষড়যন্ত্র ছিল। ষড়যন্ত্র যখন বেড়ে গেল, তখন জেনারেল ইয়াহিয়া পূর্ব পাকিস্তানে একজন অনুগত শাসক নিযুক্ত করলেন। এই সময়ে যারা আওয়ামী লীগের পক্ষে কাজ করছিলেন তারা দুষ্কৃতকারী হিসেবে চিহ্নিত হলেন। যারা পক্ষে থাকলেন তারা পাকিস্তানী বলে বিবেচিত হলেন। এর মধ্যে আওয়ামী লীগের ১৬০টি আসনের মধ্যে ৭৮টিতে মধ্যবর্তী নির্বাচনের মাধ্যমে নতুন সরকার গঠনের জন্য আহ্বান করা হলো। ততদিনে সামরিক বাহিনী ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দলগুলোকে নিজেদের আয়ত্ত্বে এনে ফেলে– যারা অবশ্য নির্বাচনে জয়লাভ করতে পারেনি। তাদের সামরিক বাহিনীর সদস্য এবং অফিসাররা জানালেন যে, বাঙালিদের ঠেকাতে প্রয়োজন হলে আপনারা আত্মঘাতী সেনাদল বানান, নইলে দেশ ঠেকাতে পারবেন না এবং এভাবেই তখন যে ধর্মভিত্তিক দলের জন্ম হয় তা আজও বাংলাদেশে সক্রিয় রয়েছে।

এক দীর্ঘ প্রতিক্ষীত গ্রীষ্মের দিনগুলো রাষ্ট্রিক সংঘাত এবং গেরিলা আক্রমণের মধ্যে দিয়ে কাটে। পূর্ব পাকিস্তানের অর্থনীতি ভেঙে পড়ে। রেললাইন উঁপড়ে, রাস্তা কেটে, যখন দেশের পরিস্থিতি একেবারে যায় যায় তখন যুদ্ধ আসন্ন অবস্থা। নভেম্বর মাসেই ভারত পূর্ব পাকিস্তানের বিভিন্ন সীমান্তে ছোট ছোট হামলা চালাতে থাকে। নভেম্বরের ২১ তারিখে তারা পর্যাপ্ত


www.pathagar.com

পরিমাণে সৈন্য পূর্ব পাকিস্তানের নানান সীমান্তে মোতায়েন করলো। ডিসেম্বরের তিন তারিখে হঠাৎ করে ভারত পাকিস্তানের দুই সীমান্তেই আক্রমণ করে বসলো– যা ১৯৭১ সালের পাক-ভারত যুদ্ধ নামে পরিচিত।

দুই সপ্তাহের মধ্যে পাকিস্তানী সৈন্য সরিয়ে নেয়া হলে, ভারত পূর্ব পাকিস্তানের সাথে পশ্চিম পাকিস্তানেও প্রবল আক্রমণ শুরু করে। তার কারণ পশ্চিম পাকিস্তানকে ঘায়েল করে কিছু সীমান্ত অঞ্চল দখল করা। তখন পশ্চিম পাকিস্তানের নির্বাচিত নেতা হিসাবে আমার বাবা জাতিসংঘে গেলেন। যুদ্ধ বন্ধের একটি ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য– কিন্তু আন্তর্জাতিক সমর্থন তখন পাকিস্তানের পক্ষে ছিল না। তখন সকলের দৃষ্টি ঢাকার দিকে। ঢাকায় কখন পাকিস্তানী বাহিনী পিছু হটে এমন কিছু আরকি। দুর্ভাগ্যবশত ভারতের যোগসাজসে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায় পুরোটাই তখন পূর্ব পাকিস্তানের জনগণের পক্ষে। অর্থাৎ আন্তর্জাতিক কোনো ধরনের সাহায্যের হাত আবার বাবার প্রতি এগিয়ে আসলো না– তবু আমার বাবা সফল হলেন সোজা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে গিয়ে। তৎকালীন মার্কিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন বাবাকে সাহায্যের হাত বাড়ালেন। নিক্সন আদেশ করলেন যে পশ্চিম পাকিস্তানকে বাঁচানোর জন্য আমার সপ্তম নৌবহর যাবে। ১৯৭১ সালে নিক্সনের এই আদেশের কারণে ভারত ও পূর্ব পাকিস্তানের জনগণ ভয় পেয়ে যায়। তারপরও অবিবেচক জেনারেল ইয়াহিয়া খানের আদেশে ১৬ ডিসেম্বরে ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে ভারতীয় জেনারেলের কাছে পাকিস্তানের জেনারেলের কাছে আত্মসমর্পন করতে হয়। এটাই ছিল আমাদের পাকিস্তানের সৈন্যদের গৌরবময় ইতিহাসের এক কালো অধ্যায়। আমরা শুধু আমাদের দেশই হারাইনি, আমরা হারিয়েছি– কিন্তু আমরা পাকিস্তানীরা সারা বিশ্বে হেয় হয়েছি। আমাদের অনেক সৈনিক আত্মসমর্পন না করে, যুদ্ধ করে প্রাণ বিসর্জন দিয়েছেন– কিন্তু মান-মর্যাদা কমাননি।

যুদ্ধ যখন শেষ, তখন দেখা গেল সেই দুই সপ্তাহ যুদ্ধে পাকিস্তান তার অর্ধেক নৌবাহিনী, অর্ধেক স্থল বাহিনী এবং এক চতুর্থাংশ বিমান বাহিনী খুইয়েছে। সবচেয়ে অপমানজনক বিষয় হচ্ছে– প্রায় ৯০ হাজার পাক সেনাকে বন্দী করে ভারতে নিয়ে যাওয়া হয়। পূর্ব পাকিস্তানকে তো হাতছাড়া করতেই হয়, পাকিস্তানের রাজনীতি, অর্থনীতি, সামরিক বাহিনীসহ সকল স্তরে বিশৃঙ্খলা বেধে যায়।

আমাদের হাতছাড়া হয়ে যাওয়া সেই পূর্ব পাকিস্তান হচ্ছে আজকের বাংলাদেশ। কিন্তু বড় আশ্চর্য এবং পরিতাপের বিষয় হচ্ছে জাতি এত বড় একটা আঘাত পাওয়ার পরও সামরিক জান্তারা গদি ছাড়তে চাইলো না। এতে করে নবাগত জুনিয়র অফিসারগণ বিদ্রোহ ঘোষণা করলো। তারা বললেন, ক্ষমতায়


www.pathagar.com

নির্বাচিত নেতা বসবেন, আর আমরা ব্যারাকে গিয়ে আমাদের সামরিক বাহিনীর মাজা শক্ত করবো। পাকিস্তান সেনা বাহিনীতে ইতোমধ্যে ঘূণ ধরে গেছে। এ সময় একদিন জেনারেল ইয়াহিয়া এই সব তরুণ অফিসারদের উদ্দেশ্যে জোরালো বক্তৃতা দেবার জন্য আসলেন। তখন তারা তাকে অপমান করলো, বললেন আপনি পদত্যাগ করুন এবং নির্বাচিত সরকারের হাতে ক্ষমতা ফিরিয়ে দিন।

এ সময় আমার বাবাও নিউইয়র্ক থেকে ফিরে এলেন। তখন সাধারণ জনগণও নির্বাচিত সরকারের জন্য সেনা প্রশাসনকে উপর্যুপরি চাপ দিচ্ছিল। পাকিস্তানের রাওয়ালপিণ্ডির বিখ্যাত জনমঞ্চে লিয়াকতবাগে সাধারণ মানুষ এক গণজমায়েতের আয়োজন করে। সেই আয়োজনে জনগণ সামরিক শাসক জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে অনুরোধ করলো– ক্ষমতা আমাদের নির্বাচিত প্রিয় নেতা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর কাছে ফিরিয়ে দিন।

ডিসেম্বরের ২০ তারিখে পাকিস্তান সেনার জুনিয়র অফিসারেরা জেনারেল ইয়াহিয়া খানকে ঘেরাও করেন এবং পদত্যাগের জন্য চাপ দেন। শুধু তাই নয়, আরো দাবি তোলেন যে, তাঁর ভুলের কারণে পাকিস্তানের ৯০ হাজার সৈন্য আজ ভারতে বন্দী। আর নানা অত্যাচারের সম্মুখীন। তাদের দেশে আনার ব্যবস্থা করা হোক, অন্যথায় এর পরিণতি হবে ভয়াবহ। পশ্চিম পাকিস্তানের একমাত্র নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টো, তাঁকে ক্ষমতা ছেড়ে দিতে দোষ কোথায়?

অবশেষে আমার বাবা পাকিস্তানের তৎকালীন একমাত্র নির্বাচিত এবং জনপ্রিয় নেতা জুলফিকার আলী ভুট্টোর হাতে পাকিস্তানের শাসনভার তুলে দেয়া হয়। তখন কোনো সংবিধানিক আইন-কানুন ছিল না। তাই তিনি একই সাথে সামরিক আইন প্রধান এবং প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিলেন। ক্ষমতা গ্রহণ করার এক মাস পরেই তিনি সামরিক আইন তুলে দিলেন এবং পার্লামেন্ট থেকে মধ্যবর্তী শাসন ব্যবস্থার জন্য অনুমতি চাইলেন।

১৯৭৩ সালে প্রথম পাকিস্তানের পূর্ণাঙ্গ এবং সকল প্রদেশের পার্লামেন্ট সদস্য কর্তৃক অনুমোদনে এক শাসনতন্ত্র লিখিত হলো।

এ বিষয়টি আমি তাঁর কন্যা হলেও আমার চেয়ে অধিক মূল্যের অন্তত তাঁর রাজনৈতিক জীবনের অর্জন আমি মনে করি। কিন্তু দুঃখের বিষয় হলো, জেনারেলগণ ব্যারাকে ফিরে গিয়েও ক্ষান্ত থাকলেন না। আমার বাবাকে অচল করার জন্য তারা নানা ধরনের ফাঁক-ফোকর খুঁজতে লাগলেন।

আমি বলবো এই সময়টি আমার বাবা জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টোর জীবনে একই সাথে নবজাগরণ এবং অত্যন্ত কঠিন সময়। এর মধ্যে ক্ষমতালোভী কিছু জেনারেল দু'বার আমার বাবার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থান ঘটায়। পূর্ব পাকিস্তান হাতছাড়া হয়ে যাওয়া এবং ৯০ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পন সবই



www.pathagar.com

আমার বাবার রাজনীতিতে বিশ্বাসঘাতকতার ফল। তারা আরো বললেন, পূর্ব পাকিস্তানের রাজনৈতিক দল আওয়ামী লীগের সাথে তাঁর গোপন সম্পর্ক ছিল, যার জন্য এসব ঘটনা ঘটেছে।

তারা তলে তলে মৌলবাদী দেশগুলোকে এক করলেন এসব বাজে কথা বলে এবং সন্ত্রাসীদের লেলিয়ে দিলেন নানা রকম সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড ঘটিয়ে আমার বাবার শাসন ব্যবস্থাকে ভেঙে ফেলার জন্য। মৌলবাদীরা এবং সন্ত্রাসী দলগুলো বিরাট এক সুযোগ পেয়ে সামরিক জেনারেলদের কাঁধে চড়ে বসলো। যে বসাটা আজও তারা বসে আছে– নামছে না এবং পাকিস্তানের সামরিক বাহিনীর কারণে তাদের নামাতেও পারবে না। আজও বাংলা বিভাজন এবং ভারতের কাছে পাকিস্তানের ৯০ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পনের জন্য যাবতীয় দোষ-ত্রুটি আমার বাবার মৃত আত্মাকে বহন করতে হচ্ছে।

১৯৭২ সালে আমার বাবা যখন শিমলা চুক্তি করেন ভারতের তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সাথে, তখন আমি সেখানে ছিলাম। আমি বলবো, এই চুক্তি ছিল আমার বাবার রাজনীতির বড় ফসল। কোনো অর্থ বা দণ্ড নয়, শুধুমাত্র আলোচনার মাধ্যমেই ৯০ হাজার সৈন্য এবং ৫ হাজার যুদ্ধবন্দীর মুক্তি এবং ১৯৭১ সালে ভারত কর্তৃক পাকিস্তানের জয় করা জায়গাগুলো মুক্ত করে দিলেন। তখনও আমার বাবা বাংলাদেশকে স্বীকৃতি দেননি। শিমলায় শুধু ওসব চুক্তিই হয়নি, দু'দেশের মধ্যে অবাধ বাণিজ্য, বিমান চলাচল এবং যোগাযোগ বা যাতায়াত ব্যবস্থাও চুক্তি হয় এবং অল্প দিনের মধ্য ভারত সরকার ৯০ হাজার সৈন্যের মুক্তিসহ, অধিকৃত কাশ্মীরের জায়গা ছেড়ে দেয়।

এবার আবার বাবা একটু চালাকীর খেলা খেললেন। তিনি মৌলবাদী এবং সন্ত্রাসীদের আয়ত্ত্বে আনার জন্য দেশকে সেকুলার স্টেট বলে ঘোষণা দিলেন। আমার বাবা এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টি জানিয়ে দিলো– যে করেই হোক যে কোনো মূল্যে পাকিস্তানের জনগণ এবং সার্বভৌমত্ব টিকিয়ে রাখতে হবে। তিনি ধর্মভিত্তিক কোনো রাজনৈতিক দল বা মৌলবাদীদের কঠোর সমলোচনা করলেন। তিনি বললেন, পাকিস্তান হবে উদারনৈতিক গণতান্ত্রিক দেশ– কখনোই গোঁড়া ইসলামিক দেশ নয়।

আমার বাবার শ্লোগান ছিল– 'রুটি, কাপড় এবং বাসস্থান' –যা পাকিস্তানের অর্থনীতি, রাজনীতি এবং সামাজিক উন্নয়নের কথা বলে। যে কথার ওপর ভিত্তি করে আজও পাকিস্তান দাঁড়িয়ে। ইসলাম সম্পর্কে আমার বাবার জানাশোনা ছিল প্রচুর। কিন্তু তিনি গোঁড়া মনের ছিলেন না। তিনি খুব কায়দা করে সামরিক শক্তি সমর্থিত কতিপয় দলের গোঁড়া মৌলবাদীদের বিরুদ্ধে পাকিস্তানের জনগণের মনোনীত কথাবার্তা বলতে থাকলেন।


www.pathagar.com

মনে হলো ইনিই আমাদের ফিরে আসা মহান নেতা মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ। কিন্তু দুর্ভাগ্য এই যে, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই সামরিক শাসকগণ সামরিক খাতে অর্থ ব্যয় করতে করতে তখন পাকিস্তানের সরকারের তহবিল একেবারে শূন্য।

আমার বাবার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি তখন একেবারে সেকুলার। তাই যে জামায়াতে ইসলামী সেই ১৯৭০ সাল থেকে আমার বাবার পেছনে লেগেছিল –তারা পুনরায় সামরিক জেনারেলদের হাত করে প্রকাশ্যে জ্বালাও-পোড়াও রাজনীতি শুরু করে। সেনা সদস্যসহ আমার বাবার বিপক্ষের ক্ষমতালোভী জেনারেলগণ তখন ১৯৭১ সালে ভারতের কাছে পরাজয়ের সেই ক্রোধের ক্ষত চাটছেন আর জামায়াতে ইসলামীর সাথে ষড়যন্ত্রের নীল নকশা আঁকছেন। অর্থাৎ তখন ক্ষমতার ভেতরে থেকে শত্রু সেনাবাহিনীর কতিপয় ক্ষমতালোভী অফিসার এবং ক্ষমতার বাইরের রাজপথে শত্রু ধর্মভিত্তিক মৌলবাদী রাজনৈতিক দল জামায়াতে ইসলামী। তারা পুনরায় সেই দোষ নতুন করে উত্থাপন করলেন যে, আমার বাবা ভারতের দালাল। তাঁর জন্য পূর্ব পাকিস্তান আজ হাতছাড়া এবং ৯০ হাজার সৈন্যের আত্মসমর্পনের হোতা তিনি। এর সাথে নতুন এক কারণ খাড়া করলো, তা হলো– পূর্ব পাকিস্তানে তিনি রাজনৈতিকভাবে কোনো মনোনিবেশ করেননি বলে কোনো আসন পাননি। আওয়ামী লীগকে পূর্ব পাকিস্তান ছেড়ে দিয়ে তিনি পশ্চিম পাকিস্তানের ক্ষমতায় বসবেন বলেই তাঁর এমন আচরণ।

অবাক হওয়ার মতো বিষয়– কিন্তু তাতে কি, অবাক হওয়ার মতো কিছু নয়, আমার বাবাই প্রথম সামরিক বাহিনী এবং বেসামরিক আইনকে একটি সুন্দর সম্পর্কে আনার চেষ্টা করেন। তিনি চেয়েছিলেন সামরিক বাহিনী স্রেফ পেশাদার আধুনিক এবং শক্তিশালী বাহিনী হিসেবে থাকবে। তারা রাজনৈতিক কোনো ব্যাপারে নাক গলাবে না। এজন্য কেউ কেউ বললেন, জনাব ভুট্টো পাকিস্তান সামরিক বাহিনীকে দুর্বল করে ফেলছেন। কিন্তু এটা সত্য নয়। তিনি চেয়েছিলেন, বিশ্বের অন্যান্য উন্নত গণতান্ত্রিক দেশের মতো নির্বাচিত সরকার সামরিক বাহিনীকে নিয়ন্ত্রণ করবে– পাকিস্তানের মতো সামরিক বাহিনী নির্বাচিত বা জনগণের সরকারকে নিয়ন্ত্রণ করবে না।

এছাড়া তিনি ১৯৭৩ সালে সেনাবাহিনীর প্রধান হিসেবে যে কোনো জেনারেলের স্থায়িত্ব তিন বছরের বেশি হবে না এই নিয়ম জারি করেন। শুধু তাই নয়– সামরিক বাহিনীর একজন জেনারেলকে পার্লামেন্টে সদস্য করার নিয়মও চালু করলেন। এ সবই দেশের কল্যাণের জন্য ছিল। ক্ষমতায় আসার পর এসব নিয়ম প্রবর্তনের পর ৪ মাসের মধ্যে আমার বাবা প্রায় ২১ জন সেনা


www.pathagar.com

অফিসার যারা সরাসরি রাজনীতির সাথে জড়িত ছিলেন– তাদের বরখাস্ত করলেন। এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, আয়ুব খানের কেবিনেটে আমার বাবাই প্রথম পরমাণবিক গবেষণা শুরু করেন। আন্তর্জাতিক সমর্থনে কানাডা সরকারের আর্থিক সহযোগিতায় এই গবেষণাগার চালু করা হয় করাচিতে। আমার বাবার মতামত ছিল, এই রিসার্চের ফলে আমরা যে শক্তি অর্জন করবো তাতে পেট্রোলিয়ামের মতো মূল্যবান জ্বালানির খরচ সাশ্রয় হবে, অন্যদিকে পরিবেশের উন্নতি হবে দ্রুত এবং প্রভুত।

সমালোচকরা আবার সমালোচনা করে বললো, সাধারণ পারমাণবিক প্লান্ট বানিয়ে লাভ কি, এ দিয়ে কি হবে? আমাদের দরকার অস্ত্র। নিউক্লিয়ার অস্ত্র হলে আমরা ভারতকে ঠেকিয়ে রাখতে পারবো। তাই অস্ত্র বানানো হোক এই শক্তি দিয়ে।

ইতিমধ্যে ভারতও কিন্তু পারমাণবিক শক্তির উৎপাদন কেন্দ্র নির্মাণ করে এবং এর দ্রুত উন্নতিও করে।

১৯৭২ সালে জনাব জুলফিকার আলী ভুট্টো পাকিস্তান পিপলস পার্টির ইশতেহারে পাকিস্তানের দশটি মূল ব্যবসায় প্রতিষ্ঠানকে জাতীয়করণ করেন, এর মধ্যে ব্যাংকিং এবং শিপিং কর্পোরেশনও ছিল। তিনি শিক্ষাজগৎকে সম্পূর্ণরূপে পাল্টে ফেললেন। যুগোপযোগী বিজ্ঞানসম্মত আধুনিক শিক্ষা পদ্ধতি চালু করলেন– যা শিশু থেকে ১৩ বৎসর বয়স পর্যন্ত সবার জন্য সমান, বাধ্যতামূলক এবং অবৈতনিক। তিনি পাকিস্তানের জনগণকে যে শিক্ষা দিয়েছিলেন সেই শিক্ষা অর্থাৎ রুটি, কাপড় এবং বাসস্থান –এই তিন বিসয়ের জন্য জীবন আমাদের পরিশ্রম করতে হবে তবেই আমাদের জীবন। তিনি নারী ও সংখ্যালঘুদের জন্য শিক্ষা বাধ্যতামূলক করলেন। সাথে সাথে তাদের দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক থেকে প্রথম শ্রেণীতে উন্নীত করেন। তিনিই প্রথম পাকিস্তানের মহিলা গভর্নর বানিয়েছিলেন। পুলিশে, বিচার বিভাগে, প্রশাসনে, কূটনৈতিক পদে নারী নিযুক্ত করলেন, এমনকি সংখ্যালঘুদের জন্য সরকারি চাকরির ক্ষেত্রে কোটা পদ্ধতি চালু করলেন। সাথে সাথে সরকারি মূল শিক্ষা প্রতিষ্ঠানেও তাদের চাকরির সুযোগ করে দিলেন। রাজনৈতিক অধিকার একটি দেশের নাগরিকদের সবচেয়ে বড় অধিকার। সংখ্যালঘুদের তিনি সে অধিকারও দিলেন। তারা আমার বাবার আমল থেকেই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করা এবং ভোটদানের ক্ষমতা পায়। এই ক্ষমতা সংখ্যালঘুদের ক্ষমতাবান করে তোলে। তার প্রচলিত শ্রমিক আইন সম্পূর্ণ পাল্টে ফেলে সাধারণ শ্রমিকদের জীবন ব্যবস্থা। শ্রমিকদের নিয়মিত বেতনের সাথে বোনাস এবং অন্যান্য ভাতা চালু করেন। ট্রেড ইউনিয়ন চালুর অনুমতি তিনিই প্রথম প্রণয়ন করেন। তিনি ভূমি আইন সংস্কার করেন এবং জামিদার প্রথার উচ্ছেদ ঘটান। তিনি যেসব জমি জাতীয়করণ করেন


www.pathagar.com

সেগুলো ভূমিহীনদের মধ্যে বিলিয়ে দেন। আমার বাবা ৪০ হাজার একর জমি এইভাবে দান করেন এবং আইন প্রবর্তন করেন যে হাজার হাজার একর জমির একক মালিকানা নিয়ে এভাবে জমি ফেলে রাখা চলবে না। এতে করে সাধারণ জনগণ যেমন বন্ধু হলো তেমন শত্রু হলো স্বল্পসংখ্যক জমির মালিক যারা ভূস্বামী বলে পরিচিত ছিলেন, তারা।

১৯৭৩ সালের অগাস্টে পাকিস্তানের নতুন শাসনতন্ত্র আনা হলো। এই শাসনতন্ত্রে স্বাধীন বিচার বিভাগ তৈরিসহ ধর্মভিত্তিক রাজনীতিকে বাদ দিয়ে প্রেসিডেন্টের ক্ষমতাকে বৃটিশ রাজতন্ত্রে রানীর ক্ষমতার সমান করা হলো এবং নির্বাচিত জাতীয় সংসদ রাখা হলো। এটা করা হলো নিখুঁত গণতান্ত্রিক ধারা যেন পাকিস্তানে আসে এবং আসার পর পরবর্তী ৪ বছর যেন রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিকভাবে সুনির্দিষ্ট এক উন্নতির পথে পা বাড়াতে পারে।

১৯৭৬ সালের মার্চে আমার বাবা জিয়াউল হককে সেনাপ্রধান নিযুক্ত করলেন অনেক সিনিয়র অফিসারদের পাশ কাটিয়ে। এটাই হয়তো আমার বাবার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল সিদ্ধান্ত। যদিও জিয়া অত্যন্ত গোঁড়া এবং মৌলবাদী মুসলমান ছিলেন– তবু আমার বাবা দেখেও সে বিষয়কে পাত্তা দেননি এবং কোনো সমস্যা বলে মনে করলেন না। জিয়াউল হক ছিলেন পাকা জামায়াতে ইসলামীর লোক। তিনি নিয়মিত মওলানা মওদুদী পড়তেন। শুধু তাই নয় মওলানা মওদুদী এবং জামায়াতে ইসলামীর সাথে তাঁর ছিল আত্মিক যোগাযোগ। তাই জিয়া সেনাপ্রধান হওয়ার সাথে সাথে পাকিস্তানী সৈন্যদের মওদুদীর বই পড়া বাধ্যতামূলক করলেন। এভাবেই পাকিস্তানের শক্তিশালী একটি পেশাদার সেনাবাহিনী ধীরে ধীরে মৌলবাদের দিকে ঝুঁকে পড়ে।

১৯৭৭ সালে জাতীয় নির্বাচন হলো। নির্বাচনে আমার বাবার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি একক সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাধ্যমে জয়লাভ করলো। মোট ২০০ আসনের মধ্যে পাকিস্তান পিপলস পার্টি পায় ১৫৫টি। প্রধান বিরোধী দল অর্থাৎ পাকিস্তান ন্যাশনাল এলায়েন্স –যারা প্রাক্তন সেনা অফিসার এবং মৌলবাদীদের নিয়ে গঠিত, তারা বিরোধিতা করলো, তারা পেলো মাত্র ৪৫টি আসন। পাওয়ার পর তারা রাস্তায় নেমে পড়লো, দাবি করলো নির্বাচনে ব্যাপক কারচুপি হয়েছে। এই মর্মে তারা দেশের মধ্যে নানান ধরনের সহিংসতা শুরু করলো। ধর্মভিত্তিক রাজনৈতিক দল যেমন– জামায়াতে ইসলামীসহ অন্যান্য ইসলামিক দলগুলো দেশে শরীয়াহ আইন চালু করার নামে আন্দোলন শুরু করে দিলো।

১৯৭৭ সালের ৫ জুলাই, পাকিস্তানের রাওয়ালপিন্ডির প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে আমরা ঘুমিয়ে হঠাৎ মা আমাদের জাগালেন। আমি অবাক হলাম।


www.pathagar.com

তিনি বললেন, সেনাবাহিনী এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পাকিস্তানের ক্ষমতা দখল করেছে। পরদিন যদিও জেনারেল জিয়াউল হক ঘোষণা করলেন যে, পরবর্তী তিন মাসের মধ্যে নির্বাচন দেয়া হবে, কিন্তু তা ছিল পুরোটাই মিথ্যা।

পরবর্তীকালে ৯০ দিন কেন ৯০ মাসেও তিনি নির্বাচন দেননি। এর এক জেনারেশন পর পাকিস্তান গণতন্ত্রের মুখ দেখতে পেয়েছিল। ক্ষমতায় আসার পর জেনারেল জিয়া আমার বাবার বিরুদ্ধে ভিত্তিহীন সব মিথ্যা দোষ আনতে লাগলেন। এতে দেশেসহ বিদেশেও আমার বাবার সুনাম-সুখ্যাতির মস্ত ক্ষতি হচ্ছিলো। ১৯৭৯ সালের ৪ এপ্রিল তাঁকে বিচার বিভাগের অধীনে এনে গণহত্যার দায়ে বিচার শুরু করা হলো।

আমার বাবা যেদিন গ্রেপ্তার হন সেদিন আমি বালিকা থেকে তরুণী পরিণত হলাম। পরবর্তী দুই বছর তিনি আমার গাইড ছিলেন। আমাকে তৈরি হওয়ার জন্য যা যা প্রয়োজন তা সবকিছু তিনি আমাকে শেখাতেন। যেদিন তাঁকে খুন করা হলো, সেদিন আমি বুঝতে পেরেছিলাম, আজ থেকে পাকিস্তান আমার জন্য, আমি পাকিস্তানের জন্য। আমি আমার বাবার মত ও পথ অনুযায়ী তাঁর দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির পক্ষে রাজনীতিতে নেমে পড়লাম।

জেনারেল জিয়াউল হক যখন ক্ষমতায় বসলেন তখন মৌলবাদী কট্টরপন্থীরা ঈদের দিনের মতো রাস্তায় নেমে নাচানাচি করেছে। মিষ্টি বিতরণ করেছে। জেনারেল জিয়া দ্রুত তাঁর সেনা অফিসারদের নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর মতবাদ পাল্টে ফেললেন। তখন তাদের মতামত হলো– ঈমান, তাকোয়া, জিহাদ –এসবই হচ্ছে আল্লাহর জন্য। অবশ্য এসব ছিল পাকিস্তানের রাজনীতি এবং গণতন্ত্রে নেমে আসা এক অশুভ চক্রের পূর্বলক্ষণ। তা হলো পাকিস্তানের সেনাবাহিনীর সাথে বিশ্বের সমস্ত ইসলামপন্থী সন্ত্রাসী দলগুলোর মধ্যে মধুর সম্পর্ক গড়ে ওঠা। যে সম্পর্ক এবং গোপন ক্ষমতার বলে জেনারেল জিয়া পাকিস্তানের জনগণকে লোহার বেড়ি পরিয়ে এক যুগ শাসন করেছিলেন এবং এই সময়েই বলবো সন্ত্রাসবাদের বিষাক্ত কর্মকাণ্ড সারা পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়লো। পাকিস্তান হলো এই অঞ্চলে ইসলামপন্থী সন্ত্রাসীদলের স্বর্গরাজ্য। জেনারেল জিয়া পাকিস্তান সেনাবাহিনীকে শুধুমাত্র মসজিদমুখী করেই ছাড়েননি –তাদেরকে কট্টর মৌলবাদী হিংস্র দানব রূপেও পরিণত করেছিলেন।

জেনারেল জিয়া হঠাৎ দাবি করে বসলেন যে, পাকিস্তান যেহেতু ইসলামের ওপর ভিত্তি করে সৃষ্টি হয়েছে সুতরাং এখানে ইসলামিক আইন-কানুন চলবে। অর্থাৎ দেশ চলবে ইসলামিক আইনে। ধীরে ধীরে জেনারেল জিয়া প্রমাণ করলেন, তাঁর সামরিক শাসন জেনারেল আয়ুব খানের চেয়েও ভয়াবহ।


www.pathagar.com

সেনাবাহিনী পরিচালিত সেনা বিচারালয় স্থাপন করেছিলেন এবং সে সব জায়গায় গণতন্ত্রের সমর্থক কর্মীদের এনে অত্যাচার করা হতো। চাবুক মারা হতো। ক্ষমতায় থাকার জন্য জেনারেল জিয়া জন প্রশাসনের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পদে সেনাবাহিনীর উচ্চ পদস্থ অফিসারদের বসালেন। তিনি তার স্বৈরশাসনকে দীর্ঘায়িত করার জন্য ইন্টেলিজেন্স স্কোয়াডকে নিজের ইচ্ছামতো ব্যবহার করতেন। তিনি ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার কোনোটিই বুঝতেন না। খামাখা গণতন্ত্রের সাথে ইসলামিক শাসনতন্ত্রকে মিশিয়ে সুশীল সমাজের গণতন্ত্রমনা কিছু মানুষকে অত্যাচার করেন, হত্যা করেন। এ সময় থেকে জেনারেল জিয়ার শাসনকে বিশ্বের অন্যান্য দেশগুলো এড়িয়ে চলতে থাকে। এই ফাঁকে তিনি মৌলবাদীদের উস্কানীতে নারী অধিকার হরণ করেন। হুদুদ আইন নামে জামায়াতে ইসলামীর মদদে এক আইন জারি করলেন, যে আইনে নারী ও হিন্দুদের অধিকার একেবারে হরণ করা হলো। বিভিন্ন স্কুল-কলেজে শিক্ষক নিয়োগ দেয়া শুরু হলো জামায়াতে ইসলামির ইচ্ছামতো। এমনকি পাঠ্য বই থেকে ১৯৪৭ সালের পাকিস্তানের ইতিহাস থেকে শুরু করে ১৯৭১ সালে মৌলবাদীদের সব ধরনের ব্যর্থ রাজনীতির ইতিহাসকে বাদ দেয়া হলো।

এ সবের চেয়েও বড় বিষয় হলো, জেনারেল জিয়ার সামরিক জান্তা মানবাধিকার ক্ষুণ্ন করেন। রাজনৈতিক নেতা এবং প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীর অনেককেই গুলি করে হত্যা করেন, ফাঁসি দেন। এ কারণে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের মতো বিশ্বখ্যাত মানবাধিকার সংস্থা পর্যন্ত তার কঠোর সমলোচনা করে। আমার পরিবার এবং দলকে বর্বর অত্যাচারের সম্মুখীন হতে হয়। আমি এবং আমার মা যে কতখানি তার দ্বারা অত্যাচারিত হয়েছি তা বলে শেষ করা যাবে না। যেমন– হঠাৎ করেই তিনি আমাদের সি ক্লাস আসামী বানালেন। আমার এবং আমার মায়ের বিশ্বাস ছিল যে, আমার ভাই শাহনেওয়াজ ১৯৮৫ সালে ফ্রান্সে মারা যায় জেনারেল জিয়া এবং তাঁর পাশে থাকা তাঁর মতো জেনারেলদের যোগসাজশে। সুশীল সমাজকে প্রায় সময়েই নির্বাচনের কথা বলে অত্যাচারের মাত্রা বাড়িয়ে দিতেন।

যখন তিনি সকল রাজনৈতিক দলগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করলেন তখন অনেকেই অনেক ধরনের অত্যাচারের সম্মুখীন হন। তাঁর আইন অমান্য করলেই ১০ ঘা চাবুক এবং ২৫ বছরের সশ্রম কারাদণ্ড। সংবাদপত্রের ওপর কঠোর সেন্সর আইন আসলো। প্রতিটি সংবাদপত্রের প্রতিটি সংবাদ তাঁর লোকজনকে দেখিয়ে নিয়ে তারপর ছাপতে হতো। সকল সংবাদপত্র এবং পুস্তক প্রকাশককে


www.pathagar.com

ভুট্টোর নাম ছাপানো বন্ধ করতে বলা হলো। ভুট্টোর আমলের সকল ছবির প্রিন্ট পুড়িয়ে ফেলা হলো। বেশ কিছু সাংবাদিকদের হাতকড়া পরিয়ে চাবুক মারা হলো। ছাত্র সংগঠন এবং শ্রমিক ইউনিয়নগুলোকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলো। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে প্রগতিশীল ছাত্র সংগঠনগুলোর বিরুদ্ধে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্র সংগঠনগুলোকে লেলিয়ে দিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে সেনাবাহিনী প্রশাসনে ব্যাংকসহ সর্বস্তরে জামায়াতে ইসলামীর ছাত্রদের নিয়োগ দেয়া হলো। যে রাজনৈতিক দলে জামায়াতপন্থী কোনো সেনা অফিসার না থাকতো– সে দলকে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হতো।

১৯৮৪ সালে তাঁর সামরিক শাসনকে জায়েজ করার জন্য জামায়াতে ইসলামীর বুদ্ধিতে দেশে রেফারেন্ডাম দিলেন এবং তাঁর প্রচার এতোই ন্যাক্কারজনক ছিল যে, তা বললে অবিশ্বাস্য মনে হবে। তিনি প্রচার করলেন– জেনারেল জিয়ার বিরুদ্ধে ভোট প্রদান করা মানে ইসলামের বিরুদ্ধে ভোট দেওয়া। তিনি সরকার নিয়ন্ত্রিত রেডিও-টেলিভিশন এবং অফিস ব্যবহার করলেন যেন কেউ না ভোট দিতে না পারে। উল্টো দিকে জামায়াতে ইসলামী তাদের মত প্রচার করলো হ্যাঁ ভোটের পক্ষে। তারা প্রচার করলো জিয়াকে ভোট দেওয়া মানে ইসলামের পক্ষে ভোট দেয়া। জেনারেল জিয়া সেই রেফারেন্ডামে একচেটিয়া হ্যাঁ ভোটে জিতলেন।

১৯৮৫ সালে জেনারেল জিয়া জাতীয় এবং প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলীর নির্বাচনের জন্য আহ্বান জানালেন কিন্তু সাথে সাথে এও বললেন কোনো রাজনৈতিক দল এই নির্বাচনে অংশগ্রহণ করতে পারবে না। দলবিহীন নির্বাচন! এ কেমন নির্বাচন! নাকি নির্বাচনের নামে প্রহসন? তার মানে গণতন্ত্রকে একেবারে টুটি চেপে ধরে মেরে ফেলার আর এক ধরনের পাঁয়তারা। এই নির্বাচনে আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি অংশগ্রহণ করবে না– তারা সিদ্ধান্ত নেয়।

এখানে একটা কথা প্রসঙ্গক্রমে বলে রাখা ভালো যে, কোনো ধরনের গণতান্ত্রিক উত্তরণের নির্বাচন পরিহার করা উচিৎ নয়। যে কোনো ধরনের নির্বাচনে অংশ নেয়া দরকার। তাতে করে বোঝা যাবে জনগণের মধ্যে নেতা এবং দলের ওপর সমর্থন কতটুকু। তার মতামত কি?

কেননা নির্বাচন হলো জনগণের মত প্রকাশের প্রথম, প্রধান এবং একমাত্র প্রকাশ্য কিন্তু নিরাপদ এবং স্বাধীন মতামত প্রকাশের মাধ্যম। দলবিহীন প্রহসনের নির্বাচন সম্পন্ন হলো এবং সে নির্বাচনের মাধ্যমে মোহাম্মদ খান জুনেজো প্রধানমন্ত্রী নির্বাচিত হলেন। তবু জেনারেল জিয়ার গণতন্ত্র– গণতন্ত্রের মুখে কালিমা লেপন করলো। এতে দোষ সর্বৈব জেনারেল জিয়ার, গণতন্ত্রের নয়।


www.pathagar.com

মোহাম্মদ খান জুনেজো প্রধানমন্ত্রী হলেও সেনাবাহিনী প্রধান ছিলেন জেনারেল জিয়াউল হক। অফিসিয়ালি সামরিক আইন তুলে নেয়া হলেও দেশের যাবতীয় ক্ষমতার শীর্ষে ছিলেন জেনারেল জিয়া এবং তাঁর সেনাবাহিনী। আর অনুগত এই সেনাবাহিনীর পেছনে ছিল ধর্মভিত্তিক ইসলাম নামধারী উগ্রপন্থী মৌলবাদী সন্ত্রাসীদের দল জামায়াতে ইসলামী।

জেনারেল জিয়া শুধু সেনাবাহিনীর প্রধান ছিলেন তাই নয়– সরকার, প্রধানমন্ত্রী, জাতীয় এবং প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলীকে ভেঙে দেয়া, প্রাদেশিক গভর্নর নিয়োগ, সকল বাহিনীর প্রধান নিয়োগ প্রদান এবং জয়েন্ট চীফ অফ স্টাফ-এর নিয়োগ প্রদান সবই ছিল তাঁর হাতে। যখন সব ক্ষমতাই তাঁর হাতে ছিল তখন সামরিক শাসন তুলে নেয়া হয়েছে– দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য নির্বাচন দেয়া হয়েছে –এসব মিথ্যা কথা বলে নিজেকে মহান করে তোলার অর্থ কি? সে অর্থ হলো তুষ্টি। তিনি গণতন্ত্রের পক্ষের মানুষ, তিনি স্বৈরাচার বা একনায়ক কোনো ক্ষমতালোভী মানুষ নন– এই কথাগুলো প্রমাণ করার জন্যই পশ্চিমাদের চোখের সামনে এসব কাজ করা।

আমার বাবা এবং তাঁর গণতান্ত্রিক সরকারকে উৎখাতের পর জেনারেল জিয়া আমাকে প্রায় ছয় বৎসরকাল গৃহবন্দী করে রাখেন। ১৯৮৪ সালে শারীরিক অসুস্থতার কারণে আমাকে চিকিৎসার জন্য লন্ডনে পাঠানো হয়। অর্থাৎ সাময়িকভাবে মুক্ত হলাম। বন্দী বাড়িতে থাকার সময় সেনা অফিসারদের অত্যাচারে আমার ডানপাশের কান খারাপ হয়ে পড়ে। আমি মনে করি জেনারেল জিয়া চাননি আর কোনো ভুট্টো পরিবারের রক্ত তিনি ঝরাবেন না, তাই আমাকে হত্যা করেননি।

তখন আমি যে শুধু পাকিস্তান পিপলস পার্টির প্রধান তাই নয়– আমি তখন সমস্ত বিরোধী দলের পক্ষের নেতা। গণতন্ত্রের প্রতীক, তাই পাকিস্তানে গণতন্ত্র কায়েমে আমার কাঁধে ছিল মস্ত এক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব পাকিস্তানের জনগণ আমাকে নির্বাচনের মাধ্যমে অনেকটাই তা বর্তেছিল। লন্ডনে চিকিৎসায় থাকা অবস্থাতেও আমি পাকিস্তান সরকার কর্তৃক বলতে গেলে নজরবন্দী ছিলাম। সর্বক্ষণ আমার ওপর সেনাবাহিনীর বিশেষ একটি স্কোয়াডের নজর থাকতো। তবু আমিও কম যাইনি, সেই অবস্থার মধ্যে থেকেও আমি ইউরোপ এবং আমেরিকার মধ্য দিয়ে আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির নানা ধরনের প্রোগ্রামের কথা পাকিস্তানে জানাতাম। অর্থাৎ গণতান্ত্রিক আন্দোলন চলতোই। আমি নিয়মিত হাউজ অফ কমন্সে যেতাম এবং মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের হাউজ অফ কমনস এবং সিনেটরদের সাথে পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার বিষয়টি নিয়ে


www.pathagar.com

আলোচনা করতাম। এর সাথে আমি যোগাযোগ করতাম আলোচনায় বসতাম বিশ্বের বৃহৎ সব তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান এবং সংবাদ সংখ্যা ও সংবাদপত্র অফিসগুলোতে। বিশেষ করে দক্ষিণ এশিয়ায় কাজ করে এমন সব সংস্থাগুলোতে।

এভাবে এক সময় পথ খুঁজে বের করলাম আর তা হলো– এমন বিদেশের মাটিতে বসে এসব করলে হবে না, আমাকে দেশে ফিরতে হবে। দেশের মাটিতে বসে যাই হোক একটা কিছু করতে হবে। ১৯৮৬ সালের ১০ এপ্রিল আমি দেশে ফিরে এলাম। প্রায় ১০ লক্ষ লোক আমাকে সেদিন পাকিস্তানের লাহোরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানালো। এই দৃশ্যে জেনারেল জিয়ার মাথায় আকাশ ভেঙে পড়লো। আবার সেই ভুট্টোর রক্ত? ক্ষমতায় যাবে? যখন জেনারেল জিয়া এমন সাত-পাঁচ ভেবে অনর্থক ঘুম হারাম করছেন– তখন প্রধানমন্ত্রী জুনেজো তাকে মোটামুটি সান্ত্বনা দিচ্ছেন। এ সময় আফগানিস্তানে চলছে সোভিয়েত বাহিনীর তাণ্ডব। প্রধানমন্ত্রী জুনেজো জেনারেল জিয়ার আদেশে আমাকে ডেকে পাঠালেন একটি ফলপ্রসূ আলোচনার জন্য –যে কিভাবে আফগানিস্তানের মাটি থেকে সোভিয়েট বাহিনীকে সরানো যায়। তার একটি সুন্দর পথ বের করতে হবে। আলোচনার স্থান নির্ধারণ করা হলো রাওয়ালপিন্ডিতে অবস্থিত পাকিস্তান সেনাবাহিনী প্রধানের আবাসিক অফিসে। জেনারেল জিয়া তখন অত্যন্ত ভীত, উদ্বিগ্ন এবং চিন্তামগ্ন ছিলেন। হঠাৎ করে স্বল্পমেয়াদের পার্লামেন্ট বানানো হলো বেশ ছোট এবং গুটিকয় নেতা নিয়ে। তারা আমার কাছে আসে এবং এই বিষয়টি পাকিস্তানের সংবাদপত্র এবং বেতার ও টেলিভিশনে ব্যাপকভাবে প্রচার পায়। এই অবস্থা দেখে জেনারেল জিয়া কিছুতেই আমাকে সহ্য করতে পারলেন না।

১৯৮৮ সালের মে মাসে জেনারেল জিয়াউল হক প্রধানমন্ত্রী জুনেজোকে উৎখাত করলেন। তার সাথে জাতীয় এবং প্রাদেশিক অ্যাসেম্বলী ভেঙে দিয়ে নিজেই তত্ত্বাবধায়ক প্রেসিডেন্ট হলেন। তিনি এমন একটি পার্লামেন্ট চাইলেন – যে পার্লামেন্টের কোনো সদস্যই আমার সাথে সাক্ষাৎ করতে পারবেন না এমনকি যার প্রধানমন্ত্রীও কোনো ধরনের রাজনৈতিক আলোচনার জন্য আমাকে ডাকবে না। এ সময় গোয়েন্দা সংস্থা জিয়াউল হককে জানালো যে আমি গর্ভবতী সুতরাং এ সময় নির্বাচন দিলে আমি নির্বাচনী প্রচারণা চালাতে পারবো না। ফলে আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি যদি নির্বাচনে অংশ নেয় তাতে জেনারেলের কোনো ক্ষতি হবে না। আরো নিরাপদ হওয়ার জন্য জিয়া ঘোষণা দিলেন নির্বাচনে কোনো দল অংশগ্রহণ করতে পারবে না। নির্বাচন হবে ব্যক্তিবিশেষে। যাকে বলে নিম্ন মানসিকতার কূটকচালী।


www.pathagar.com

আমরা কখনো আর জানতে পারলাম না সেই নির্বাচনের ফলাফল –কেননা ১৯৮৮ সালের ১৭ আগস্ট তারিখে তিনি বিমান দুর্ঘটনায় মারা যান। গণতন্ত্র হাতছাড়া হলে তাকে আনা যায় বা আসে –কিন্তু পাকিস্তানের ইতিহাসে জেনারেল জিয়াউল হক গণতন্ত্রের যে ব্যাপক ক্ষতি করে গেছেন, তা পূরণ হবার নয়। পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরে আসতে যে কতটুকু সময় পার হবে তার কোনো সময় নির্ধারণ করে বলা মুশকিল।

জেনারেল জিয়া মৃত্যুবরণ করে শুধুমাত্র যে দেশকে এক সীমাহীন ঝুঁকির মধ্যে ফেলে গেলেন তাই নয়– তিনি শাসনতন্ত্রের ৮ম অ্যামেন্ডমেন্টের পরিবর্তন ঘটিয়ে আরো ক্ষতি করে গেলেন। যে অ্যামেন্ডমেন্টে পরিবর্তনের ফলে ধর্মান্ধতা, মৌলবাদ, সহিংসতা, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড, ইসলামের নামে জিহাদ ঘোষণ করে নারী নির্যাতন এবং প্রগতিশীল মানুষের ওপর নিপীড়ন বেড়ে গিয়েছিল। শাসনতন্ত্র অনুযায়ী তৎকালীন সিনেটের প্রধান গুলাম ইসহাক খান ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হলেন।

জেনারেল জিয়ার শাসনামলকে পর্যালোচনা করলেই আমরা পরবর্তীকালের মুশাররফ বাহিনীর তাণ্ডবলীলা দেখলেই বুঝতে পারবো যে এরা ক্ষমতায় থাকার জন্য কোথা থেকে কিভাবে শক্তি পেতেন। তাদের শক্তি যোগানদাতা হিসেবে পশ্চিমা বিশ্বের কোন কোন শক্তি ছিল এবং কেন?

খুব সহজেই এর উত্তর হলো মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ তার ধ্বজাধারী এশিয়া ও ইওরোপের দেশগুলো– যারা চাইতো পাকিস্তানে অস্থিরতা বিরাজ করুক। অস্থিরতা বিরাজ করলেই ক্ষমতায় স্বাভাবিকভাবেই সেনাবাহিনী আসবে। আর সেনাবাহিনী আসলেই পশ্চিমা বিশ্ব সফল। এক ঢিলে দুই পাখি মারা যাবে। কেননা পাশের দেশ আফগানিস্তানে তখন চলছে সোভিয়েট আগ্রাসন। সে আগ্রাসন নিরসন করার বড় প্রয়োজন অন্তত পশ্চিমাদের লাভের জন্য। সে আগ্রাসন আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে নিরসন করতে হলে পাকিস্তানকে দরকার। আর পাকিস্তানকে দরকার হলে তার সেনাবাহিনী দরকার। সামরিক বাহিনী ক্ষমতায় থাকার লোভে সাহায্য করবে –কিন্তু নির্বাচিত গণতান্ত্রিক সরকার সে সাহায্য করবে না। করলেও আন্তর্জাতিক আইনে রাজনৈতিক উপায়ে।

কেননা তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়নের সাথে রাজনীতি বা যুদ্ধ নিয়ে দ্বন্দ্বের কথা তো ভাবাই যায় না। সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই শক্তিকে এশিয়ার মাটি অর্থাৎ আফগানিস্তান থেকে চিরতরে নির্মূল করার জন্যই ছিল এই প্রয়াস। তাছাড়া পাকিস্তান বা কোনো মুসলিম রাষ্ট্রকেই পশ্চিমারা বন্ধু ভাবে না।

পশ্চিমারা গণতন্ত্রের কথা বলে, কিন্তু পশ্চিমা গণতন্ত্র অন্য ধাঁচের। কোনো মুসলিম দেশে গণতান্ত্রিক আন্দোলনে তারা সাহায্যের হাত বাড়ায় এ সত্যি।


www.pathagar.com

কিন্তু গণতন্ত্র আনতে গিয়ে যদি তাদের স্বার্থের ব্যাঘাত ঘটে তাহলে তারা সে গণতান্ত্রিক আন্দোলনের পেছনে থাকে না। সোভিয়েত ইউনিয়ন যখন আফগানিস্তানে তার আগ্রাসন চালাচ্ছে তখন পশ্চিমা বিশ্ব তথা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দরকার সেখান থেকে তাদের হটানো। সোভিয়েত বাহিনীকে হটানোর জন্য যারা লড়াই করছে তারা বেশিরভাগই ইসলামপন্থী মৌলবাদী। তাদের পেছনে পরোক্ষভাবে জেনারেল জিয়া এবং তার সামরিক বাহিনী। জেনারেল জিয়াও চরম মৌলবাদী। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং তার মিত্র পশ্চিমা বিশ্বের অনেক দেশ এমন একজন সামরিক জান্তার দরকার। তাদের দরকার সামরিক জান্তা, যার মধ্যমে সোভিয়েত বাহিনীর সাথে লড়াই করা যাবে –অন্য দিকে সামরিক জান্তার দরকার এমন বিশাল সমর্থন। জেনারেল জিয়া পেয়ে গেলেন। তাঁকে ক্ষমতায় থাকার জন্য এই শক্তি তাঁর জন্য অপরিহার্য। ব্যাস, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমা বিশ্বের দেশগুলো অর্থ ঢালতে লাগলো। কি পরিমাণ যে অর্থ ঐ সময় আফগানিস্তানের মুজাহিদিনদের জন্য এসেছিল তা ঠিক হিসেব করে বলা যাবে না।

১৯৭৯ সালের ক্রিসমাসের সন্ধ্যায় সোভিয়েট বাহিনীর বিরুদ্ধে আক্রমণ চালালো আফগানিস্তানের ইসলামপন্থী গোঁড়া মৌলবাদীদের মুজাহিদিন গ্রুপ। এর মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের বুকে গণতন্ত্রের কবর রচিত হলো– অন্যদিকে পাকাপোক্ত হলো জেনারেল জিয়ার ক্ষমতা।

সেই সময় তিনি আমার পিতাকে হত্যা করলেন সাথে সাথে নির্বাচনের ডাক দিয়ে একটা প্রহসন করলেন। কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিমাদের দেয়া অঢেল ডলারে গোপনে জেনারেল জিয়া নিজের ক্ষমতাকে আরো বাড়ানোর জন্য সামরিক বাহিনী এবং ইসলামিক দলগুলোকে ঢেলে সাজালেন। অর্থাৎ যুদ্ধের নামে জেনারেল জিয়া ডলার হাতিয়ে একটা মজার খেলা খেললেন।

১৯৮০ সালের জানুয়ারিতে জেনারেল জিয়া কার্টার প্রদত্ত ৪০০ মিলিয়ন ডলারের সাহায্যের অর্থ গ্রহণে অসম্মতি জানালেন। এর পরপরই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে নির্বাচন হলো। নির্বাচনে জয়লাভ করে রোনাল্ড রিগান এলেন ক্ষমতায়। তিনি এসে কার্টার প্রদত্ত সেই অর্থ ৩.২ বিলিয়ন করে আট বারে দিতে চাইলেন। জেনারেল জিয়ার সাথে তখন অর্থাৎ পাকিস্তানের সাথে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সম্পর্ক নাটকীয়ভাবে পাল্টে যায়। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আফগানিস্তানকে সরাসরি সাহায্য করতে লাগলো নানা ধরনের অস্ত্র এবং অর্থ দিয়ে। এসব অস্ত্রের মধ্যে মিসাইল পর্যন্ত ছিল। এইভাবে এক সময়ে পাকিস্তানের মাধ্যমে জেনারেল জিয়ার সহায়তায় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের স্বার্থ স্বল্পকালীন সময়ের জন্য সিদ্ধি হলেও দক্ষিণ এশিয়া এবং তামাম মুসলিম দেশসহ দীর্ঘ মেয়াদের জন্য মস্ত ক্ষতি হয়ে গেল সমগ্র পৃথিবীর।


www.pathagar.com

এখানে একটি বিষয় উল্লেখ না করলেই নয় যে, ১৯৬০ সাল থেকেই পাকিস্তান জামায়াতে ইসলামী সৌদী আরবের কাছ থেকে নানা বিষয়ের ওপর অর্থ সাহায্য পেয়ে আসতো। সোভিয়েত ইউনিয়নের বিরুদ্ধে আফগান মুজাহিদিনরা যখন যুদ্ধ চালায় তখন জামায়াতে ইসলামী পৃথিবীর বিভিন্ন মুসলিম দেশ থেকে যুদ্ধে যোগ দেয়ার জন্য মুজাহিদিন নিয়োগ করছিল। এরপর জামায়াতে ইসলামী পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীকে সহযোগিতা করার জন্য আহ্বান জানালো। তারা সেই আহ্বানে সাড়া দেয় –এমনকি পাকিস্তান সামরিক বাহিনী যুদ্ধাস্ত্রসহ অর্থও সাহায্য দিলো। জামায়াতে ইসলামী নেতাদের মধ্যে ছিলেন অধ্যাপক আব্দুল রাসুল সাঈদ এবং গুলবুদ্দিন হেকমতিয়ার।

পাকিস্তান যখন ১৯৮০ সালের পর আফগানিস্তান বিষয়ে প্রতিনিধিত্বমূলক কাজে ব্যস্ত তখন পাকিস্তান দেখলো এই হচ্ছে মোক্ষম সময় ভারতের জবাব দেয়ার– কারণ এক পাশে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র অন্য পাশে আফগানিস্তান। মাকির্নীদের অর্থে কেনা অস্ত্র আর আফগানদের যুদ্ধের স্ট্যাটেজী দুই মিলিয়ে হবে উপযুক্ত প্রতিশোধ নেয়ার শক্তি।

১৯৮৮ সালের এপ্রিল মাসে সোভিয়েত বাহিনী আফগানিস্তান থেকে তুলে নেয়ার জন্য জেনেভায় এক চুক্তি হলো। সোভিয়েত ইউনিয়নের আফগানিস্তান ছেড়ে যাওয়ার সব পরিকল্পনা ঠিক। তখন মার্কিন সাম্রাজ্যবাদীর ভূত দাঁত বের করে হাসছে – কেননা তারা যতটুকু আশা করেছিল তার চেয়ে অনেক বেশি পরিমাণ জয় করলো। আফগানিস্তান তখন ধ্বংসস্তূপ। সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, সেনাবাহিনী, সবকিছুকে সোভিয়েট সেনাবাহিনী একেবারে ধ্বংস করে চলে যায়। তাদের এসব সেরে ওঠার মতো কোনো সামর্থ্যই ছিল না।

আফগানিস্তান থেকে সোভিয়েট বাহিনী একটা মস্তবড় শিক্ষা পেয়ে সরে যায়। এর সাথে মধ্য ও পূর্ব ইউরোপে যে সব দেশে তার রাজনৈতিক তৎপরতা এবং সেনাবাহিনী ছিল তাদের উঠিয়ে আনলো। বলা যায়, তৎকালীন বিশ্বে সর্বাধিক প্রচলিত শব্দ কোল্ড ওয়ার শেষ হলো। যাকে অনেকেই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধ বলে অভিহিত করতো। এর ফলে কিন্তু জয় হয় পশ্চিমা বিশ্বের। কিন্তু সেখানেও রোপিত হয় আরেক বীজ –তা হলো সন্ত্রাসবাদ এবং সেই সন্ত্রাসবাদকে রুখতে মনে হয় প্রয়োজন হবে চতুর্থ বিশ্বযুদ্ধের যা অনেকেই বলে।

জেনারেল জিয়ার মৃত্যু এবং আফগান যুদ্ধের পর পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী এবং জামায়াতে ইসলামীর যোগসাজসে পাকিস্তানের ক্ষমতায় মৌলবাদীরা জেঁকে বসে। এই শক্তি ধীরে ধীরে পাকিস্তান মুসলিম লীগকে শক্ত করার চেষ্টা চালায়।


www.pathagar.com

যে জামায়াতে ইসলামী ১৯৬০ সালে ফাতিমা জিন্নাহর পেছনে থেকে নির্বাচন করেছিল তারা এবার বলতে লাগলো একটি দেশের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতায় একজন মহিলা বসাকে ইসলাম সমর্থন করে না। এই মতকে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য পাকিস্তান গোয়েন্দা বিভাগ শত শত মিলিয়ন রুপি খরচ করলো। যার ফলে তারা ক্ষমতাকে বেশ ভালোভাবে আঁকড়ে ধরলো।

১৯৮৮ সালের নির্বাচনের সময় পাকিস্তানের শিক্ষার হার ছিল ২৬%, তখন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদ সংস্থা এবং সংবাদপত্র মৌলবাদীদের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তারা আমাদের দল পাকিস্তান পিপলস পার্টিসহ সব দলের প্রতীক কেড়ে নিয়ে অর্থাৎ জনগণের রাজনৈতিক দলের সাথে ক্ষমতাসীনদের শত্রুতা তখন চরম পর্যায়ে পৌঁছে গেছে।

তৎকালীন ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট সংবিধানের বাইরের এক আইন চালু করলেন যে, সকল ভোটারদের জাতীয় পরিচয়পত্র থাকতে হবে। মজার ব্যাপার হলো, গ্রামীণ এলাকায় জাতীয় পরিচয়পত্র ছিল মাত্র পুরুষ ৩% এবং মহিলা ৫%-এর মতো। কিন্তু মহিলা ভোটাররা ভোট দিতে পারবে না। অর্থাৎ নির্বাচন যেভাবেই হোক না কেন পরিবর্তিত এই আইনের আওতায় নির্বাচন হলে কোনো রাজনৈতিক দলই ক্ষমতায় যেতে পারবে না –একমাত্র তারা ছাড়া।

এই অবস্থায় আমার পাকিস্তান পিপলস পার্টির নেতা-কর্মীরা সুশীল সমাজ, ব্যবসায়ী সম্প্রদায়, শিক্ষক, আইনজীবী, সাংবাদিক, কিছু সামরিক অফিসারের কাছে যাওয়া শুরু করলো বেশ গোপনে। জাতির এমন ঘোর ক্রান্তিলগ্নে বসে থাকলে চলে না। একটা কিছু করা দরকার এই সূত্রে। আমরা চাই নিটোল গণতন্ত্র যেখানে সন্ত্রাসবাদ, মৌলবাদ, ধর্মভিত্তিক রাজনীতির কোনো জায়গা থাকবে না।

তাদের ঘোষণা মতো দিনে নির্বাচন হলো এবং সে নির্বাচনে কিছুতেই আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টিকে ঠেকাতে পারছিল না। তখন গোয়েন্দা বিভাগ একে একে আমার দলের সদস্যদের বাতিল করার জন্য নানারকম ছল-ছুতো বের করার চেষ্টা করতে থাকে।

তখন পাকিস্তান পিপলস পার্টির মাখদুম আমিন ফাহিম জেনারেল হামিদ গুল-এর সাথে দেখা করলেন। হামিদ গুল তখন গোয়েন্দা বিভাগের প্রধান। তিনি জনসমাবেশে সরাসরি ঘোষণা দেন যে, তিনি ইসলামী জাম্বুরী ইত্তিহাদ (আই.জে.আই.) এর স্রষ্টা। মাখদুমকে বলা হলো তিনি যদি মাত্র দশজন সদস্য আনেন তাহলে তাকে প্রধানমন্ত্রী করা হবে। মাখদুম এই শর্তকে অস্বীকার করেন।


www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট গুলাম ইসহাক খান বললেন, যেহেতু পাকিস্তান পিপলস পার্টি আই.জে.আই.-এর চেয়ে বেশি পরিমাণ আসন পেয়েছে সেহেতু গণতান্ত্রিক ধারামতে জয়ী দলই সরকার গঠন করবে। বিভিন্ন দলের নেতা-নেত্রীদের বা স্বতন্ত্র প্রার্থীদের তিনি না ডেকে ১৫ দিন পর সরাসরি আমাকে ডেকে সরকার গঠন করতে বললেন।

সকল বাধা-বিপত্তি পেরিয়ে ডিসেম্বরের ২ তারিখে ১৯৮৮ সালে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে শপথ নিলাম। আমি হলাম পৃথিবীর প্রথম মুসলিম মহিলা প্রধানমন্ত্রী। এটা হলো গণতন্ত্রের জয়ের মুহূর্ত। এটা হলো যারা এসেছেন গণতন্ত্রের পথে এর বহুপূর্বে তাদের জন্য। সময়টা হলো তাদের জন্য যারা গণতন্ত্রের জন্য জীবন দান করেছেন তাদের জন্য, অথবা যারা অত্যাচারিত হয়েছেন, চাবুকের আঘাত খেয়েছেন এবং যারা নির্বাসনে গিয়ে নিজেদের বাঁচিয়েছেন তাদের জন্য।

প্রথম দিন আমার অফিসে গিয়ে আমি মুক্তকণ্ঠে জানালাম জনগণকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম তা পূরণে কাজে হাত দিলাম।

আমি বিভিন্ন জনসভায় যেসব প্রতিশ্রুতি প্রচার করেছিলাম সেগুলোকে পূরণ করার জন্য কাজে নেমে পড়ি। আমি দাবি করতে পারি যে, আমিই প্রথমে পাকিস্তানে সঠিক গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা প্রচলন ঘটাই। ক্ষমতায় এসেই আমি সকল রাজনৈতিক বন্দী নেতা-কর্মীদের মুক্তি দিই। আমি তথ্য প্রবাহ অর্থাৎ প্রিন্ট এবং ইলেক্ট্রেনিক্স সংবাদ সংস্থাগুলোকে মুক্ত করে দিই। সিএনএনকে আমি অবাধ প্রচারের সুযোগ দিই, যা সেই সময়কার একমাত্র আন্তর্জাতিক সংবাদ মাধ্যম ছিল। সংবাদপত্রের অবাধ স্বাধীনতা প্রদানের পাশাপাশি সংবাদপত্র ছাপানোর জন্য নিউজপ্রিন্টের ব্যবস্থা করি। এনজিওসহ মানবাধিকার সংস্থার কাজ করার স্বাধীনতার মাধ্যমে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক সুশীল সমাজের প্রতিষ্ঠা করি। ছাত্র এবং শ্রমিক ইউনিয়নের নিষিদ্ধ আইন তুলে দিয়ে সবার জন্য রাজনৈতিক চর্চার অবাধ স্বাধীনতা প্রদান করি। জেনারেল জিয়ার সামরিক শাসন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত যে রেডিও-টেলিভিশন ছিল তা স্বায়ত্তশাসিত করে দিই। সবচেয়ে বড় কাজ করি পাখতুন এবং বেলুচ নির্বাসিত সকল রাজনৈতিক নেতাদের দেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা করি।

দ্বিতীয় কর্মকাণ্ডের প্রথম পদক্ষেপেই আমি বিচার বিভাগকে পৃথিক করি এবং পূর্ণ স্বাধীনতা প্রদান করি। একটি অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের জন্য সাধারণ জনগণকে কম্পিউটারের মাধ্যমে জাতীয় পরিচয়পত্র প্রদান করি। যা এর আগে প্রায় দশ বছর যাবৎ চেষ্টা করে কোনো সরকার করতে পারেনি।



www.pathagar.com

আমরা প্রথম সংখ্যালঘুদের পূর্ণ নাগরিক অধিকার প্রদান করি। অর্থাৎ আমার পাকিস্তান পিপলস পার্টির সরকার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য যেসব কাজ করি তা আমরা বলতে পারি দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যে প্রথম। ৪০ হাজার গ্রামে বিদ্যুৎ প্রদান এবং প্রায় ১৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন আমাদের আমলেই হয়।

আমার সরকারের সবচেয়ে বড় সাফল্য ভারতের সাথে আমাদের বন্ধুত্ব স্থাপন। প্রধানমন্ত্রী রাজীব গান্ধীর সাথে আমাদের পিতামাতার স্থাপিত সিমলা চুক্তির পুনরুজ্জীবন ঘটিয়ে তা বাস্তবতায় আনি। শুধু তাই নয় রাজীব গান্ধীর সাথে আমার চুক্তি হয় যে আমরা কখনোই একে অন্যের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত হবো না- বিশেষ করে পারমাণবিক যুদ্ধ তো নয়ই। পারমাণবিক শক্তি আমরা শুধুমাত্র জনসাধারণের কল্যাণে ব্যবহার করবো। পারমাণবিক শক্তি নিয়ে এটিই ছিল ভারতের সাথে প্রথম শান্তি চুক্তি। উভয় দেশের মধ্যে একটি হট লাইন তৈরি আমাদের এই দুই তরুণ রাজনীতিবিদের হাতে দিয়ে। কারগিল এবং সিয়াচিনে সৈন্য মোতায়েন নিয়েও আমরা একটি শান্তিপূর্ণ আলোচনার মাধ্যমে সফল সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। যেসব চিন্তা-ভাবনা আমাদের আগে আর কোনো সরকার প্রধানগণ করতে পারেননি। আমার এসব সফলতা দেখে মুসলিম লীগ এবং জামায়াতে ইসলামীর নেতারা আমাকে ভারতের দালাল বা এজেন্ট বলা শুরু করলো। তারা উভয়ে মিলে সারা পাকিস্তানে তা বেশ জোরে-সোরে প্রচারও করতে থাকলো। অথচ পরবর্তীকালে মুসলিম লীগ এবং মুশাররফের সামরিক সরকার এসে সেগুলো মহা ধুমধামে মেনে চলেছে।

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সম্পর্ক স্থাপন এবং সাহায্য গ্রহণ। অনেকেই বলে ছিল আমাদের দ্বারা এ দুটো কাজ হবে না। কিন্তু তা ভুল। আমার সরকার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সাথে পুনরায় পূর্বের ন্যায় উষ্ণ সম্পর্ক স্থাপন করে ১৯৮৯ সালে সোভিয়েপ বাহিনী আফগাসিনস্তান থেকে চলে যাওয়ার পর এবং ওয়াশিংটনে গিয়ে আমাদের প্রতিনিধিরা বিশাল অঙ্কের অর্থ সাহায্য আনে যা ছিল ইসরায়েল ও মিশরকে প্রদত্ত সাহায্যের প্রায় সমান।

এমনকি ক্যাম্প ডেভিড চুক্তিতে প্রাপ্ত অর্থ সাহায্যের সমান। মানব কল্যাণ এবং দেশের সার্বভৌমত্ব রক্ষাকল্পে শুধুমাত্র আমরা পারমাণবিক শক্তি ব্যয় করা হবে এবং পারমাণবিক শক্তি নিয়ে আমরা কোনো ব্যবসা করবো না -এ মতেও আমরা উপনীত হই।

সোভিয়েত বাহিনী চলে গেলে আমরা আফগানিস্তানকে মধ্যবর্তী সরকার গঠনের জন্য সমর্থন দিই- যেন একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য দেশে গণতন্ত্র ফিরে আসে। আফগান মুজাহিদিনরাও সে নির্বাচনে অংশ নেবেন। নির্বাচনের মাধ্যমে আগত সরকারের কাছে প্রেসিডেন্ট নজিবুল্লাহ তাঁর ক্ষমতা বুঝিয়ে দেবেন।



www.pathagar.com

আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি নারী অধিকার প্রতিষ্ঠা করে নাটকীয়ভাবে। আমি নিজে নারী উন্নয়নের জন্য আলাদা মন্ত্রণালয় প্রতিষ্ঠা করি এবং আমার কেবিনেটে বেশ ক'জন মন্ত্রীর পদে মহিলা নিয়োগ দিই। বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে আমরা নারী বিষয়ক শিক্ষা বিভাগ চালু করি। নারী শিল্প উদ্যোক্তা এবং ব্যবসায়ীদের জন্য আলাদা ব্যাংক প্রতিষ্ঠা করি যেখান থেকে ব্যবসায় এবং কুটির শিল্প স্থাপনের জন্য শুধুমাত্র নারীদেরকেই ঋণ দেওয়া হতো। জন্ম নিয়ন্ত্রণ, নারীর হাতে-কলমে শিক্ষা, শিশু প্রতিপালন, পুষ্টি ও স্বাস্থ্যজ্ঞান প্রদান, পরিবার পরিকল্পনার মতো অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো সম্বন্ধে সুষ্ঠু ধারণা থাকার জন্য আমরাই প্রথম শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও প্রশিক্ষণ কেন্দ্র গড়ে তুলি। আন্তর্জাতিক খেলাধুলা বা অন্যান্য বিষয়ে পাকিস্তানি নারীদের অংশগ্রহণ আমরা বাধ্যতামূলক করি। যেগুলো মুশাররফ সামরিক জান্তার আমলে নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হয়। তারা নারীর প্রতি ধর্মের দোহাই দিয়ে যা করেছিল –তা একেবারে গর্হিত অপরাধ। আমি ক্ষমতায় আসার পরপরই, নিয়মিত অফিস করি আর অন্যদিকে তিন কট্টরপন্থী আমার সরকারকে বানচাল করার জন্য গোপনে মিটিং করেন। এরা হলেন জেনারেল হামিদ গুল, ব্রিগেডিয়ার ইমতিয়াজ আহমদ এবং মেজর আমীর। এদের লোকবল দিয়ে সাহায্য করতো জামায়াতে ইসলামী এবং অর্থ যোগান দিতো পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী। এক সময়ে এরা আমার ওপর হামলাও করেছিল যা আমি পরে জানতে পারি। ওদের উদ্দেশ্য একটাই– তা হলো পাকিস্তান থেকে গণতন্ত্র তুলে একটি ধর্মভিত্তিক গোঁড়া উগ্রপন্থী সন্ত্রাসীদের দ্বারা পরিচালিত রাষ্ট্রে পরিণত করা। যেখানে সামরিক জান্তা এবং মৌলবাদীরা সুখে থাকবে, বাকি সাধারণ জনতা থাকবে ক্রীতদাসের মতো।

নওয়াজ শরীফকে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী বানানো মনে হয় আমার জীবনের বড় ভুল ছিল। মুখ্যমন্ত্রী হওয়ার পরই তিনি বললেন, আমি বেনজির ভুট্টোর হাতকে শক্ত করবো। তাকে ইসলামাবাদের প্রধানমন্ত্রী বানাবো।

মনে প্রশ্ন জাগলো, কেন শুধু ইসলামাবাদ, কেন সমগ্র পাকিস্তানের নয় কেন? আমি বুঝেছিলাম এর মধ্যে সুদূরপ্রসারী কোনো উদ্দেশ্য আছে। আমি জানতাম না যে, নওয়াজ শরীফও ভিতরে ভিতরে মৌলবাদীদের হাতের মানুষ হয়ে গেছেন।

এর পরপরই আমাকে অমুসলিম, ইহুদি, হিন্দুবাদের দালাল, মার্কিনীদের চর বলে আক্রমণ করা হয়। এর পরের চক্রান্তগুলো আরও লজ্জাজনক। যখন ওরা আমাকে কাবু করার মতো কিছু খুঁজে পেলো না– তখন আমার চরিত্র নিয়ে প্রশ্ন তুললো। এমনকি আমাদের পরিবার সম্পর্কেও নানারকম কুৎসা রটাতে



www.pathagar.com

শুরু করলো। এসবই করা হতো পাকিস্তানের গোয়েন্দা বিভাগ থেকে। নির্বাচনে জয়লাভ করার আগে-পরে তারা এসব নোংরামি করেছে। তখন খারাপ লাগেনি, কেননা নির্বাচনের পূর্বে জনগণকে হাত করার জন্য নানারকম কথাবার্তা হয়- কিন্তু আমি যখন ক্ষমতায়, তখন শান্ত দেশ আমার পেছনে সাধারণ জনগণ, তখন তো এগুলো শোভা পায় না তারা তাও করেছেন। এই ধরনের নোংরা রাজনৈতিক অপপ্রচার বহু পূর্বে ইওরোপে, আমেরিকায় হতো- বর্তমানে এসব চলে না। তারা পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর সাজেশনে আমার, আমার পরিবার এবং আমার সরকার সম্পর্কে নানারকম বাজে কথা প্রচার করতে থাকেন।

প্রথমেই তারা বললেন, বেনজির ভুট্টোর সরকার বিশাল দুর্নীতিবাজদের সরকার। এইসব অপপ্রচার চালানোর জন্য এবং সত্যতা প্রমাণের জন্য তারা বেছে নিলেন আমার ব্যবসায়ী স্বামী আফিস জারদারিকে। এমনকি তারা তাঁকে উপহাসচ্ছলে 'মি. টেন পার্সেন্ট' বলে ডাকতে শুরু করলেন। আমার মনে হয় তারা এই নামে ডাকতেন এই কারণে যে, আমি তাদের চোখে সামান্য নারী মাত্র, আমার প্রধানমন্ত্রীর দায়-দায়িত্বের দশ ভাগই হয়তো তিনি দেখেন। এরপর বিদেশে অবস্থানরত বন্ধু-বান্ধবরা আমাকে জানাতে আরম্ভ করলো যে, তোমাকে বাইরের দেশের পত্র-পত্রিকা হিন্দু ও ইহুদীবাদের দালাল বলে আখ্যায়িত করছে। কেননা ঐ ধরনের নানা তথ্য পাকিস্তান থেকে ছাপাই করা পত্রিকা মারফত এসব দেশে আসছে এবং তা গরম খবর হিসাবে প্রচার পাচ্ছে। এসব ঘৃণ্য কাজও ছিল ঐ পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীর।

গোয়েন্দা বিভাগ এবং উগ্রপন্থী মৌলবাদীদের লক্ষ্য যে শুধু আমার ওপর ছিল তা নয়, তাদের সর্বদা লক্ষ্য ছিল কিভাবে জনগণকে গণতন্ত্রের পথ থেকে ঘুরিয়ে আনা যায়। কিভাবে চরমপন্থী নিয়ন্ত্রিত সামরিক শাসককে ক্ষমতায় বসানো যায় -এসব। কেননা ঐসব চক্র থাকলে তাদের সুখ। আমি ক্ষমতায় আসার সাথে সাথে তাদের ক্ষমতা গিয়ে দাঁড়ালো শূন্যের কোঠায়। জনমনে, প্রশাসন, নারী ও শিশু মনে তখন গণতন্ত্রের বাতাস লেগে গেছে। অর্থাৎ গণতন্ত্রের ফলাফল সাধারণ মানুষে পেতে শুরু করেছে। এমন অবস্থা পাকিস্তান সেনাবাহিনী এবং গোয়েন্দা সংস্থা বুঝে ফেলেছিল -এদেশে সামরিক শাসন ফিরে আসার আর কোনো সুযোগ নেই বেনজির ভুট্টোকে হত্যা করা ছাড়া। আফসোস আমার, তারা পরপর এতোগুলো সামরিক জান্তার শাসন, শোষণ, নিপীড়ন-নির্যাতন, ব্যর্থতা দেখেও কোনো শিক্ষা গ্রহণ করেনি -যে মৌলবাদীরা কত হিংস্র এবং সামরিক জান্তারা কতবড় শোষক। এর মধ্যেই চরমপন্থীরা এবং গোয়েন্দা বাহিনী জেনে গিয়েছিল যে গণতন্ত্রের উত্তরণ যত ঘটবে -তারা তত সংকুচিত হবে। এক সময়ে তারা নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। এ জন্য তারা তলে তলে


www.pathagar.com

সংগঠিত হলো এবং পশ্চিমের দিকে হাত বাড়ালো। আমি ক্ষমতায় আসার পর পাকিস্তান পশ্চিমা বিশ্বের কোনো স্বার্থসিদ্ধিতে কাজে আসছিল না। ফলে তারাও গোপনে হাত মিলালো। এরপর শুরু হলো আমার সরকারের বিরুদ্ধে ব্যাপক প্রচার প্রচারণা। সহযোগিতা করতে লাগলো পশ্চিমা বিশ্ব। যে বিষয়টি আমি অনেক পরে জেনেছিলাম– যখন আমার সরকারের অবস্থা অত্যন্ত খারাপ, তখন। তখন আমার আর কিছুই করার ছিল না।

১৯৮৯ সালে ঘটলো আরো বড় ঘটনা। স্বয়ং ওসামা বিন লাদেনকে এবার আমার বিরুদ্ধে কাজে লাগানো হলো। তার লোকজন, আমার দলের প্রত্যেক সদস্যকে আমার সরকারের ওপর অনাস্থা আনার জন্য প্রত্যেককে এক মিলিয়ন ডলার মূল্যে কেনা হয়েছিল। এর মধ্যে অনেকে গ্রহণ করেননি। যারা গ্রহণ করেননি তাদের অনেকের রহস্যজনকভাবে মৃত্যু হয় পরবর্তীকালে। এসব ষড়যন্ত্র পরিচালনা করে পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনী এবং আই.জে.আই. (ইসলামী জাম্বুরি ইত্তিহাদ)।

আমি তো মানুষ, আমার সহ্যেরও একটা সীমা আছে। আমার সহ্যের সেই সীমাকে ছাড়িয়ে গেছে সবার আচার-আচরণ। আমার মতো সদ্যপ্রাপ্ত গণতান্ত্রিক দেশের প্রধানমন্ত্রীর পেছনে যদি দেশের প্রেসিডেন্ট, সামরিক বাহিনীর প্রধান, গোয়েন্দা বাহিনী, এক ডজনের বেশি ইসলামপন্থী মৌলবাদী দল, পশ্চিমা বিশ্বে– সর্বপরি ওসামা বিন লাদেনের মতো বিশ্বখ্যাত সন্ত্রাসী নেতা লেগে থাকে সর্বক্ষণ, তাহলে আমিই বা বাঁচি কিভাবে এবং আমার সরকারই বা টেকে কিভাবে?

পাকিস্তান গোয়েন্দা বাহিনীকে হাতের মুঠোয় আনার জন্য আমি প্রথমেই এর প্রধান জেনারেল গুলকে সরিয়ে তার জায়গায় জেনারেল শামসুর রহমান কাল্লুকে আনলাম। কিন্তু ষড়যন্ত্র সেখানে আরো বেশি। জেনারেল গুল, প্রেসিডেন্ট ইসহাক খান এবং জেনারেল মীর্জা আসলাম বেগ, সেনাবাহিনী প্রধান, গোয়েন্দা বিভাগের দায়িত্ব মিলিটারী ইন্টেলিজেন্স (এম.আই) বা সামরিক গোয়েন্তা সংস্থার প্রধান ব্রিগেডিয়ার আসাদ দুররানীর হাতে ন্যাস্ত করেন।

হঠাৎই সাদ্দাম হুসেনের কারণে বিশ্ব রাজনীতির অবস্থার ব্যাপক পরিবর্তন হয়। সাদ্দাম হুসেন হঠাৎ করে কুয়েতকে আক্রমণ করেন। সে কারণে, সমগ্র বিশ্ব সাদ্দাম হুসেনকে পরাস্ত করার জন্য মার্কিন ও বৃটিশ বাহিনীর সহায়তায় ইরাকের সাথে যুদ্ধে লিপ্ত। তখন মধ্যপ্রাচ্যসহ ভারত-পাকিস্তানের জনগণের মধ্যে আতংক ছড়িয়ে পড়েছে। এই ছুতোয় ১৯৯০ সালের ৬ আগস্ট প্রেসিডেন্ট দেশে জরুরি আইন জারি করে আমার কাছ থেকে ক্ষমতা কেড়ে নেন। এলো


www.pathagar.com

তাদের মোক্ষম সুযোগ। তারা আমার স্বামীসহ আমাকে গৃহবন্দী করলেন। তারপর ছড়ানো পুরনো গুজব, কুৎসা এবং মিথ্যা কথাকে প্রমাণ করা শুরু করলেন।

১৯৯৩ সালের ২৪ অক্টোবরের জাতীয় নির্বাচনে পুনরায় আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি জয়লাভ করে। নির্বাচনী ফলাফল যখন আসছিল তখন হঠাৎ করেই বন্ধ করে দেয়া হলো ফলাফলের সংবাদ। সাথে সাথে আমরাও জানিয়ে দিলাম চতুর্দিকে যে নির্বাচনের ফলাফল পাঠানো অব্যাহত রাখুন। আমরা জিতে আছি এবং অবশ্যই সরকার গঠন করবো।

সরকার গঠন করার পর প্রধানমন্ত্রী হিসেবে ক্ষমতা গ্রহণ করার সাথে সাথে আমি আগের মত করে পাকিস্তানকে এগিয়ে নিতে থাকলাম। একেবারে বঞ্চিত শোষিত তৃণমূল পর্যায়ের মানুষগুলোর জন্য স্বাস্থ্য, শিক্ষা, বাসস্থান, শিশু ও নারীর অধিকারসহ মানবাধিকারের ওপর কাজ শুরু করে দিলাম। এ জন্য পাকিস্তানে নতুন করে ৩০ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করি অর্থাৎ আগের সময়ের মিলে সেই ৪৮ হাজার প্রাথমিক বিদ্যালয় আমার সরকার নির্মাণ করে। আগের টার্মে আমার সরকার কাজ করেছিল ধীরে, এবার আমরা কাজ শুরু করলাম অত্যন্ত দ্রুতলয়ে।

বৈদেশিক মূলধন আসলো চতুর্গুণ পরিমাণে। প্রায় ১ লক্ষ মহিলার শহরে এবং গ্রামে মিলে চাকরির ব্যবস্থা করি আমরা। শিশু, নারী ও বয়স্ক শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করলাম। তখন পাকিস্তানের সাধারণ জনগণের মধ্যে এক নতুন প্রাণের জোয়ার এলো। পাকিস্তান ভাসছে নতুন উন্মাদনায়।

আমার বিশ্বাস আমি যদি পাকিস্তানের ক্ষমতায় অন্তত ৫ বছর থাকতে পারতাম, তাহলে ওসামা বিন লাদেন কখনোই তার সন্ত্রাসীদের নিয়ে অতবড় ঘাঁটি আফগানিস্তানে গড়তে পারতো না। ১৯৯৭ সালে ওসামা বিন লাদেন আফগানিস্তানে ঘাঁটি গাড়লেন– আর আমাকে ক্ষমতাচ্যুত করা হয় পরের বছর ১৯৯৮ সালে। এর দু'বছর পর আল-কায়দা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে।

তখন ক্ষমতায় নওয়াজ শরীফ। ১৯৯৮ সালের অক্টোবর মাসে তিনি জেনারেল মুশাররফকে সেনাবাহিনীর প্রধান করলেন। এই সিদ্ধান্ত ছিল নওয়াজ শরীফের জন্য খাল কেটে কুমীর আনার মতো।

১৯৯৯ সালের অক্টোবরে নওয়াজ শরীফ জেনারেল মুশাররফকে সরানোর জন্য চেষ্টা করলেন, কিন্তু পারলেন না। কেননা তিনি তখন একা। তাঁর পাশে যারাই আছেন, তারা সবাই জেনারেল মুশাররফের লোক।


www.pathagar.com

১৯৯৯ সালের ১২ অক্টোবর, জেনারেল মুশাররফ এক রক্তপাতহীন অভ্যুত্থানের মধ্যে দিয়ে পাকিস্তানের নতুন সামরিক জান্তা হিসেবে ক্ষমতায় বসলেন। বসেই আগের জনদের মতো হাঁক ছাড়লেন তিনি অর্থনৈতিক উন্নয়ন আনবেন, সরকারের কাঠামো ঠিক করবেন সর্বোপরি নব্বুই দিনের মধ্যেই অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচন দেবেন। যেন দেশে সত্যিকারের একটি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার চালু করবেন.।

২০০৭ সালের ৯ নভেম্বর তারিখে আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টি জেনারেল মুশাররফের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করলো। তাতে তখন তিনি প্রায় ৫ হাজার নেতা-কর্মকৈ আটক করেন। এর পর থেকেই ১৩ থেকে ১৭ নভেম্বরে লং মার্চের কথা জানালে জেনারেল মুশাররফ পুনরায় প্রায় ১৮ হাজার আমার দলের নেতা-কর্মীকে আটক করেন।

২০০৭ সালটাকে আমরা একটি উত্তরণের বছর বা গণতন্ত্রের পথে পাকিস্তানের পুনরায় ফিরে আসার বছর হিসেবে চিহ্নিত করি। কারণ এ বছরে পুনরায় জাতীয় নির্বাচনের জন্য ঘোষণা দেয়া হয় এবং আমার দল নির্বাচনে অংশ নেয়ার জন্য একেবারে প্রস্তুত। এটা আমরা অবশ্য আগে থেকেই আঁচ করতে পেরেছিলাম। কেননা জেনারেল মুশাররফ ২০০৬ সাল থেকেই নওয়াজ শরীফ এবং আমার ওপর বেশ খেয়াল রেখেছিলেন। সুযোগ বুঝে কাকে নির্বাচনের মাধ্যমে ক্ষমতায় আনা যায়। তিনি তাঁর হাত ধরে ক্ষমতায় থাকবেন– এমন চিন্তা-ভাবনা তখন তাঁর মনে দোলা দিচ্ছে। আমার জানা এবং দেখা মতে বলতে পারি জেনারেল মুশাররফ ছিলেন পাকিস্তানের ক্ষমতায় আসা সবচেয়ে ক্ষমতালোভী সামরিক জান্তা।

২০০৬ সালে আমি যখন নিউ ইয়র্কে, তখন জেনারেল মুশাররফ আমাকে ডেকে পাঠালেন। আমার সাথে তার শুধুমাত্র সাক্ষাৎ হলো।

এরপর ২০০৭ সালের জানুয়ারিতে তার সাথে আমার কথা হয় আবুধাবিতে। বড্ড অবাক হলাম– একদিন যে লোক আমাকে রাজনীতি থেকে সরে যেতে বলেছিলেন, আজ তিনি আমার কাছে এসেছেন পাকিস্তানের ভবিষ্যত নিয়ে আলোচনার জন্য। অসম্ভব অবাক হলাম। ভাবলাম, এ হচ্ছে ইতিহাসের নির্মম প্রতিশোধ।

আমাদের সেদিনের সেই আলোচনা বেশ দীর্ঘ এবং আন্তরিক পরিবেশের মধ্য দিয়ে গড়ালো। সেদিন আমাদের এই আলোচনায় অংশ নিয়েছিলেন মহামান্য সুলতান শেখ জায়েদ বিন আল নাহিয়ান। তিনি আমাকে মেয়ের মতো স্নেহ করতেন– কেননা আমার বাবার সাথে তার ছিল চরম বন্ধুত্ব। আমরা



www.pathagar.com

পর্যায়ক্রমে একের পর এক আলোচনায় আসলাম। পাকিস্তানের ভবিষ্যৎ, নির্বাচন, সীমান্ত সমস্যা, চরমপন্থী ইসলামিক দল, জামায়াতে ইসলামী, ওসামা বিন লাদেন, ভারত ও মধ্যপ্রাচ্য, সামরিক বাহিনী, এনজিও, শিশু ও নারী শিক্ষা সমস্যা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও পশ্চিমা বিশ্ব, বিভিন্ন রাজনৈতিক দল এবং তাদের আটককৃত নেতা-কর্মীদের মুক্তি প্রসঙ্গ, মানবাধিকার সংস্থা, বীমা, ব্যাংক সর্বোপরি গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনতে কিভাবে অবাধ ও মুক্ত নির্বাচন করা যায় –তার পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে আমাদের মধ্যে আলোচনা হয়। সেদিন দেখেছিলাম জেনারেল মুশাররফের সেই তেজ বা অহংকার আজ আর অত নেই এবং আশ্চর্যের ব্যাপার তিনি আমার এবং আমার পরিবারসহ স্বামী, পিতামাতার বিরুদ্ধে যেসব অন্যায় কাজ করেছিলেন তার জন্য ক্ষমা চাইলেন। আমি বললাম, এটা আপনাকে প্রকাশ্যে জনগণের সামনে বলতে হবে। পারবেন? তিনি তাতেও রাজি হলেন। আমি বললাম, তার আর প্রয়োজন নেই। যা সত্য তা জনগণ একদিন এমনিই জেনে যাবে।

জেনারেল মুশাররফ আমাকে যে কথা দিয়েছিলেন ২০০৭ সালের জানুয়ারি মাসে, তিনি তা রক্ষা করলেন। পাকিস্তানে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য একটি অবাধ, নিরপেক্ষ এবং অর্থবহ নির্বাচন সম্পন্ন করার জন্য তিনি সামরিক বাহিনীর প্রধান পদ থেকে অবসর ছিলেন– কিন্তু দেশের সর্বময় ক্ষমতার অধিকার অর্থাৎ প্রেসিডেন্ট হয়ে থাকলেন। ধীরে ধীরে রাজনৈতিক সমস্যা সমাধানের জন্য আমার দল পাকিস্তান পিপলস পার্টির দিকে ঝুঁকে পড়লেন।

পরের ঘটনা আরো মজার। ২০০৭ সালের ৩১ ডিসেম্বর রাতে তিনি আমার বাড়িতে নতুন বৎসর পালন করবেন বলে আমাকে জানালেন। আমিও সাদরে সে আমন্ত্রণ রক্ষা করলাম। সে দিনের সেই নতুন বৎসরের রাতে তিনি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন যে, আসন্ন নির্বাচন পাকিস্তান পিপলস পার্টি ঠিক যেভাবে চাইবে তিনি ঠিক সেভাবে সম্পন্ন করবেন। অচিরেই পার্লামেন্ট ভেঙে দেবেন এবং আমার বিরুদ্ধে দেশে-বিদেশে তিনি যেসব রাজনৈতিকভাবে পদক্ষেপ গ্রহণ করেছিলেন তা তুলে নেবেন।

এরপর সেই ২০০৭ সালেই জুলাই মাসে তিনি দুবাইতে আমার সাথে সাক্ষাৎ করলেন। আমি দুটো বিষয়ে তাঁর সাথে আলাপ করলাম, প্রথমত– প্রধান বিচারপতি ইফতেকারের অপসারণ এবং দ্বিতীয়ত, লাল মসজিদের বিদ্রোহী প্রায় শতাধিক লোক মারা যায় তার সুষ্ঠু তদন্ত। জেনারেল মুশাররফ সবকিছু করবেন বলে রাজি হলেন। কিন্তু শর্ত একটিই তা হলো সেনাবাহিনী থেকে তাঁর অবসর গ্রহণের সময় হয়ে এসেছে– এ সময় বাড়াতে হবে এবং


www.pathagar.com

বিচার বিভাগে তাঁকে সর্বচ্চো ক্ষমতা দিতে হবে। আমি সে শর্ত নাকচ করে দিলাম। বুঝে ফেললাম জেনারেল মুশাররফ এর আগে আমার কাছে গিয়ে যে সব সাক্ষাৎ করে এসেছেন তার মূলে ছিল এই দুই স্বার্থ। আমি নাচক করে দিলে তিনিও সরাসরি বললেন, তাহলে আমার দেয়া প্রতিশ্রুতি আমি রাখতে পারবো না।

বেশ কিছুদিন পর জেনারেল মুশাররফ জানালেন যে আমি নির্বাচন দিতে পারি কিন্তু তা হবে আন্তর্জাতিক কোনো পর্যবেক্ষক দলের পরিচালনায়। তবে তার আগে নিরপেক্ষ নির্দলীয় একজন তত্ত্বাবধায়ক সরকারকে ক্ষমতায় বসাতে হবে। এছাড়া আইন করে দিতে হবে দুই টার্মের বেশি কেউ প্রধানমন্ত্রী পদে বসতে পারবেন না। আমি বললাম, পশ্চিমারা প্রেসিডেন্ট শাসিত গণতান্ত্রিক সরকার কাঠামোতে এই নিয়ম রেখেছে সে কাঠামোতে এই নিয়ম মানানসই কিন্তু প্রধানমন্ত্রী শাসিত গণতান্ত্রিক কাঠামোত এই নিয়ম প্রযোজ্য নয়।

আমি এবং আমার দলের বুঝতে বাকি থাকলো না যে আমাকে ঠেকানোর জন্যই এদের যতসব উল্টা-পাল্টা পাঁয়তারা। কারণ পাকিস্তানে প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচনের মাধ্যমে আমি দুবার এসেছি এবং এই দু'বারে মোট ৪ বছর ক্ষমতায় ছিলাম। এই দু'বারই মৌলবাদী দল জামায়াতে ইসলামী এবং সেনাবাহিনীর চক্রান্তে আমাকে ক্ষমতা হারাতে হয়।

জেনারেল মুশাররফ এর সাথে একটি জিনিস ভালো করলেন তা হলো- সকল রাজনৈতিক বন্দী নেতা-কর্মীদের মুক্তির কথায় রাজি হলেন। মুশাররফ বুঝতে পেরেছিলেন, তিনি যদি দীর্ঘদিন এমন জোর করে ক্ষমতায় না থাকতেন দেশে নির্বাচিত সরকারের অধীনে সেনাবাহিনী থাকতো তাহলে পাকিস্তান যে কোথায় গিয়ে পৌঁছাতো তা ভাবাই যায় না।

ইংরেজ কবি টি. এস. ইলিয়ট বলেছেন, "ভাবনা এবং বাস্তবতার মধ্যে থাকে মস্তবড় এক আঁধারঃ -সেই সূত্রে জেনারেল মুশাররফের চিন্তা-ভাবনা এবং বাস্তবতার মধ্যে কি এক মস্তবড় আঁধার ছিল আমি বলতে পারি না। কিন্তু ২০০৭ সালের নভেম্বর মাসে পুনরায় সামরিক আইন জারি করলেন। এর মাধ্যমে তিনি পুনরায় জনগণ এবং পাকিস্তান পিপলস পার্টির সাথে কলহে জড়িয়ে পড়লেন।

২০০৭ সালের নভেম্বরে জন নিগ্রোপন্টে পাকিস্তান সফরে এলেন। আমরা তাঁর সাথে ফোনে আলাপ করলাম। তিনি বিস্মিত হলেন এই বলে যে, পাকিস্তানের যে অবস্থা, তাতে গণতন্ত্রকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব নয়, কোনো ধরনের সংলাপে না গিয়ে।


www.pathagar.com

পাকিস্তানের গণতন্ত্রের পুনরুদ্ধার এবং এদেশের জনগণের ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দেয়ার জন্য আমি আমার বাড়িতে নওয়াজ শরীফকে ডেকে আনলাম। ২০০৭ সালের ৪ ডিসেম্বর তিনি আমার ডাকে সাড়া দিয়ে আমার বাড়িতে এলেন। আমি দীর্ঘক্ষণ আলাপ-আলোচনার মাধ্যমে তাকে রাজি করতে চেষ্টা করলাম– কিন্তু কোনো ফল হলো না।

পাকিস্তানের ৬০ বছরের ইতিহাসের যে অন্ধকার দশা তা আর ঘুঁচলো না। আমাদের আগামীর শিশু, কন্যা, পুত্র, পিতা, মাতা এবং সকল জনগণ সেই অন্ধকারেই পড়ে রইলো। তবু পাকিস্তানের দার্শনিক কবি ইকবালের কথা মনে পড়লো। তিনি বলেছিলেন, "অন্ধকারের অবসান একদিন হবেই।"

সেই সন্ধ্যায় আমার চোখে অনেক স্বপ্নের মাঝ থেকে দু'ফোঁটা পানি গড়িয়ে পড়েছিল পাকিস্তানের পবিত্র মাটিতে।


www.pathagar.com

# মুখবন্ধ

হয়তো কোনো মহৎ কারণ ছিল যে জন্য মহান আল্লাহ তায়ালা আমাদের দিয়েছিলেন একজন স্ত্রী, মা অন্তত এই বইটি শেষ করার জন্য। এই বইটি প্রায় সবকিছুর জন্যই কিন্তু তারা জানে না, যারা তাকে (বেনজির ভুট্টো) হত্যা করেছে। তারা কখনো বুঝতে পারবে না যে গণতন্ত্র, সহিষ্ণুতা, জাতীয়তা, উচ্চাশা এবং সর্বোপরি ইসলামের সত্য ভাষণ কি। অথবা এমনও হতে পারে তারা এ বিষয়গুলো বুঝতেন এবং বিষয় গুলোকে চরম ভয় পেতে এবং এই ভয় থেকেই তাদের হিংস্রতার উৎপত্তি।

আমাদের ভেঙে যাওয়া মনটা এত বেশি দুঃখ ভারাক্রান্ত যে, কোনো শিক্ষাই আমাদের সান্তনা দিতে পারছে না। আমাদের চোখে উষ্ণ পানি তার অনুপস্থিতি এবং তিনি ছাড়া দীর্ঘদিন পৃথিবীতে বেঁচে থাকা তার কণ্ঠস্বর চেতনে-অবচেতনে কানে শুনতে পাওয়া, তার অনুভূতির পরশ পাওয়া এসব আমাদের আত্মার একটি অংশ হয়ে থাকবে।ঃ

আমদের বিশ্বাস যারা তার (বেনজির ভুট্টো) পেছনে ছিলেন, তার আদর্শ বাস্তবায়ন করার জন্য তারা আজীবন সেই পথে থাকবেন, লড়াই চালিয়ে যাবেন তার আদর্শ বাস্তবায়নের জন্য -কেননা এ আদর্শ বাস্তবানের জন্য তিনি জীবনদান করেছেন। আমরা গণতন্ত্রের পক্ষে আজীবন যুদ্ধ চালিয়ে যাবো, ঘৃণা করবো উগ্র মৌলবাদ, সন্ত্রাসী কর্মকাণ্ড এবং সামরিক জান্তাদের। আমরা এই বইয়ে বর্ণিত আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ভবিষ্যতে গণতন্ত্রের পাকিস্তানকে স্বপ্নে দেখবো। এক সময় আমরা ঠিকই আমাদের স্বপ্নের বাস্তবায়ন ঘটাতে পারবো, কেননা তিনি বলে গেছেন- "সময় ন্যায়বিচার এবং ইতিহাসের শক্তি আমাদের পক্ষে।" (জিয়ে বে-নজির) - বেনজির ভুট্টো দীর্ঘজীবী হোন।

আসিফ আলী জারদারি
বিলাওয়াল ভুট্টো জারদারি
বাখতাওয়ার ভুট্টো জারদারি
আসিকা ভুট্টো জারদারি

-নৌডিরো, পাকিস্তান
জানুয়ারি ৩, ২০০৮

www.pathagar.com

আলফ্রেড যোশেফ-এটি তার ছদ্মনাম। আসল নাম আব্দুল মান্নান। আশির দশকে ছড়া দিয়ে সাহিত্যচর্চা শুরু। তারপর শিশুসাহিত্যের সকল শাখায় স্বচ্ছন্দ বিচরণ। এরপর শুরু করেন রেডিও টেলিভিশনে নাটক, চলচ্চিত্রের সংলাপ চিত্রনাট্য রচনার কাজ। পেশা হিসেবে অনুবাদের কাজ করেন ছাত্রজীবন থেকে। লেখাপড়া করেছেন ইংরেজি সাহিত্যে। অনুবাদ করেছেন অসংখ্য গল্প, কবিতা, উপন্যাস এবং রাজনৈতিক গ্রন্থ। ইংরেজি থেকে বাংলা এবং বাংলা থেকে ইংরেজি ভাষার অনুবাদে তিনি এক দক্ষ কারিগর। বেনজির ভুট্টোর লেখা বইগুলোর মধ্যে সবচেয়ে আলোচিত বই এই 'রিকনসিলিয়েশন : ইসলাম ডেমোক্রেসি অ্যান্ড দি ওয়েস্ট'। বাংলাভাষায় অনুবাদ করেছেন তিনি। তার মতে এ পর্যন্ত যত বই অনুবাদ করেছেন তার মধ্যে এটিই শ্রেষ্ঠ। সাহিত্যের সব শাখাতেই তার বিচরণ আজও প্রবহমান এবং শিল্পসম্মত। পেশায় তিনি একজন সাংবাদিক।

–প্রকাশক

www.pathagar.com

পাকিস্তান ব্যতিরেকে সাম্প্রতিক বিশ্বকে বোঝা অসম্ভব। আর এ বইটি পাঠ না করলে পাকিস্তানকে বোঝা অসম্ভব। একজন সাহসী মানবী নৃশংসভাবে মৌলবাদীদের হাতে খুন হলেন কিন্তু আমাদের কাছে গণতন্ত্র ইসলাম এবং পশ্চিমা বিশ্ব সম্পর্কে মীমাংসাপূর্ণ নতুন ধারনা দান করে গেছেন। এই ব্যাপারে আমরা তার কাছে ঋণী, আমরা নিজেদের কাছেও ঋণী। বিষয়গুলো তার কাছ থেকে জানতে পেরে। আমরা চেষ্টা করবো তার এই মত ও পথের অনুসারী হয়ে চলার জন্য।

– মেডেলিন অলব্রাইট

পাকিস্তান বর্তমান বিশ্বের তথাকথিত সন্ত্রাসীদের উত্তম যুদ্ধক্ষেত্র। রিকনসিলিয়েশন– সেই মীমাংসা যা একজন গণতন্ত্রমণা সাহসী এবং সংগ্রামরতা নারীর প্রতিচ্ছবি এবং মৌলিক চিন্তাধারার মতামত–ইসলাম, গণতন্ত্র এবং পশ্চিমা বিশ্বের রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের। বেনজির ভুট্টো পাকিস্তানের জনমনে ছিলেন অসম্ভব জনপ্রিয় এক গণতান্ত্রিক নেত্রীর নাম। যাকে চরমপন্থীরা হত্যা করে যে ভুল করেছেন– তা বিশ্ববাসী অনুভব করতে পারে।

– পিটার. ডব্লিউ. গলব্রেথ

ISBN 984 70117 0079 3
9 847011 700793